ড. মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ কাসেমী

আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ

ব্যক্তিত্ব, পরিচয় ও অবদান

আব্দুল্লাহ হাসান কাসেমী
অনূদিত

আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ

ব্যক্তিত্ব, পরিচয় ও অবদান

(দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে
সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত)

ড. মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ কাসেমী

আবদুল্লাহ হাসান কাসেমী
অনূদিত

দারুল ফিকর
জযবা | ইলম | ইত্তেবা

আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ
ব্যক্তিত্ব, পরিচয় ও অবদান

ড. মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ কাসেমী

অনুবাদ আবদুল্লাহ হাসান কাসেমী

প্রথম প্রকাশ
জিলকদ ১৪৪৬ হিজরী, মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।
গ্রন্থস্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রুফ সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : মামণি প্রিন্টার্স, ০১৭৩৮৮৭৮৭৮০

অনলাইন পরিবেশক
Rokomari.com | Wafilife.com
Jazabor.com | khidmahshop.com

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৪৫০ টাকা

দারুল ফিকর
জযবা | ইলম | ইস্তেবা
১১ ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
Darulfikr.bn@gmail.com
Umedprokash.com
Phone : 01757597724

অর্পণ

আমার সকল তালিবে ইলমকে,

যারা অতীতে পড়েছে, বর্তমান পড়ছে এবং ভবিষ্যতে পড়বে।

কামনা করি, আল্লাহ তাআলা যেন সকলকে আকাবিরে দেওবন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীনের খেদমত করার এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও ইসলামের ওপর অটল-অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন। আমীন।

একটি জরুরি কথা, কথাটা খুব ভালো করে অন্তরে বদ্ধমূল করে নেওয়া উচিত। সেটা হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হোক, বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলি হোক, হোক শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েলের কিতাব অথবা নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের ওয়াজ ও উপদেশের কিতাব, এগুলোর কোনোটাই কখনো এমন নয় যে, একবার পড়ে নজর বুলিয়ে রেখে দেওয়া হবে আর কখনো খুলে দেখারও প্রয়োজন হবে না! বরং নিজের হালত ও অবস্থা অনুসারে, নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে এসব কিতাব নিয়মিত পড়তে থাকা উচিত।

-শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.

অবতারণী

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও করুণায় আলোর মুখ দেখতে চলেছে অধমের অনূদিত গ্রন্থ 'আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ : ব্যক্তিত্ব, পরিচয় ও অবদান'। যা পরম করুণাময় মহান আল্লাহর দয়া ও ইহসানেই কেবল সম্পন্ন হয়েছে। তাই অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবারও আলহামদুলিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবত ও সান্নিধ্যের বরকতে সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও জীবনাচার ছিল ইসলামী শরীয়তের নিখুঁত প্রতিবিম্ব, ইলম ও আমলের নির্মল প্রতিচ্ছবি। নবীজীর মাধ্যমে তারা যা জানতেন, সে অনুপাতেই আমল করতেন এবং সে পথেই জীবনের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। ইলম ও আমলের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল তাদের জীবনে।

সততা ও সত্যবাদিতা, পুণ্য ও পবিত্রতা, ইখলাস ও আন্তরিকতা, পরোপকার ও কল্যাণকামনা, উদারতা ও বদান্যতা, ত্যাগ ও সহনশীলতা, ধার্মিকতা ও আখেরাতমুখিতা, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা, দাওয়াত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইত্যাদি সকল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই ছিলেন তারা আলোর সুউচ্চ মিনার। যা থেকে পরবর্তী যুগের মানুষ জীবনের পথে আলো গ্রহণ করেছে এবং এখনো গ্রহণ করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। আর হাদীসের ভাষ্য[১] অনুযায়ী উম্মতের মাঝে সৃষ্ট ৭৩ দলের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা রা.-এর মত ও পথের পথিকরাই একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

বস্তুত জীবন থেকে জীবনে আলো গ্রহণের জন্য, পাথেয় সংগ্রহের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তাঁর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামের

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৫৯৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৬৯৩৭

জামাতই হচ্ছেন আমাদের জন্য সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। এজন্যই তো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বড় চমৎকারভাবে বলেছেন,

> مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَبَرَّهَا قُلُوْبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامَةِ دِيْنِهِ، فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُوْهُمْ فِيْ آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ.
>
> যে ব্যক্তি কারও আদর্শ অনুসরণ করতে চায় সে যেন বিগতদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিতরা ফেতনার আশঙ্কামুক্ত নয়। তারা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা। অন্তরের পরিশুদ্ধতা, জ্ঞানের গভীরতা ও আড়ম্বরহীনতায় যারা ছিলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাদেরকে নির্বাচন করেছেন তার নবীর সান্নিধ্যলাভের জন্য এবং তার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সুতরাং তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করো, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং যথাসম্ভব তাদের আখলাক-চরিত্র ও জীবনাদর্শ দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। কেননা তারা ছিলেন হেদায়েতের সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

যুগে যুগে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা পথ চলেছেন, তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন উত্তম আদর্শ, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভারসাম্যপূর্ণ একটি জামাত। আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের সান্নিধ্য-ছোঁয়া যারা লাভ করেছেন এবং তাদের জীবন ও জীবনী সম্পর্কে যারা অবগত আছেন, বলার অপেক্ষা রাখে না, তাদের কাছে এ কথার সত্যতা একেবারে নির্দ্বিধ ও নির্জলা।

বস্তুত, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের পুণ্যস্নাত পবিত্র জীবন ছিল যেন সাহাবায়ে কেরামের মুবারক জামাতেরই ছায়া ও ছাপ। তাই তো আকাবিরে দারুল উলূমের ইলম-আমল, রিয়াযত-মুজাহাদা, তাকওয়া-

২. জামিউল উসুল, হাদীস : ৮০।

তাওয়াযু, দাওয়াত-জিহাদ, সংস্কার-সংশোধন, ইখলাস-লিল্লাহিয়্যাত, ত্যাগ-কুরবানি, আল্লাহপ্রেম ও নবীপ্রেম ইত্যাদি দেখলে জীবন্ত হয়ে ওঠে নবীজীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যময় জীবনের ছবি।

মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, 'আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ যুগত্রয়ের স্মারক, সালফে সালেহীনের দৃষ্টান্ত এবং ইসলামী রুচি-প্রকৃতির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গেলে বড় বড় দফতরও হবে অপর্যাপ্ত। সত্য তো এই যে, তাদের অনন্য ও অতুলনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য শব্দে-বাক্যে তুলে আনা অসম্ভব না হলেও প্রায় অসম্ভব। কেননা তাদের গুণাবলি মূলত সেই স্বভাবপ্রকৃতি ও রুচি-অভিরুচির সাথে সম্পৃক্ত, যা সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ ও জীবনপদ্ধতি থেকে আহরিত। আর স্বভাব-রুচির ক্ষেত্রে কথা হলো, তা অনুভব তো করা যায়, কিন্তু প্রকাশ করা যায় না যথাযথভাবে।'[৩]

হযরত মুফতী সাহেব দা. বা. আরও বলেন, 'মেধা, যোগ্যতা, তথ্যের প্রাচুর্য ও অধ্যয়নের বিস্তৃতির নামই যদি হয় ইলম, তবে সেটা বর্তমান যুগেও খুব একটা অপ্রতুল নয়। কিন্তু আকাবিরে দেওবন্দের আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা জ্ঞানগরিমার সমুদ্র আপন সিনার মাঝে ধারণ করার পরও বিনয়-নম্রতা, আত্মবিলোপ ও আল্লাহমুখিতার ক্ষেত্রে ছিলেন উচ্চতার চূড়াস্পর্শী। বহুচর্চিত একটি প্রবাদ আছে, "ফলভরতি ডাল সবসময় ঝুঁকেই থাকে।" কিন্তু আমাদের যুগে এই প্রবাদের বাস্তব নমুনা যতটা আকাবিরে দেওবন্দের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, ততটা আর কোথাও দেখা যায় না।'[৪]

'আযহারে হিন্দ' খ্যাত 'দারুল উলূম দেওবন্দ' যে সুদীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ করছে, ইসলামের প্রচার-প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়াই করছে, দাওয়াত ইলাল্লাহ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে অবদান রাখছে এবং নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে ইসলামকে আপন রূপ ও স্বরূপে বহাল রাখতে, এ সবই আকাবিরে দারুল উলূমের স্বর্ণোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় অবদান।

---

৩. আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে, পৃষ্ঠা ৩।

৪. আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে, পৃষ্ঠা ৪।

দারুল উলূম দেওবন্দের এই মহান আকাবির উলামায়ে কেরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়েই রচিত আমাদের কিতাব, 'আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ : ব্যক্তিত্ব, পরিচয় ও অবদান'। যা ড. মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ কাসেমী কৃত 'দারুল উলূম দেওবন্দ কি জামে ওয়া মুখতাসার তারিখ' কিতাবের অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ। কিতাবটি আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে পেয়েছিলাম। দাওরা হাদীসের সকল তালিবে ইলমকেই দেয়া হয়েছিল। কী এক প্রয়োজনে বুকশেলফে রাখা কিতাবটি একদিন হাতে নিলে দিলের মধ্যে পাকাপোক্ত ইরাদা পয়দা হয় আলোচ্য অধ্যায়টি অনুবাদ করার। যাতে আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের পুণ্যময় জীবনের অনন্য সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারি; প্রথমে আমি, তারপর বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য পাঠক। যেই ইরাদা সেই বিসমিল্লাহ। অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানীতে খাতিমাহ। ফালিল্লাহিল হামদ।

আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের একেকজন বুযুর্গের কর্মদীপ্ত ও গৌরবময় জীবনের জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র গ্রন্থ। যা আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে অনেকের ক্ষেত্রেই রচিত হয়েছে। কিন্তু সবার পক্ষে সকলের ব্যাপ্ত-বিস্তৃত জীবনী পাঠ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না অনেক সময়। তাই দরকার হয় এমন কোনো সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের, যা সকলের জীবনীকে দুই মলাটের মধ্যে ধারণ করবে এবং পাঠককে স্বল্প সময়ে সকলের জীবন ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে।

হ্যাঁ, আমাদের এ গ্রন্থটি সে প্রয়োজনই পুরো করবে ইনশাআল্লাহ। এতে দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, তথা দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. থেকে শুরু করে বর্তমান মুহতামিম মাওলানা আবুল কাসেম নুমানী দা. বা. ও বর্তমান সদরুল মুদাররিসীন মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী দা. বা. পর্যন্ত প্রায় সকল আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের জীবনীই স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পরিচিতি, কর্ম-কীর্তি ও বিশেষ গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিবেচনায় কারও জীবনী বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে, আর কারও জীবনী লেখা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। যদিও সত্য এই যে, একেকজনের বর্ণাঢ্য ও কর্মদীপ্ত জীবনের বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত-বিস্তৃত

উভয়ভাবে লিখিত জীবনীই সংক্ষিপ্ত।

'আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ' বলতে এই কিতাবে উদ্দেশ্য দারুল উলূম দেওবন্দের সে সকল আকাবির উলামায়ে কেরাম, দারুল উলূমের সাথে যাদের পঠন, পাঠন ও বিশেষ দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক ছিল ও আছে। যেমন : প্রতিষ্ঠাতা, অভিভাবক, মুহতামিম, শায়খুল হাদীস, সদরুল মুদাররিসীন ইত্যাদি। কিতাবে মূলত এ সকল পদাধিকারী ব্যক্তিত্বই স্থান পেয়েছেন। তাই মূল কিতাব লেখার পর এই ধারায় যারা যুক্ত হয়েছেন, অন্যকথায়, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের কাফেলায় শামিল হয়েছেন, অনুবাদগ্রন্থে তাদেরও কারও কারও জীবনী যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি কোনো কোনো জায়গায় গুরুত্ব বা প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু কিছু সংযোজনও করা হয়েছে।

আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের অধীনে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক যুগের আকাবিরের আলোচনা শুরু করার আগে নাম, মৃত্যুসন ও দারুল উলূমের দায়িত্বশীল পদসহ ওই যুগের আকাবিরের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হয়েছে। তারপর প্রত্যেকের জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা, কর্মজীবন, দারুল উলূমের সাথে দায়িত্বশীল সম্পর্ক, বিভিন্ন কীর্তি-অবদান, বিশেষ বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে আমরা আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে যেমন জানতে পারব, তেমনই লাভ করতে পারব চিন্তা ও কর্মের জগতে পুণ্য, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও দ্বীনী চেতনার নতুন নতুন শিক্ষা ও দীক্ষা, ইনশাআল্লাহ।

কিতাবটি পাঠকবর্গের হাতে এসেছে লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকসহ অনেকের চেষ্টা-মেহনতের ফসলরূপে। আর মানুষ ও ভুল যেহেতু জীবনের পথে একান্ত সহযাত্রী, তাই আমাদের যে-কারও থেকেই যেকোনো ভুল, বিচ্যুতি বা অসংগতি থেকে যেতে পারে, যা স্বাভাবিক, একান্তই স্বাভাবিক। তাই এ ধরনের কিছু পরিলক্ষিত হলে প্রিয় পাঠকবর্গের কাছে আশাবাদী, অবশ্যই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সেগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আপনাদের সুমত ও সুপরামর্শ বিবেচনায় নেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

যার করুণার আঁচল ধরে আমরা এই পর্যন্ত পৌছেছি, পরিশেষে সেই রহমান রহীম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেন লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক, সকলকে কবুল করেন, কিতাবটিকে মাকবুলিয়াত দ্বারা মালামাল করেন এবং পাঠকবর্গের জন্য উপকারী সাব্যস্ত করেন। আমীন।

বান্দা

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ হাসান

খাদিমুত তলাবা,
ইদ্রিস আলী বিশ্বাস ইসলামিয়া মাদরাসা,
আল্লারদর্গা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
২৯-০৬-১৪৪৬ হি./০১-০১-২০২৫ খ্রি.

সূচিপত্র

একনজরে প্রথম যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ................. ১৯
হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. ২০
প্রাথমিক জীবন... ২০
স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ ২২
সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন-আন্দোলন... ২২
খ্রিষ্টান পাদরিদের সঙ্গে বিতর্ক-আলোচনা ২৪
শাহজাহানপুর খোদাশেনাসি জনসমাবেশ ২৫
মিরাঠ ও রুড়কির মুনাযারা ২৭
দারুল উলূম দেওবন্দ ও ধর্মীয় শিক্ষা-তৎপরতার সূচনা ২৮
দরসের মসনদে ৩০
দরসে হাদীসের তরীকা ৩১
সহীহ বুখারীর হাশিয়া-সংযুক্তি... ৩২
ইনতেকাল ৩৫
হাজী সাইয়েদ আবেদ হুসাইন দেওবন্দী রহ. ৩৮
গুণগরিমা ও বৈশিষ্ট্য... ৩৮
হাজী আবেদ হুসাইন এবং দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা............. ৪০
দারুল উলূমে মুহতামিমের পদ গ্রহণ ৪১
মৃত্যুবরণ... ৪৩
মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. ৪৬
শিক্ষা ও প্রাথমিক অবস্থা.. ৪৭
হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ইলমী প্রস্রবণ...................................... ৪৮
হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ইলমী স্মারকসমূহ ৫০
হযরত গাঙ্গুহী রহ. এবং দারুল উলূম দেওবন্দ.......................... ৫২
পরলোকগমন.. ৫৩

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. ৫৪
প্রাথমিক জীবন ৫৪
দারুল উলূম দেওবন্দে পদার্পণ ৫৫
উন্নত চরিত্র ও গুণাবলি ৫৬
হজের সফর ৫৮
ইলমী স্মারকচিহ্ন ৫৮
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ৫৯

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ. ৬০
প্রাথমিক অবস্থা ৬০
দারুল উলূমের মুহতামিম পদে আরোহণ ৬১
হিজরত ও ইনতেকাল ৬২

হযরত হাজী সাইয়েদ ফযলে হক দেওবন্দী রহ. ৬৩
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুনির নানুতবী রহ. ৬৪
প্রাথমিক অবস্থা ৬৪
দারুল উলূমের সাথে সম্পর্কস্থাপন ৬৫
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ৬৬

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ. ৬৭
শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. ৬৯
প্রাথমিক অবস্থা ৬৯
ইলম ও তাকওয়ায় যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব ৭০
শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইলমের উচ্ছল প্রবাহধারা ৭২
রচনাবলি ৭৩
জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কীর্তি-অবদান ৭৪
পরকালযাত্রা ৭৭

হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. ৭৮
শুরুর জীবন ৭৮
বাইয়াত ও ইজাযত ৭৮
গুণ ও বৈশিষ্ট্য ৭৯
দারুল উলূমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ ৮১
আখেরাতের সফর ৮১

একনজরে দ্বিতীয় যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ ৮৩
হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ. ৮৪
প্রাথমিক অবস্থা ৮৪
দারুল উলূমে ইহতেমামের মসনদে ৮৫
বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ৮৮
ইনতেকাল ৮৮
হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ. ৯০
প্রাথমিক অবস্থা ও দারুল উলূমের সাথে সম্পৃক্ততা ৯০
সর্ববিবেচনায় অনন্য ব্যক্তিত্ব ৯২
গ্রন্থনা ও রচনা ৯৩
মৃত্যুবরণ ৯৪
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ৯৫
জন্ম ও শিক্ষা ৯৬
প্রাথমিক জীবন ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কস্থাপন ৯৭
থানাভবনে স্থায়ী বসবাস এবং ইলমী ও দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম ৯৭
রচনাসম্ভার ৯৯
ঈর্ষণীয় কিছু গুণ ১০০
দারুল উলূম দেওবন্দের অভিভাবকত্ব ১০১
পরলোকগমন ১০১
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. ১০৩
প্রাথমিক অবস্থা ১০৩
দারুল উলূমের সাথে দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক স্থাপন ১০৫
বহুগুণের আধার অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ১০৫
প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ ১০৯
রচনা ও গ্রন্থসমূহ ১০৯
ইহধামত্যাগ ১১১
হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ১১২
প্রাথমিক অবস্থা ১১২
মসজিদে নববীতে দরসের মজলিসে ১১৩
দারুল উলূমের সদর মুদাররিসের পদে ১১৫
স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃত্বদান ১১৫

সর্বব্যাপী এক ব্যক্তিত্ব ১১৬
রচনাবলি ১১৮
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ১১৯

মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. ১২০
প্রাথমিক অবস্থা ১২০
দারুল উলূমে শিক্ষকতা ও সদর ইহতেমামের দায়িত্ব ১২১
গুণ ও বৈশিষ্ট্য ১২২
রাজনৈতিক অবদান ১২৩
ইলমী অবদান ১২৪
পরকালযাত্রা ১২৫

হযরত মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী রহ. ১২৬
প্রাথমিক অবস্থা ১২৬
মুফতীর ভাবগম্ভীর আসনে ১২৮
আখলাক-চরিত্র ও গুণ-বৈশিষ্ট্য ১২৯
আখেরাতের সফর ১৩১

হযরত মাওলানা ইজায আলী আমরুহি রহ. ১৩২
প্রাথমিক অবস্থা ১৩২
দারুল উলূমে পদার্পণ ১৩৩
রচনাবলি ১৩৫
অনন্তের পথে ১৩৬

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী রহ. ১৩৭
পাকিস্তানের ভূমিতে ১৩৮
হযরত মুফতী সাহেবের ইলমী ফয়েয ১৩৯
রচনাবলি ১৩৯
দারুল উলূম করাচি ১৪১
সুযোগ্য সন্তানবর্গের পিতৃত্ব ১৪১
আল-বিদা ১৪১

একনজরে তৃতীয় যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ ১৪২
হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব কাসেমী রহ. ১৪৩
প্রাথমিক অবস্থা ১৪৩
দারুল উলূমের সাথে দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক ১৪৪
কীর্তি ও অবদানসমূহ ১৪৫
ইলমের স্মারক নিদর্শনসমূহ ১৪৭
শতবর্ষী জলসা ১৪৯
ইনতেকাল ১৪৯

হযরতুল আল্লাম মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. ১৫১
প্রাথমিক অবস্থা ১৫১
দারুল উলূমের পুণ্যভূমিতে ১৫২
সুমহান ইলমী ব্যক্তিত্ব ১৫৩
মৃত্যুবরণ ১৫৪

হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেব রহ. ১৫৫
প্রাথমিক অবস্থা ১৫৫
দারুল উলূমের পুণ্যভূমিতে ১৫৬
ইলমী ও জাতীয় অবদানসমূহ ১৫৮
পরলোকগমন ১৫৮

হযরত মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী রহ. ১৬০
প্রাথমিক অবস্থা ১৬০
দারুল উলূমে আগমন ১৬১
গুণগরিমা ও চারিত্রিক পূর্ণতা ১৬২
রচনাসম্ভার ১৬৩
ইহধামত্যাগ ১৬৪

হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ. ১৬৫
প্রাথমিক অবস্থা ১৬৫
দারুল উলূমের মাটিতে ১৬৬
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ১৬৬

হযরত মাওলানা শরীফ হাসান দেওবন্দী রহ. ১৬৭
প্রাথমিক অবস্থা ১৬৭

দারুল উলূম দেওবন্দে ১৬৮
পরলোকযাত্রা ১৬৮
একনজরে বর্তমান যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬৯
হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী রহ. ১৭০
প্রাথমিক অবস্থা ১৭০
দারুল উলূমের সাথে সংশ্লিষ্টতা ১৭২
ইনতেকাল ১৭৬
হযরত মাওলানা মিরাজুল হক দেওবন্দী রহ. ১৭৭
প্রাথমিক অবস্থা ১৭৭
দারুল উলূমের মাটিতে ১৭৮
মৃত্যুবরণ ১৭৯
হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান বুলন্দশহরী রহ. ১৮০
প্রাথমিক অবস্থা ১৮০
দারুল উলূমে দরসের মসনদে ১৮১
প্রশংসনীয় গুণাবলি ১৮৩
পরলোকগমন ১৮৪
হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. ১৮৫
প্রাথমিক অবস্থা ১৮৫
দারুল উলূমের সারযমিনে ১৮৬
পূর্বসূরিদের স্মৃতি জাগরণকারী ব্যক্তিত্ব ১৮৭
ইহধামত্যাগ ১৮৯
হযরত মুফতী নিযামুদ্দিন আযমী রহ. ১৯০
প্রাথমিক অবস্থা ১৯০
দারুল উলূম দেওবন্দে ১৯১
রচনাবলি ১৯১
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ১৯২
হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ রহ. ১৯৩
প্রাথমিক অবস্থা ১৯৩
দারুল উলূমে ১৯৫
বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা ১৯৫

পরলোকযাত্রা ১৯৬

হযরত মাওলানা মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরী রহ. ১৯৭
প্রাথমিক অবস্থা ১৯৭
দারুল উলূম দেওবন্দে আগমন ১৯৯
প্রশংসনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য ১৯৯
রচনাবলি ২০১
আখেরাতের সফর ২০৩

হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ওয়াস্তানবী ২০৫
হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী ২০৭
প্রাথমিক অবস্থা ২০৭
দারুল উলূম দেওবন্দে পদার্পণ ২০৯

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী ২১১
প্রাথমিক অবস্থা ২১১
দারুল উলূমের সারযমিনে ২১২
ধর্মীয়, জাতীয় ও জনকল্যাণমূলক খেদমতসমূহ ২১৩
ইলমী অবদানসমূহ ২১৪

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. বলেন, বুযুর্গদের ঘটনা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অন্যতম বাহিনী। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তরকে শক্তিশালী করেন। কেউ তার কাছে এই বক্তব্যের দলীল জানতে চাইলেন। তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِى هَٰذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

তরজমা: রাসূলগণের ঘটনাবলি থেকে আমি আপনার কাছে সে সকল ঘটনাবলি বর্ণনা করছি, যেসবের মাধ্যমে আমি আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করি। (এটা তো একটি উপকারিতা) তা ছাড়া সেই ঘটনাবলির মধ্যে আপনার কাছে এমন সব বার্তা ও পয়গাম পৌঁছেছে, যেগুলো স্বয়ং সত্য ও যথার্থ এবং মুসলমানদের জন্য নসীহত ও (সৎকর্মশীলদের জন্য) স্মারক।

—সূরা হুদ, (১১) ১২০

একনজরে প্রথম যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ

ক্র.	নাম	মৃত্যুসন	পদ
১	হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.	১২৯৭ হি./ ১৮৮০ খ্রি.	প্রতিষ্ঠাতা ও অভিভাবক
২	হযরত হাজী সাইয়েদ আবেদ হুসাইন দেওবন্দী রহ.	১৩৩১ হি./ ১৯১৩ খ্রি.	প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম
৩	হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.	১৩২৩ হি./ ১৯০৫ খ্রি.	অভিভাবক
৪	হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ.	১৩০২ হি./ ১৮৮৪ খ্রি.	শায়খুল হাদীস ও সদর মুদাররিস
৫	হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ.	১৩০৮ হি./ ১৮৯০ খ্রি.	মুহতামিম
৬	হযরত হাজী সাইয়েদ ফযলে হক রহ.	১৩১৫ হি./ ১৮৯৮ খ্রি.	প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম
৭	হযরত মাওলানা মুনির নানুতবী রহ.	১৩২১ হি./ ১৯০৩ খ্রি.	মুহতামিম
৮	হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ.	১৩১১ হি./ ১৮৯৪ খ্রি.	শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন
৯	শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ.	১৩৩৯ হি./ ১৯২০ খ্রি.	অভিভাবক, শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন
১০	হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী রহ.	১৩৩৭ হি./ ১৯১৯ খ্রি.	অভিভাবক

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.

(জন্ম : ১২৪৮ হি./১৮৩৩ খ্রি., মৃত্যু : ১২৯৭ হি./১৮৮০ খ্রি.)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসেম নানুতবী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সারির চিন্তক, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা, দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের রাহবার ও অগ্রনেতা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর জ্ঞানধারার শেষ দিককার অন্যতম শিষ্য। একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞানের যেমন সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই ছিলেন হিন্দুস্তানের বাছাইকৃত আকাবির উলামায়ে কেরামের শিক্ষক ও দীক্ষকও। স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্ভীক সেনাপতির ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি মুনাযির ও মুবাল্লিগ হিসাবেও কাজ করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে প্রতিরোধমূলক বহু কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন।

প্রাথমিক জীবন

জন্মগ্রহণ করেন সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত নানুতা নামক এলাকায়, যা সাহারানপুরের অদূরেই অবস্থিত একটি রত্নগর্ভা উপশহর। জন্মতারিখ, শাওয়াল ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক মার্চ ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ। পিতা শায়েখ আসাদ আলী। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নিজ এলাকার মক্তব থেকে। এরপর গমন করেন দেওবন্দে। এখানে কিছুদিন পড়াশোনা করেন মাওলানা মেহতাব আলী সাহেবের মক্তবে। তারপর গমন করেন সাহারানপুরে নানাজান মাওলানা ওয়াজিহুদ্দীনের কাছে। নাহু-সরফের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এখানেই অবস্থান করে।

১২৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী রহ. নানুতবী রহ.-কে দিল্লি নিয়ে যান। সেখানে মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী রহ.-এর কাছে পড়েন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ কিতাব। দিল্লি কলেজেও ভর্তি হন, কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষায়

অংশগ্রহণ করেননি। সর্বশেষ হাজির হন ইলমের সেই মজলিসে, যা কুরআন ও হাদীসের পাঠদানের ক্ষেত্রে ভোগ করত গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কেন্দ্রীয় মর্যাদা। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর ইলমের মসনদকে আলোকিত করে রেখেছিলেন শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী রহ.। নানুতবী রহ. তারই সান্নিধ্য ও সন্নিধান থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেন।

হযরত নানুতবী রহ.-এর বিনয়-নম্রতা ও নির্মুখাপেক্ষিতা এই পর্যায়ে পৌছেছিল যে, উলামায়ে কেরামের সাধারণ বেশভূষা তথা পাগড়ি ইত্যাদিও কখনো ব্যবহার করতেন না। মানুষ তার প্রশংসা করুক, তার গুণকীর্তন করুক, এটাও পছন্দ করতেন না কখনো। তাই তো কেউ সম্মান করলে বা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানালে খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন। যেসব কর্মকাণ্ডে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, সাধারণত তিনি তা থেকে দূরে, বহুদূরে থাকার চেষ্টা করতেন।

হজ পালনের উদ্দেশ্যে ১২৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। হজ থেকে ফিরে এসে মিরাঠ মুজতবয়ি প্রেসে প্রুফ দেখার চাকরি গ্রহণ করেন। ১২৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ওই প্রেসেই কাজ করতে থাকেন। এ সময় তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য হজ পালন করতে যান। তারপর মিরাঠ হাশেমী প্রেসে চাকরি গ্রহণ করেন। এসব কাজকর্মের মধ্যেও তিনি বরাবর দরস-তাদরিসের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে সরাসরি মাদরাসার খেদমত গ্রহণ করেননি।

হযরত নানুতবী রহ. যাহেরী ইলমের পাশাপাশি বাতেনী ইলমের প্রতিও মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। ফলে তাকওয়া, খোদাভীরুতা ও হাজী সাহেবের সুদৃষ্টি লাভ করেন এবং তারই বদৌলতে সুলুক ও মারেফতের উঁচু স্তরে উন্নীত হন। সেইসাথে খেলাফত ও ইজাযত লাভেও হন ধন্য। ইলমী পরিপক্বতা, পার্থিব নির্মোহতা, সংযম ও খোদাভীরুতা এবং ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের কারণে হযরতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছিল হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর অন্তরে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ

হযরত নানুতবী রহ. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শুধু বীরোচিত দুঃসাহসী ভূমিকাই পালন করেননি, বরং হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনায় চিফ কমান্ডারের পদও লাভ করেছিলেন তিনি। হাজী সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত মুজাহিদদের জামাত মুযাফফরনগর জেলাস্থ শামেলী বিজয় করেছিল। কিন্তু সেই সময়ের বিকৃত-বিধ্বস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেয়নি। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলায় ভারতীয় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়, নানুতবী রহ.-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় এবং জেল-জুলুমের শিকার করা হয় অসংখ্য মুসলমানকে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে হযরত নানুতবী রহ. এবং তার সাথি-সঙ্গীদের কীর্তি ও অবদান ভারতীয় ইতিহাসের আলোকিত অধ্যায় হয়ে আছে এবং আলোকিত অধ্যায় হয়েই থাকবে। মূলত তারাই ভারতবাসীদের অন্তরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন এবং দখলদার ইংরেজ কর্তৃত্বের জোয়াল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তারই শিষ্যরা, বিশেষ করে শায়খুল হিন্দ রহ. ও তার ছাত্ররা নানুতবী রহ.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরেজদের বিতাড়িত করেছেন এ দেশের মাটি থেকে।

সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন-আন্দোলন

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. তখনকার মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শেকড় গেড়ে বসা বিদআত ও কুসংস্কারের মোকাবিলায় সফল কর্মতৎপরতা চালিয়েছেন এবং তাবলীগী ও ইসলাহী তথা প্রচারমূলক ও সংস্কারমূলক কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন। এই ধারা ও ধারাবাহিকতারই একেকটি সোনালি অধ্যায় হচ্ছে, 'বিধবাদের বিয়ের প্রচলন', 'তাযিয়া-কেন্দ্রিক কুপ্রথার অপনোদন' এবং 'দেওবন্দবাসীদের থেকে বিদআত-কুসংস্কার বর্জনের ওপর লিখিত অঙ্গীকারগ্রহণ' ইত্যাদি।

তেরো শতকের শেষ পর্যন্ত বিধবা-বিবাহকে মনে করা হতো চরম দূষণীয় ও নিন্দনীয় বিষয়। কিন্তু এই কুসংস্কার দূর করার মতো সৎসাহস ছিল না কারও। পরে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী, মাওলানা মুযাফফর হুসাইন কান্ধলবী, মাওলানা মুহাম্মদ আহসান নানুতবী

ও মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ.-এর সৎসাহস ও সুপ্রচেষ্টায় এই কুসংস্কার দূর হওয়া শুরু হয় এবং ব্যাপক প্রচলন ঘটে বিধবা-বিবাহের। হযরত নানুতবী রহ. নিজে তার বয়সে বড় ও বৃদ্ধা বোনকে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং এই কুপ্রথাকে এমনভাবে দূর করে দেন যে, আজ অনেকেই জানে না, এ অঞ্চলে একসময় এই কুপ্রথার চল ছিল।

ভারত উপমহাদেশে মুসলিম ও হিন্দুদের সহাবস্থানের ফলে মেয়েদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করার প্রথাও লাভ করেছিল ব্যাপকতা। হযরত নানুতবী রহ. সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনের অংশ হিসাবে এদিকেও মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তার কুফল তুলে ধরেন। তারই চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার ফলে মুযাফফরনগর, সাহারানপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ এই অবিচারমূলক প্রথা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয় এবং তাদের মধ্যে নতুন করে অনুভূতি জাগ্রত হয় মেয়েদের মিরাসের বিষয়ে। সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে, বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে এবং নারীদের অধিকার নিশ্চিতকরণে হযরতের কর্মপ্রচেষ্টা থেকেই অনুমান করা যায়, ইসলামী বিধিবিধান বাস্তবায়নে কেমন ব্যাকুল, বে-কারার ছিলেন তিনি।

দেওবন্দের অধিকাংশ পরিবার ছিল সুন্নী মুসলমান। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ভালো ভালো মুসলিম ঘরানার মধ্যেও শিয়াদের কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মুসলমানদের বিরাট একটা শ্রেণি শিয়াদের আচার-অনুষ্ঠান ও তাযিয়া-প্রথায় লিপ্ত ছিল। এমনকি দেওবন্দের প্রসিদ্ধ 'মহল মসজিদে' তাযিয়া রাখা হতো এবং মুহাররম মাসে তা ওঠানো হতো। তখন বহনকারীদের সিংহভাগই হতো মুসলমানরা। অবশ্য কিছু শিয়া ঘরানাও অংশগ্রহণ করত। হযরত নানুতবী রহ.-এর চেষ্টা-তদবিরের ফলে সেটারও রোকথাম হয়।

মুঘল আমলের শেষদিকে এসে ব্রাহ্মণদের যে-সকল বারাহ বংশীয় সরদার 'বাদশাহগর' তথা বাদশাহ নিয়োগ ও বিয়োগের বিষয়টি যাদের হাতে ছিল, তাদের অনেকে বসতি গেড়েছিল সাহারানপুর ও মুযাফফরনগরের আশেপাশে। নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করে তারা সেখানে মুঘল শাসনামলে এবং পরে অন্যদের শাসনামলেও শিয়া মতবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছিল। এরা ছিল শিয়া মতবাদে কট্টরবাদী ও চরমপন্থি। হযরত আলী রা.-কে খোদা বলে মনে করত। হযরত নানুতবী রহ. এসব

এলাকায়ও তার চেষ্টা-মেহনত অব্যাহত রাখেন। ফলে খানজাহানপুর, রথিড়ি ও মনসুরপুরে অবস্থিত 'বারহি সাদাত'[৫] পরিবারগুলো হযরতের হাতে তাওবা করে এবং এমন ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয় যে, শেষে তারাই হয়ে যায় হযরতের প্রত্যেক মিশনের সাথি এবং প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গী।

হযরত নানুতবী রহ. বিদআত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করতে এবং মুসলমানদেরকে সীরাতে মুসতাকিমের পথে নিয়ে আসতে ওয়াজ-নসীহতের পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকাও পালন করেছিলেন এবং বিদআত ও কুসংস্কার বর্জনে দেওবন্দের মুসলমানদের থেকে একটি লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের ধারাবাহিক বিবরণ ছিল। এই অঙ্গীকারনামা শুধু কাগজ-কলমেরই অংশ ছিল না, বরং বাস্তব জীবনেও তা এমনই প্রভাবক প্রমাণিত হয়েছিল যে, বিবাহ-শাদির প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান ও অপচয়-অপব্যয় বন্ধ হয়ে যায়, মৃত্যুপরবর্তী অনুষ্ঠেয় তেসরা, চল্লিশা ইত্যাদির রোকথাম হয়ে যায় এবং মৃতদের ইসালে সওয়াবের তরীকা হয়ে যায় শরীয়তের অনুকূল। এভাবে আরও বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ও বিদআত-কুসংস্কার বন্ধ হয়ে যায় হযরতের দাওয়াতী ও সংস্কারমুখী ভূমিকার কল্যাণে।[৬]

হযরত নানুতবী রহ. তার বিভিন্ন পুস্তিকা ও দীর্ঘ চিঠিপত্রে শিয়া ও গায়রে মুকাল্লিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন। এভাবে লেখালেখি ও বক্তৃতা উভয়ের মাধ্যমেই তিনি ইসলামের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত সফল ও সার্থকভাবে।

খ্রিষ্টান পাদরিদের সঙ্গে বিতর্ক-আলোচনা

ভারতবর্ষের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য অটুট ও দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার জন্য ইংরেজরা দেশব্যাপী মিশনারির জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে দিল্লি ও দিল্লির আশপাশের মুসলমানরা ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তু। হযরত

৫. বারহি সাদাত তথা হযরত যায়েদ ইবনে যাইনুল আবিদিন রহ.-এর সন্তানবর্গ। পিতার দিকে নিসবত করে তাদের 'যায়েদি' বলা হয়। বারাহা শরিফ থেকে আসার কারণে তাদের 'বারহি'-ও বলা হয়। তাদের অধিবাস বেশিরভাগ হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, করাচি ও সিন্ধুর জেলাসমূহের মধ্যে।

৬. আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন, সাওয়ানিহে কাসেমি, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি, ২/১৫-৭৬।

মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী রহ. এবং অন্যান্য মুখলিস ও সত্যনিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম খ্রিষ্টধর্মের পিছু নেন এবং ভারতবর্ষকে খ্রিষ্টান হওয়ার ব্রিটিশ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন। হযরত নানুতবী রহ.-ও অংশগ্রহণ করেন এই বৃহৎ আন্দোলনে। হযরতের দিল্লি অবস্থানকালে পাদরিরা যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ইসলাম ও ইসলামের নবীর ওপর বিভিন্ন আপত্তি তুলতে থাকে, যার উত্তর কেউ দিতে পারছিল না, তখন হযরত নানুতবী রহ. আপন শাগরিদদেরকে ওয়াজ-নসীহত করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, যেখানেই তারা ওয়াজ পেশ করবে তোমরাও সেখানে পালটা ওয়াজ পেশ করবে।

একবার মুনাযারা ও বিতর্ক-আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি হয় এভাবে যে, নানুতবী রহ. সাধারণ পোশাক পরে খ্রিষ্টান পাদরি তারাচাঁদের কাছে যান এবং দু-চার কথায় তাকে এমনভাবে ফাঁসিয়ে দেন যে, বেচারা একেবারে লা-জবাব বনে যায়! কোনো কথাই সরে না তার মুখ থেকে। ফলে সে জনসম্মুখে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়।

এরপর নানুতবী রহ.-এর পরিচয় গড়ে ওঠে প্রসিদ্ধ মুনাযিরে ইসলাম মাওলানা আবুল মানসুর নাসিরুদ্দীন আলী দেহলভী রহ.[৭]-এর সাথে। উভয়ের মধ্যে ইলমী সম্পর্ক বহাল থাকে। ফলে বিতর্ক-মুনাযারার ময়দানে আরও এগিয়ে যান হযরত নানুতবী রহ.।

শাহজাহানপুর খোদাশেনাসি জনসমাবেশ

ইংরেজ প্রশাসন হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষে পূর্ব থেকেই মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রভাব, প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। কিন্তু ইংরেজরা আপন পলিসি হিসাবে হিন্দুদের আগে বাড়িয়ে দেয় এবং মুসলমানদের দেয় পেছনে ঠেলে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন হিন্দুরা আগে বেড়ে যায়, তখন ইংরেজরা তাদেরকে তাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের পথ দেখায় এবং মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হয়ে বিতর্ক করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে দেয়। সেইসাথে তৈরি করে দেয় তার বিভিন্ন উপলক্ষও। যাতে হিন্দুরা মুসলমানদের মোকাবিলায় খোল্লমখোল্লা বিতর্কে নামতে পারে।

---

৭. মৃত : ১৩২০ হিজরি মোতাবেক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে।

৮ মে ১৮৭৬ সনে ইউপির শাহজাহানপুরের নিকটস্থ চাঁদপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় 'খোদাশেনাসি জনসমাবেশ' নামে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান, যাতে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান তিন ধর্মেরই মুখপাত্রদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল এবং ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বলা হয়েছিল যে, তারা নিজ নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করবে। ঐতিহাসিক এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল স্থানীয় বিশিষ্ট জমিদার পিয়ারে লাল কাবির ও পাদরি নোলসের সভাপতিত্বে এবং শাহজানপুরের কালেক্টর রবার্ট জর্জের অনুমোদনে।

মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে তাশরিফ নিয়ে যান হযরত নানুতবী রহ.। যখন আলোচনা শুরু হয় তখন হিন্দুদের প্রতিনিধি লালাজি কামাল সতর্কতার সঙ্গে অস্পষ্ট ও অর্থহীন কিছু কথা বলে নিজেকে আলোচনা থেকে গুটিয়ে নেন। ফলে আলোচনার বিষয়টি বাকি থেকে যায় কেবল মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মাঝে। খ্রিষ্টানদের পক্ষে ছিলেন পাদরি নোলস ও ইংল্যান্ডের অন্যান্য পাদরি। আর হযরত নানুতবী রহ.-এর নির্দেশে মুসলমানদের পক্ষে ছিলেন হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ., মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. ও মাওলানা সাইয়েদ আবুল মানসুর রহ.। প্রথম দিন এ সকল হযরত পাদরিদের প্রতিটি আপত্তির শুধু জবাব দিয়ে যান। কিন্তু পরেরদিন মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. সরাসরি নিজেই অংশগ্রহণ করেন আলোচনায়। ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করতে এবং শিরক ও ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করতে তিনি এমন সুদৃঢ় ও সুসংহত দলিল-প্রমাণ পেশ করেন যে, মজলিসজুড়ে উচ্চারিত হতে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি। এভাবে হযরতের কল্যাণে সেখানে সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত হয়ে যায় ইসলামের হক্কানিয়াত ও সত্যতা।

দ্বিতীয় বছর মার্চ ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১২৯৪ হিজরিতে মুনশি আন্দরমল মুরাদাবাদী এবং আরিয়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দিয়ানন্দ সরস্বতিও একটা পক্ষ হিসাবে অংশ নেন খোদাশেনাসি অনুষ্ঠানে। পৃথিবীর বৃহৎ দুটি ধর্ম, তথা খ্রিষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের অনুসারীদের যুগপৎ সম্বোধন করার এবং সত্য-সঠিক ধর্ম ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগকে হযরত নানুতবী রহ. গনিমত মনে করেন এবং সুন্দরমতো আলোচনা পেশ করার জন্য বাড়তি সময় নেয়ারও চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্ভব না হলে সংকল্প করেন যেকোনোভাবেই সত্যের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার। ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত

ছিল প্রথমে পণ্ডিত সাহেব বক্তৃতা পেশ করবেন। কিন্তু তার পালা এলে অপারগতা প্রকাশ করে দেন। তখন হযরত নানুতবী রহ. আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ এবং তাওরাতের বিকৃতির ওপর দীর্ঘ আলোচনা শুরু করেন এবং আলোচনার পাশাপাশি একে একে প্রতিটি প্রশ্ন ও আপত্তির উত্তরও দিতে থাকেন। যা উপস্থিত জনতাকে করে দেয় যারপরনাই মুগ্ধ-অভিভূত।

তাই তো হযরতের বক্তৃতা সম্পর্কে একজন ইউরোপিয়ান পাদরি মন্তব্য করে বলেন, বহু অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি, বহু মুসলিম আলেমের সাথে কথা বলেছি, কিন্তু এমন অসাধারণ বক্তৃতা কখনো শুনিনি এবং এমন অসাধারণ আলেমও দেখিনি। হাড্ডিসার দেহ। ময়লাক্ত কাপড়। দেখে মনেই হয় না তিনি কোনো আলেম। বলতে পারি না, তিনি সত্য বলছিলেন নাকি মিথ্যা বলছেন। তবে সত্য হলো, কোনো বক্তৃতার প্রতি যদি আমি বিশ্বাস করতাম তাহলে এ ব্যক্তির বক্তৃতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে পারতাম না।

হযরত নানুতবী রহ. খোদাশেনাসি অনুষ্ঠানে পরপর দু-বছর অংশগ্রহণ করে এভাবেই নস্যাৎ করে দেন ইসলামবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র।

মিরাঠ ও রুড়কির মুনাযারা

১২৯৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হজ থেকে ফেরার পথে জিদ্দায় পৌঁছে হযরত নানুতবী রহ. খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শরীর কিছুটা ভালো হলেও অসুস্থতা লেগেই থাকে। ওই বছরেই শাবান মাসে রুড়কি থেকে খবর আসে, আরিয়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দিয়ানন্দ সরস্বতি ইসলামধর্মের প্রতি আপত্তির বান চালাতে শুরু করেছে। ফলে মুসলমানদের অন্তরে আছড়ে পড়ছে ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার ঢেউ। রুড়কির দায়িত্বশীলগণ হযরতের খেদমতে দরখাস্ত পেশ করেন সেখানে তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে না গিয়ে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ., মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. ও মাওলানা আবদুল আদল রহ.-কে পাঠিয়ে দেন পণ্ডিত সাহেবের সাথে আলোচনা করার জন্য।

তিনজনই ছিলেন হযরত নানুতবী রহ.-এর শাগরিদ। পণ্ডিত সাহেব কোনো মূল্যেই তাদের সাথে কথা বলতে প্রস্তুত হলেন না। না পেরে শেষে অসুস্থতাকে সঙ্গে নিয়েই রুড়কি গমন করেন হযরত নানুতবী রহ.।

তারপর পত্রালাপ শুরু করেন পণ্ডিত সাহেবের সাথে। হাজারো অজুহাত দেখিয়ে শেষমেশ পালিয়ে বাঁচে পণ্ডিত সাহেব। নানুতবী রহ. শাগরিদদের শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াজ-নসীহত করার এবং আরিয়া সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরার নির্দেশ দেন। শেষ তিনদিন তিনি নিজেও আলোচনায় অংশ নেন এবং যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ দলিল-প্রমাণসহ তাদের বিভিন্ন আপত্তির জবাব দান করেন। হযরতের দালিলিক আলোচনায় অমুসলিমরা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে।

পণ্ডিত দিয়ানন্দ সরস্বতি রুড়কি থেকে পালিয়ে মিরাঠে চলে যায়। সেখানেও ইসলামধর্মের সত্যতার ওপর বিভিন্ন আপত্তি তুলতে থাকে। তখন মিরাঠীয় মুসলমানদের আবেদনে হযরত নানুতবী রহ. মিরাঠ গমন করেন। পণ্ডিত সাহেব এবারও হযরতের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত হলো না। তখন আর কীই-বা করার থাকে! মিরাঠের এক জনসমাবেশে উপস্থিত হয়ে হযরত নানুতবী রহ. অগ্নিঝরা বক্তৃতা পেশ করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের সকল আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব প্রদান করেন।

এভাবেই হযরত নানুতবী রহ. ও তার শাগরিদদের হিম্মত ও সাহসিকতার কল্যাণে আরিয়া সমাজের ফেতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দিবসের আলোর মতোই সুপ্রতিভাত হয়ে ওঠে ইসলামের স্বচ্ছ-সুনির্মল আলো।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও ধর্মীয় শিক্ষা-তৎপরতার সূচনা

হযরত নানুতবী রহ.-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, ভারত উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে শিক্ষা-তৎপরতার উদ্বোধন ঘটানো। তদানীন্তন সরকার যখন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে খ্রিষ্টীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চায়, ঠিক তখনই নতুন এক ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলন শুরু করেন হযরত নানুতবী রহ.। যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এমন এক প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও উপলব্ধির দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হবে এবং মুসলমানদের শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্মের হেফাজতে সান্ত্রির ভূমিকা পালন করবে। এই চেতনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি অন্যান্য আকাবির উলামা-মাশায়েখের সহায়তায় দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন।

প্রতিষ্ঠার পর হযরত নানুতবী রহ. নবপ্রতিষ্ঠিত এই দ্বীনী ইদারার তদারকি

ও তত্ত্বাবধান যেমন করতে থাকেন, তেমনই তার উন্নয়ন ও উন্নতির চেষ্টাও অব্যাহত রাখেন। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি পৌঁছে যায় উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চ শিখরে। দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠায় উলামায়ে কেরামের যে জামাতটি ছিল তার মধ্যে হযরত নানুতবী রহ.-এর ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বাধিক উজ্জ্বল। দারুল উলূমের যে উন্নতি-অগ্রগতি হয়েছে, তা মূলত হযরত নানুতবী রহ.-এরই চিন্তাধারার সবুজ ফসল।

দারুল উলূম দেওবন্দের রূপে উত্থিত ধর্মীয় শিক্ষা-আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল, দীর্ঘস্থায়ী ও গতিশীল করার জন্য হযরত নানুতবী রহ. একটি দুসতুরুল আমল বা কর্মপন্থাও তৈরি করেন, যাতে তুলে ধরেছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের জন্য এবং তার ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মাদরাসার জন্য কিছু নীতিমালা। যা কেবল দারুল উলূম দেওবন্দের জন্যই নয়, গোটা ভারত উপমহাদেশের সকল মাদরাসার জন্য দিগ্‌নির্দেশক নীতিমালা বা মৌলিক সংবিধানের মান রাখে।

হযরত নানুতবী রহ. স্বীয় ঈমানী দূরদর্শিতায় মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া ক্ষমতার উত্তম বিকল্প বলে মনে করতেন, শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং সেটাকে করতে হবে উন্নত থেকে উন্নততর। তাই এর গুরুত্ব বিবেচনায় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা এবং তার নিয়মতান্ত্রিক উত্তম ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পুরো দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেন দ্বীনী মাদরাসাসমূহের জাল। মুরাদাবাদ, গিলাউঠি, আমরুহা ও মুযাফফরনগরে গিয়ে স্বয়ং নিজে মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আপন ভক্ত-অনুরক্তদেরও মৌখিকভাবে এবং চিঠির মাধ্যমে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দিগ্‌নির্দেশনা দেন। তা ছাড়া বেরেলীর আকাবির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শে 'মিসবাহুত তাহযিব' নামে একটি মাদরাসা এবং 'মাদরাসায়ে ইসলামী' নামে মিরাঠে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। এভাবে তার জীবদ্দশায়ই প্রতিষ্ঠা লাভ করে বহু দ্বীনী মাদরাসা। হযরতের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত মুরাদাবাদের শাহী মুরাদাবাদ মাদরাসা ও আমরুহার জামে মসজিদ মাদরাসা আজও বহাল আছে এবং দ্বীনী ও ইলমী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছে।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর এ ধারার মাদরাসা একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারত উপমহাদেশের

সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও তার সিলসিলা জারি হয়। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পাশাপাশি আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বার্মা, তিব্বত, সিলন (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দেশসমূহে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দারুল উলূম দেওবন্দেরই মানহাজ ও ধারায়। সবগুলো মাদরাসা নিজ নিজ কর্মতৎপরতা চালু রেখেছে হযরত নানুতবী রহ. প্রণীত উসুল ও নীতিমালার আলোকে। দারুল উলূম দেওবন্দসহ অন্যান্য মাদরাসা কেবল এই নীতিমালার ওপরই চলে তা নয়, বরং এটাকে মনে করে নিজেদের কামিয়াবি ও সফলতারও প্রতিভূ।

দরসের মসনদে

হযরত নানুতবী রহ. ইলম হাসিল করার পর কিছুদিনের জন্য দিল্লি দারুল বাকা মাদরাসায় দরস-তাদরিসের দায়িত্ব পালন করেন। মাদরাসাটি বাদশাহ শাহজাহান দিল্লি জামে মসজিদের ডানপার্শ্বে নির্মাণ করেছিলেন এবং ১৮৫৭ সনে ইংরেজরা তা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

অতঃপর জীবন-জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে দিল্লি আহমদী প্রেসে প্রুফ রিডিংয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর শেষ পর্যন্ত মিরাঠ মুজতবায়ী প্রেসে ও হাশেমী প্রেসে প্রুফ রিডিংয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া কোনো মাদরাসার খেদমত তিনি গ্রহণ করেননি। অবশ্য প্রুফ রিডিংয়ের পাশাপাশি দরস-তাদরিসের সিলসিলাও জারি ছিল। তিনি সিহাহ সিত্তাহসহ *মসনবী শরীফ* ও অন্যান্য কিতাবেরও পাঠদান করেছেন। তার এই দরসদান কোনো মাদরাসায় ছিল না; ছিল মসজিদে, প্রেসে এবং বাসায়। বিশেষ বিশেষ ছাত্রই কেবল অংশগ্রহণ করত তার দরসে।

১৮৫৭-এর পর হযরত নানুতবী রহ. যখন আত্মগোপন করেন, তখন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ.-কে *সহীহ বুখারীর* কিছু অংশ পড়ান। তারপর যখন মিরাঠ প্রেসে চাকরি গ্রহণ করেন, তখন তালিবে ইলমের এক জামাতকে *সহীহ মুসলিমের* দরস দেন। যাদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ.-ও ছিলেন। সে সময় *মসনবী শরীফেরও* দরস দিতেন।

তারপর যখন দারুল উলূম দেওবন্দের কার্যক্রম শুরু হয় আর তিনিও দেওবন্দ চলে আসেন, তখন দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও হাদীসের বিভিন্ন কিতাবের

দরস দেন। দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে তার জ্ঞানের ঝরনাধারা থেকে নিজেদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেন বহু তালিবে ইলম। যাদের অনেকে প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের কাফেলায় শামিল হয়েছেন পরে। উল্লেখযোগ্য হলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী, মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী ও মাওলানা রহীম উল্লাহ বিজনুরী রহ. প্রমুখ। এ সকল যোগ্য ও গুণধর ছাত্রদের কল্যাণেই পরবর্তী সময়ে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে হযরত নানুতবী রহ.-এর ইলম ও মারেফত।

উলূমে আরাবিয়্যার পঠনপাঠন, মাদরাসায় অবস্থান গ্রহণ এবং জামাতবন্দি ও শ্রেণিবিন্যাসের যে পদ্ধতি আজ আমাদের মাঝে প্রচলিত, পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামের পদ্ধতি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণত তারা নিজ বাড়িতে কিংবা মসজিদে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দরস দান করতেন, আর জীবন-জীবিকা লাভের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য করতেন কিংবা আল্লাহর ওপর ভরসা করে চলতেন। পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিকূলতার মাঝেও হযরত নানুতবী রহ. আকাবির-আসলাফের রীতি-পদ্ধতিকেই হিম্মত, দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন, যা সত্যিই ছিল অতুলনীয়।

দরসে হাদীসের তরীকা

হাদীসের পাঠদানে হানাফী মাযহাবকে প্রামাণ্য ও অগ্রগণ্য করার রীতি এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি, যা আজ দারুল উলূম দেওবন্দের অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং যা প্রায় সকল মাদরাসায়ই দরসে হাদীসের ক্ষেত্রে প্রচলিত, এটাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে হযরত নানুতবী রহ.-এর রয়েছে বিরাট অবদান। হিজরী তেরো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হাদীসের দরসের ক্ষেত্রে কেবল হাদীসের তরজমা এবং চার মাযহাব বর্ণনা করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে যখন জোরেশোরে এই আপত্তি করা শুরু হলো যে, হানাফীদের মাযহাব হাদীস সমর্থিত নয়, তখন হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব রহ. এবং তার কতিপয় শাগরিদ এদিকে মনোনিবেশ করেন এবং হানাফী মাযহাবকে প্রমাণিত ও অগ্রগণ্য করতে সচেষ্ট হন। দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত মাওলানা নানুতবী রহ. ও হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ রহ.-সহ অন্যান্য আসাতেযায়ে কেরাম এই পদ্ধতিই

গ্রহণ করেন এবং তার এতটা উন্নতি ও প্রচলন ঘটান যে, আজ হাদীসের কোনো প্রসিদ্ধ দরসগাহই মুক্ত নয় হাদীসের দরসদানের এই পদ্ধতি থেকে।

তবে হযরত নানুতবী রহ.-এর দরস থেকে কেবল সে সকল তালিবে ইলমই পূর্ণ ইসতেফাদা করতে পারত, যারা মেধাবী ও প্রতিভাবান হতো এবং দরসে উপস্থিত হওয়ার আগে গভীরভাবে মুতাআলা করে আসত। নানুতবী রহ.-এর মেধা, প্রতিভা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অখণ্ডনীয় দলিল উপস্থাপনের মোটামুটি একটা আন্দাজ করা যায় তার রচনাসমগ্র থেকে। তিনি বলতেন, 'কুরআন-সুন্নাহর সকল বিধিবিধান পুরোটাই যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। তবে প্রত্যেকের বোধ ও বুদ্ধিমত্তা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।' হযরত নানুতবী রহ.-এর অন্যতম শাগরিদে রশীদ, হাকিম মানসুর আলী খান মুরাদাবাদী 'মাযহাবে মানসুর' নামক কিতাবে হযরতের দরস ও তাকরিরের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'সত্য এই যে, হযরত নানুতবী রহ. সকলের ধারণার বাইরে যখন কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাকে প্রমাণপুষ্ট করতেন, তখন বড় বড় জ্ঞানী-গুণী পর্যন্ত হতবাক ও হতবুদ্ধি হয়ে যেত। বাহ্যিকভাবে যা দলিল-প্রমাণশূন্য বলে মনে হতো, হযরতের আলোচনার পর সেটাই মনে হতো আকল ও যুক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল। তার পেশকৃত দলিল-প্রমাণের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার দুঃসাহস হতো না বড় বড় আলেমদের পর্যন্ত।'

সহীহ বুখারীর হাশিয়া-সংযুক্তি

হযরত নানুতবী রহ. ফারেগ হওয়ার পর অল্প বয়সেই মাওলানা আহমদ আলী রহ.-এর নির্দেশে *সহীহ বুখারী*র শেষের কয়েক পারার হাশিয়া লেখেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ. এ সম্পর্কে বলেন, হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ. *বুখারী শরীফের* হাশিয়া লেখেন এবং শেষ পাঁচ পারার হাশিয়া লেখার দায়িত্ব সোপর্দ করেন হযরত মাওলানা নানুতবী রহ.-কে। নানুতবী রহ. এমনই দক্ষতা ও পারঙ্গমতার সাথে তা সম্পন্ন করেন যে, পাঠকমাত্রই অনুভব করবেন যে, এর চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে চমৎকার আর হতে পারে না। নানুতবী রহ.-কে যখন হাশিয়া লেখার এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন হযরতের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে অনবহিত কিছু মানুষ মাওলানা আহমদ আলী সাহেবকে আপত্তির সুরে বলেছিল, 'হযরত! আপনি এ কী করলেন! কিতাবের শেষ অংশটিকে তুলে দিলেন একজন নতুন ও অনভিজ্ঞ মানুষের হাতে?'

তাদের উত্তরে মাওলানা আহমদ আলী সাহেব রহ. বললেন, 'আমি এতটা বেকুব ও নির্বোধ নই যে, না জেনে-বুঝে তার হাতে এই গুরুভার দায়িত্ব অর্পণ করেছি।' তারপর নানুতবী রহ.-এর লিখিত হাশিয়ার অংশবিশেষ দেখালেন, যা ছিল পুরো *বুখারীর* মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও দুর্বোধ্য জায়গা, বিশেষ করে হানাফী মাযহাবকে সমর্থনপুষ্ট করার ক্ষেত্রে, শুরু থেকেই যা বাধ্যতামূলকভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। হাশিয়ার আলোচ্য অংশটুকু দেখার পর আপত্তিকারীদের আপত্তি দূর হয়ে গেল এবং সুস্পষ্ট হয়ে গেল আহমদ আলী সাহেবের নির্বাচনের যথার্থতা।

বস্তুত ইমাম বুখারী রহ. যেসব জায়গায় হানাফী মাযহাবের ওপর আপত্তি করেছেন, তার জবাব যিনি লেখেন তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, তা কতটা কঠিন ও জটিল। যার ইচ্ছা হয় সে এসব জায়গা দেখে উপলব্ধি করতে পারে যে, হযরত নানুতবী রহ. কী অসাধ্য সাধন করেছেন এবং কী দারুণ পাদটীকা উপহার দিয়েছেন। অথচ এই হাশিয়া লেখার ক্ষেত্রে জরুরি ছিল নিজের বুঝ-বুদ্ধির ওপর নয়, লিখতে হবে কিতাবপত্রের ওপর নির্ভর করে।

বুখারীর হাশিয়া লেখার সময় হযরত নানুতবী রহ.-এর বয়স কত ছিল, এ সম্পর্কে হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রহ. অনির্দিষ্টভাবে বাইশ-তেইশ বছরের কথা বলেছেন। হযরতের অতুল্য মনীষা ও ধীশক্তি সম্পর্কে যারা অনবগত ছিলেন তাদের জন্য এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার ছিল বটে যে, *বুখারীর* মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাবের পাদটীকা লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে একজন তরুণ আলেমকে। কিন্তু হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেবের মতো গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন আপন ছাত্রের অনন্যসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে।

অন্যান্য রচনাবলি

হযরত নানুতবী রহ. দুই ডজনেরও অধিক গ্রন্থ রেখে গেছেন, যা তার ইলম, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আছে। এসব গ্রন্থে তিনি সে সকল বিষয়কেই স্থান দিয়েছেন এবং সে সকল বিষয়ের ওপরই কলম ধরেছেন, যা ১৮৫৭ সনে এবং তার পরবর্তী বিশৃঙ্খল ও বিপৎসংকুল সময়ে তুমুল আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয় ছিল এবং মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি যার সম্মুখীন হচ্ছিল। বস্তুত খ্রিষ্টান পাদরি ও হিন্দু পণ্ডিতদের মোকাবিলায় একদিকে যেমন তিনি

ইসলামের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তেমনই অপরদিকে ইসলামী আকীদা ও ইসলাম-নির্দেশিত আমল-সংক্রান্ত অসংখ্য বিষয়ের ওপরও কলম ধরেছেন এবং যুক্তিনির্ভর ও জ্ঞানসমৃদ্ধ চমৎকার প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও রচনা উপহার দিয়েছেন, যা থেকে মুসলমানরা ছিল এতদিন রিক্তহস্ত।

হযরতের বিদ্যমান ও প্রকাশিত রচনাবলির তালিকা নিম্নরূপ :

- قبلہ نما (কিবলানুমা)
- آب حیات (আবে হায়াত)
- جواب ترکی بہ ترکی (জওয়াব তুরকি বা তুরকি)
- حجۃ الاسلام (হুজ্জাতুল ইসলাম)
- ہدیۃ الشیعہ (হাদিয়াতুশ শিয়াহ)
- تقریر دل پذیر (তাকরিরে দিলপযির)
- تحذیر الناس (তাহযিরুন নাস)
- لطائف قاسمی (লাতায়িফে কাসেমী)
- فیوض قاسمیہ (ফয়ুযে কাসেমিয়্যাহ)
- جمال قاسمی (জামালে কাসেমী)
- مکتوبات قاسمیہ (মাকতুবাতে কাসেমিয়্যাহ)
- تصفیۃ العقائد (তাসফিয়াতুল আকায়িদ)
- تحفۃ الحمیۃ (তুহফাতুল হামিয়্যাহ)
- اسرار قرآنی (আসরারে কুরআনী)
- الحق الصریح (আল-হাক্কুস সরিহ)
- توثیق الکلام فی الانصات خلف الامام (তাওসিকুল কালাম ফিল ইনসাতি খালফাল ইমাম)
- انتصار الاسلام (ইনতিসারুল ইসলাম)
- الاجوبۃ الکاملۃ فی الاسئلۃ الخاملۃ (আল-আজবিবাতুল কামিলা ফিল আসবিলাতিল খামিলাহ)

- الدلیل المحکم علی عدم قراۃ الفاتحہ للموتم (আদ-দলিলুল মুহকাম আলা আদমে কিরাআতিল ফাতিহাতি লিল মুতাম)
- گفتگوئے مذہبی (গুফতগুয়ে মাযহাবী) যা روداد میلہ خداشناسی (রুদাদে মেলা খোদাশেনাসি) নামে প্রসিদ্ধ।

ইনতেকাল

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. ৪ জুমাদাল উলা ১২৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৫ এপ্রিল ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন এবং দারুল উলূম দেওবন্দের উত্তর পার্শ্বস্থ কবরস্তানে সমাহিত হন। হযরতের নামের সাথে সম্বন্ধ করে যাকে বলা হয়, 'মাকবারায়ে কাসেমী' বা 'কাসেমী কবরস্তান'।

হযরত নানুতবী রহ.-এর মৃত্যুতে সামসময়িক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ খান নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেন এভাবে :

> লোকেরা মনে করত, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী রহ.-এর পর তার মতো গুণসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির আর আগমন ঘটবে না। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. সততা, ধার্মিকতা, তাকওয়া, খোদাভীরুতা ও বিনয়-নম্রতার মতো মহৎ গুণাবলির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-এর মতো আরও একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, যিনি কোনো কোনো বিষয়ে তাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এখনো এমন অনেক মানুষ জীবিত আছেন, যারা মাওলানাকে খুবই কম বয়সে দিল্লিতে পড়াশোনা করতে দেখেছেন। তিনি সকল কিতাব মাওলানা মামলুক আলী রহ.-এর কাছে পড়েছেন।
>
> শুরু থেকেই তার বেশভূষা ও চালচলনে সুপ্রতিভাত ছিল ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারী ও সৌভাগ্যশীলতার প্রতীক। নিচের পঙ্‌ক্তিটি যেন ঠিক তাকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে :
>
> بالائے سرش زہوشمندی * می تافت ستارۂ بلندی
>
> বোধ ও বুদ্ধির গুণে বহু আগ থেকেই তার ললাটে ঝলমল করছিল
> সুউচ্চ মর্যাদার সমুজ্জ্বল সিতারা।

ছাত্রজীবনেই তিনি বোধ, বুদ্ধি, ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধায় যেমন সুপরিচিত ছিলেন, তেমনই সততা ও খোদাভীরুতায়ও বুযুর্গ উলামায়ে কেরামের কাছে প্রশংসিত ছিলেন। হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন রহ.-এর সান্নিধ্য তাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল সুন্নাতে নববীর অনুসরণে। আর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর সন্নিধান তার অন্তর্জগৎকে পৌঁছে দিয়েছিল অতি উঁচু স্তরে। নিজে যেমন সুন্নত ও শরীয়তের অনুবর্তী ছিলেন, তেমনই অন্যদেরও সুন্নত ও শরীয়তের অনুবর্তী বানাতে সচেষ্ট ছিলেন। এসবের পাশাপাশি ছিল তার মাঝে জনগণের প্রতি কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণকামনা।

তারই প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিকতায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য দেওবন্দে অত্যন্ত কল্যাণপ্রসূ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং খুবই শানদার একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় দ্বীনী মাদরাসা কায়েম হয়েছে তারই চেষ্টা-মেহনতের কল্যাণে। তিনি পীর ও মুরশিদ হওয়ার প্রত্যাশী ছিলেন না, কিন্তু হিন্দুস্তানে, বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিমের জেলাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ ছিল তার ভক্ত-অনুরক্ত, যারা তাকে নিজেদের নেতা হিসাবে মনে করত। মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনেকে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনিও অনেকের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু জানামতে কোনো কাজই—চাই সেটা কারও প্রতি সন্তুষ্টিমূলক হোক কিংবা অসন্তুষ্টিমূলক হোক—প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণে করেননি। শত্রুতা ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়েও করেননি। আমরা এর বিপরীত বলতে পারি না। তার যাবতীয় কাজ, সকল কর্মতৎপরতা—পরিমাণে চাই যতটুকুই হোক—তা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন প্রাপ্তিলাভের আশায়।

তিনি যেটাকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করতেন সেটাই মেনে চলতেন, আর যেটাকে মনে করতেন ভুল ও অসত্য, তা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। কারও প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়াটা ছিল শুধু এবং শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য। কাউকে তিনি কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে ভালো বা মন্দ মনে করতেন না, বরং ভালো বা মন্দ মনে করতেন তার ভালো-মন্দ কথা ও কাজের ভিত্তিতে এবং তা কেবল আল্লাহ পাকের ওয়াস্তে। বস্তুত আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করার

গুণটি প্রস্ফুটিত ছিল তার প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি উচ্চারণে। তার সকল গুণ ও চরিত্রই ছিল ফেরেশতাসুলভ। আমরা সকলেই তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসি। আর যিনি এমন পুণ্য ও পবিত্রতাকে নিয়ে জীবনের বেলা পার করেছেন, তিনি তো অবশ্যই ভালোবাসা লাভের যোগ্য এবং ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত।

বর্তমান সময়ের সকলে, এমনকি কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে যারা তার সাথে মতানৈক্য করত হয়তো তারাও এ কথার স্বীকৃতি দেবে যে, মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিচারে হয়তো তার অবস্থান শাহ আবদুল আযিয রহ.-এর নিচে ছিল, কিন্তু অন্যসব বিচারে তার অবস্থান ছিল শাহ আবদুল আযিয রহ.-এরও ওপরে। সততা, বিনয়-নম্রতা ও আড়ম্বরহীনতায় তার অবস্থান মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-এর ওপরে না থাকলেও অন্তত নিচে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মাটির মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন ফেরেশতাসুলভ গুণ-বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবচরিত্রের অধিকারী। এ ধরনের মহান ব্যক্তির কায়া ও ছায়া থেকে বঞ্চিত হওয়া পরবর্তী প্রজন্মের জন্য খুবই পীড়াদায়ক, খুবই বেদনাদায়ক।

হাজী সাইয়েদ আবেদ হুসাইন দেওবন্দী রহ.

(জন্ম : ১২৫০ হি./১৮৩৪ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৩১ হি./১৯১৩ খ্রি.)

হাজী আবেদ হুসাইন রহ. ছিলেন দেওবন্দের একজন উঁচু স্তরের মুত্তাকী, পরহেযগার ও প্রভাবশালী বুযুর্গ। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের উৎসাহী ও কর্মচঞ্চল প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। দারুল উলূম দেওবন্দে মুহতামিমের পদ প্রথম তিনিই অলংকৃত করেছেন। তিনি ছিলেন চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ এবং রিয়াযত-সাধনা ও দুনিয়াবিমুখতার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। তার ধর্মীয় প্রভাব ছিল দেওবন্দ ও দেওবন্দের আশপাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত রিজবিয়্যাহ বংশের সন্তান।

হযরত হাজী আবেদ হুসাইন রহ. কুরআন শরীফ ও ফারসি পড়াশোনা শেষে দিল্লি গমন করেন এবং সেখানেই দ্বীনী ইলম হাসিল করেন। তাসাউফ ও তাযকিয়ার ময়দানে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রামপুরী রহ.-এর মুজায ও খলীফা হযরত মিয়াজি করিম বখ্‌শ সাবেরী রহ.-এর হাতে। খেলাফত ও ইজাযতও লাভ করেছিলেন তার থেকে। সেইসাথে খেলাফত ও ইজাযতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. থেকেও।

গুণগরিমা ও বৈশিষ্ট্য

হযরত হাজী সাহেব রহ. ষাট বছর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করেছেন। প্রসিদ্ধ আছে, ত্রিশ বছর পর্যন্ত তার 'তাকবিরে উলা' ফওত হয়নি। তাহাজ্জুদ নামায এমনই গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করতেন যে, ষাট বছরের মধ্যে কোনোদিন তা ছোটেনি। তিনি ছিলেন কাশফ ও কারামতসম্পন্ন বুযুর্গ। ওয়াজ-নসীহত এবং তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি 'কর্মশাস্ত্রে' ছিল তার ঈর্ষণীয় যোগ্যতা।

কাজের শত ভিড়ের মাঝেও তিনি ছিলেন পূর্ণ সময়ানুবর্তী। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আমল সুন্দর-সুশৃঙ্খলভাবে ঠিক ঠিক সময়ে আঞ্জাম দিতেন; আগেও করতেন না, পরেও করতেন না। হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. বলতেন, 'ওয়াকিবহাল যে-কেউ যেকোনো সময় বলতে পারত, হাজী সাহেব এই সময় এই কাজে ব্যস্ত আছেন। কেউ যদি গিয়ে দেখে তাহলে তাকে সেই কাজেই ব্যস্ত দেখতে পাবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে ছিলেন একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক। তার একটি মূল্যবান উক্তি হলো, 'আমলহীন দরবেশ অস্ত্রহীন সৈনিকের সমতুল্য। নিজেকে আবৃত করার জন্য দরবেশের উচিত আমলকে জাহের করে দেয়া।' একবার তার একজন মুরিদ হাজী মুহাম্মদ আনওয়ার দেওবন্দী রহ. সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, আত্মদমন ও আত্মপীড়নের উদ্দেশ্যে সে সম্পূর্ণরূপে পানাহার বর্জন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দিয়ে লেখলেন, নিঃসন্দেহে এটা সুন্নাহ-পরিপন্থি। সুন্নত তরীকায় অবশ্যই পানাহার করা উচিত, চাই তা সামান্যই হোক না কেন।

'সাওয়ানেহে মাখতুতা'র সূত্রে 'আনওয়ারে কাসেমী'-তে এসেছে, 'হাজী সাহেব রহ. ছিলেন দেওবন্দের একজন মর্যাদাশীল ও প্রভাবশালী আবেদ ও যাহেদ ব্যক্তিত্ব। তার বুযুর্গির প্রভাব-প্রতিপত্তি ছেয়ে ছিল ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলের অন্তরে। তার রুহানী ফয়য ও আধ্যাত্মিক প্রবাহ জয় করে নিয়েছিল দেওবন্দ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার, এমনকি অন্যান্য প্রদেশের লোকদেরও অন্তর্সত্তাকে। ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন অনেক বড় মুদাব্বিরও। তার দেয়া তাবিজ অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কাজ করত বিষক্রিয়ার প্রতিষেধকের মতো।'

'তিনি এমনই আল্লাহওয়ালা ছিলেন যে, তাকে দেখামাত্রই আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যেত। দৃঢ়তা, সহনশীলতা, পরিচালনা-কুশলতা ও বাহ্যিক অবস্থার প্রতি যত্নশীলতা ছিল তার প্রসিদ্ধ গুণ-বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবচরিত্র। দুনিয়াবিমুখতার চরিত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন ঠিক, কিন্তু কেউ তার কাছে দুনিয়াবি বিষয়ে পরামর্শ চাইতে এলে এমন সুন্দর ও সময়োচিত পরামর্শ দিতেন, যেন তিনি একজন সজাগ-সতর্ক দুনিয়াদার।'

'সাওয়ানেহে কাসেমী' গ্রন্থে এসেছে, 'দেওবন্দের লোকজন হযরত হাজী আবেদ হুসাইন রহ.-কে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করত এবং তার দ্বারা অনেক

উপকৃত হতো। ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে তিনি আল্লাহ-নির্ভরতার সম্বল অবলম্বন করেছিলেন।'

'আশরাফুস সাওয়ানেহ'-এ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর একটি উক্তি আছে। তিনি বলেন, 'আমি তো হাজী সাহেবকে কেবল একজন বুযুর্গ হিসাবে জানতাম, কিন্তু এটা কল্পনায়ও ছিল না যে, তিনি একজন শায়খ ও মুরশিদও। তার খেদমতে আমার একটি আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা বললে তিনি তার এমন সন্তোষজনক উত্তর দেন যে, আমি বুঝতে পারি, তিনি একজন কামেল শায়েখ, কামেল মুরশিদ।'

হাজী আবেদ হুসাইন এবং দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা

দারুল উলূম দেওবন্দের জন্য জনসাধারণ থেকে ব্যাপকভাবে চাঁদা তোলার সূচনা করেছিলেন হাজী আবেদ হুসাইন রহ.। দারুল উলূমের জন্য চাঁদা সংগ্রহের পথ ও পদ্ধতি কী হবে, এর ওপর হাজী ফযলে হক রহ. সবিস্তার আলোচনা করেছেন হযরত নানুতবী রহ.-এর 'সাওয়ানেহে মাখতুতাহ' বা হস্তলিখিত জীবনচরিতের মধ্যে। তিনি লিখেছেন :

> একদিন ইশরাকের সময় হাজী আবেদ হুসাইন রহ. একটি সাদা রুমাল দিয়ে ঝুলি বানালেন এবং তাতে নিজের পক্ষ থেকে তিন রুপি রাখলেন। তারপর 'ছাত্তা মসজিদ' থেকে বের হয়ে একাই মাওলানা মেহতাব আলী রহ.-এর কাছে গেলেন। তিনি উদার চিত্তে ছয় রুপি দান করলেন এবং দুআ করে দিলেন। তারপর মাওলানা ফযলুর রহমান রহ. বারো রুপি দান করলেন এবং আমি অধমও ছয় রুপি দান করলাম। সেখান থেকে উঠে হাজী সাহেব মাওলানা যুলফিকার আলী রহ.-এর কাছে গেলেন। মাশাআল্লাহ! তিনি ছিলেন ইলম-দোস্ত ও জ্ঞানপ্রিয় মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে বারো রুপি দান করলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাইয়েদ যুলফিকার আলী সানী দেওবন্দীও। তিনিও বারো রুপি দান করলেন।
>
> এরপর এখান থেকে আবুল বারাকাত মহল্লায় গেলেন এবং আরও কিছু চাঁদা সংগ্রহ করলেন। ফলে চাঁদার পরিমাণ দুইশো রুপি হয়ে গেল। আরও কিছু দৌড়ঝাঁপ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত চাঁদার পরিমাণ এসে দাঁড়াল তিনশোর ঘরে। এরপর আস্তে আস্তে চাঁদা তোলার বিষয়টি চর্চা হতে

লাগল এবং তার সুফল ও সুপ্রাপ্তিও পাওয়া গেল। যা আজ সকলের সামনেই সুস্পষ্ট। চাঁদা তোলার এই ঘটনা ছিল ১২৮২ হিজরীর দোসরা জিলকদ শুক্রবারের দিন।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে, যখন ইংরেজরা মক্তব-মাদরাসার জন্য বরাদ্দকৃত ওয়াকফ ও জায়গির-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল এবং হাজার হাজার মসজিদ-মাদরাসা ও ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেই করুণ পরিস্থিতিতে গণচাঁদার ওপর ভিত্তি করে কোনো দ্বীনী মাদরাসা গড়ে তোলার ও তাকে সরকারের প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত-স্বাধীন রাখার চিন্তা-পরিকল্পনা ছিল একদিকে যেমন সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব, তেমনই অপরদিকে ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সুসংহত। সেইসাথে ছিল ঈমানী দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতারও পরিচায়ক। পরে অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়াকফ ও জায়গিরের সাবেক ব্যবস্থার পরিবর্তে গণচাঁদার এই ব্যবস্থা সফল ও সার্থক প্রমাণিত হয়েছে এবং দ্বীনী মাদরাসা ও দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকাও পালন করেছে। এখনো ধারাবাহিকভাবে পালন করে চলেছে সেই ভূমিকা।

যাই হোক, কিছু চাঁদা সংগ্রহের পর অবশেষে ১২৮৩ হিজরীর ১৫ মুহাররম মোতাবেক ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মে রোজ বৃহস্পতিবার ছাত্তা মসজিদের উন্মুক্ত চত্বরে, ছোট্ট একটি ডালিম গাছের ছায়াতলে খুবই অনাড়ম্বরতার সাথে দারুল উলূম দেওবন্দের শুভ উদ্বোধন হয় এবং ভবিষ্যতের পথে তার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। প্রথম শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন মোল্লা মাহমুদ দেওবন্দী রহ. এবং প্রথম শিক্ষার্থী হিসাবে পড়াশোনা শুরু করেন মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ., যিনি পরবর্তী সময়ে 'শায়খুল হিন্দ' নামে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছেন। যদিও এটি ছিল আপাতদৃষ্টিতে খুবই সীমিত ও সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি মাদরাসার উদ্বোধন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা ছিল ভারতবর্ষে ব্যাপক পরিসরে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের নয়া যুগের শুভ সূচনা।

দারুল উলূমে মুহতামিমের পদ গ্রহণ

হাজী আবেদ হুসাইন দেওবন্দী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সারির স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার পাশাপাশি দারুল উলূমের প্রথম মুহতামিম ও মজলিসে শুরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন। পরপর তিনবার মুহতামিমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তার মুহতামিম হিসাবে দায়িত্ব পালনের

সময়কাল প্রায় দশ বছর। শেষদিকে উপর্যুপরি কাজের চাপে তিনি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। তার ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিতে দারুল উলূম দেওবন্দ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল এবং উন্নতি-অগ্রগতির পথে ধাবমান হয়েছিল।

প্রথমবার মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন করেন দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার দিন থেকে রজব ১২৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১২৮৪ হিজরীতে হযরত হাজী সাহেব হজের সফর করার সংকল্প করেন। দারুল উলূমের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে, তার এই ইচ্ছা পোষণ করাটা ছিল এমনই এক ভূমিকম্পের মতো যে, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটির বুনিয়াদও যদি তাতে ধসে পড়ত, তাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কেননা পুরো দেওবন্দের মধ্যে বাহ্যত এমন কাউকে দেখা যাচ্ছিল না, যে এই দায়িত্বভার আপন কাঁধে তুলে নেবে। কিন্তু যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করেন, আল্লাহই তাদের সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেন। সত্যিকারের যোগ্য ও একনিষ্ঠ কতিপয় শুরা-সদস্যের অন্তরে এ কথার উদয় হলো যে, ইহতেমামের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ব্যক্তি মাওলানা রফী উদ্দীন রহ.। সে মতে ১২৮৪ হিজরীর শাবান মাসের শুরু থেকে তাকেই অর্পণ করা হয় এই দায়িত্ব।

দ্বিতীয়বার হজ থেকে ফিরে এসে ১২৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহতামিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাতে বহাল থাকেন। মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি দেওবন্দ জামে মসজিদেরও নির্মাণকাজ চলছিল তারই তত্ত্বাবধানে। উভয় কাজ একসাথে চালিয়ে নেয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। তাই হাজী সাহেবের কাজের বোঝা একটু হালকা করে দেয়াই সমীচীন মনে করা হয়। আর সে চিন্তা থেকেই মুহতামিমের দায়িত্ব পুনরায় অর্পণ করা হয় মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব রহ.-কে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখাশোনার দায়িত্বে হযরত হাজী সাহেবকেই রাখা হয়।

তৃতীয়বার রবিউল আউয়াল ১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহতামিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শাবান ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাতে বহাল থাকেন। ১৩০৬ হিজরীতে মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব রহ. হজের ইরাদা করেন এবং হিজরত করে মদীনায়ই অবস্থানের নিয়ত করেন। তখন শুরা-সদস্যদের পক্ষ থেকে হযরত হাজী

সাহেব রহ.-এর কাছে আবেদন করা হয় দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য। তিনি সম্মত হন এবং তৃতীয়বারের মতো মুহতামিমের জিম্মাদারি গ্রহণ করেন।

কিন্তু ১৩১০ হিজরীতে হাজী সাহেবের অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততার কারণে পুনরায় তাতে রদবদল করতে হয়। দারুল উলূমের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে, 'দিন-রাত কাছের ও দূরের অসংখ্য মানুষ দলে দলে হযরত হাজী আবেদ হুসাইন সাহেব রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়, যাতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য ও রোগ-বালা থেকে মুক্তি লাভের জন্য দুআ নিতে পারে, আর তিনিও পছন্দ করেন না কাউকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দিতে। ফলে ইহতেমামের দায়িত্ব পালনে বেশি সময় দিতে পারেন না। তাই তিনি সমীচীন মনে করেছেন যে, মুহতামিমের দায়িত্ব হাজী ফজলে হক সাহেবকে দেবেন এবং নিজে তার তদারকি করবেন। শুরা-সদস্যগণ হযরতকে নির্ভার করার উদ্দেশ্যে এটা মেনে নিয়েছেন।'

উল্লেখ্য, দেওবন্দ শহরের শানদার জামে মসজিদও হাজী আবেদ সাহেবেরই চেষ্টা-মেহনত ও পরিশ্রমের সুফল।

মৃত্যুবরণ

২৭ জিলহজ ১৩৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ নভেম্বর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার ৮১ বছর বয়সে হযরত হাজী সাইয়েদ আবেদ হুসাইন দেওবন্দী রহ. পরলোকগমন করেন এবং দারুল উলূমের উত্তর দিকে 'মাকবারায়ে কাসেমীর' উত্তর-পূর্ব কোণে সমাহিত হন।

'মসনবী ফুরুগের' লেখক মাওলানা ফুরুগ দেওবন্দী হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর স্তুতি গেয়ে কিছু কবিতা রচনা করেছেন। যা নিম্নরূপ :

اور حضرت معدن لطف وکرم * متقی و حاجی بیت اللہ الحرام

হযরতজী মহান উদার, বদান্যতার খনি
বাইতুল্লাহর হাজী, বড় খোদাভীরুও তিনি

حق نے ان پر کی ہر اک خوبی تمام * ہے محمد اور عابد حسن کا نام

সৌন্দর্যের আধার তাকে করেছেন আল্লাহ পাক
নাম যে তার আবেদ হুসাইন এবং মুহাম্মদ

کی انہوں نے ہے ریاضت اس قدر * جس سے عاجز رہتے ہیں اکثر بشر

অধিকতায় এই পরিমাণ করেছেন পরিশ্রম
অধিকাংশ মানুষ হবে করতে তা অক্ষম

اس قدر طاعات حق لائے بجا * نفس ان کا حکم میں ان کے ہوا

রবের আনুগত্যে তিনি ছিলেন এমন নত
হুকুমে তার নফস নিজের হয়েছে অনুগত

ہیں بہت پاکیزہ خصلت نیک خو * رات دن رہتے ہیں محو ذکر ہو

পরিশুদ্ধ, উন্নত তার স্বভাব-চরিত্র
স্মরণে খোদার দিবানিশি থাকেন নিমজ্জিত

یاد حق میں قلب ہے ان کا گرو * مہتمم ہیں جامع مسجد کے وو

হৃদয় তার স্মরণ খোদার করে অবিরত
জামে মসজিদেরও তিনি দায়িত্বে নিরত

مدرسے میں دل سے وہ عالی مقام * رہتے ہیں دائم شریک انتظام

মাদরাসার প্রতি অন্তরে তার মাকাম বহু উঁচা
ব্যবস্থাপনায় শরীক তিনি থাকেন সর্বদা

ان کی برکت سے یہ مسجد، مدرسہ * ہے ترقی روز افزوں پر سدا

বরকতে তার উঠেছে গড়ে মসজিদ, মাদরাসা
প্রতিনিয়ত ছুঁয়েছে যেন সমৃদ্ধির চূড়া।

ہمت باطن کا ہے ان کے اثر * جس سے زمین میں ہوئی یہ کر و فر

হিম্মতে বাতেনী তার সকল কাজের মূলে
জমিন 'পরে এই কোলাহল হয়েছে যার ফলে

اجر ان کو ان کی نیت کا ملے * حق انہیں اس کی جزائے خیر دے

নিয়তের জন্য মিলবে তারই এ কাজের বিনিময়
জাযায়ে খায়ের দান করো হে প্রভু দয়াময়!

یہ ترقی دین کی ان سے ہوئی ٭ ایسی ہمت کر سکے گا کب کوئی

হয়েছে এমন তার জন্য দ্বীনের উর্ধ্বগমন
দৃঢ় হিম্মত তার মতো করবে কে, আর কখন? [৮]

৮. এখানে আমাদের দাওরা হাদীসের প্রিয় তালিবে ইলম; ঝিনাইদহের মুহাম্মদ সাইফুদ্দীনের কথা উল্লেখ না করলে চরম অকৃতজ্ঞতা হবে। মাশাআল্লাহ ছন্দ ও কবিতায় সে বেশ পারঙ্গম! ওপরের উর্দু কবিতাগুলোর বাংলা ছন্দায়নে বিশেষভাবে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে তার থেকে। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং হক্কানী-রব্বানী আলেম হিসাবে কবুল করুন।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.

(জন্ম : ১২৪২ হি./১৮২৭ খ্রি., মৃত্যু : ১৩২৩ হি./১৯০৫ খ্রি.)

ইমামে রব্বানী কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এবং হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. ইসলামী হিন্দুস্তানের ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন, যখন অবনমিত হতে চলেছিল তার প্রভাব-প্রতাপ ও শাসনক্ষমতার পতাকা আর বইতে শুরু করেছিল তার বসন্তবাহার বিদায়ের পর হেমন্তের প্রবল বাতাস। ইতিহাসের এই বাঁকে দাঁড়িয়ে যদি আমরা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দেখতে পাই রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসনক্ষমতা, গৌরব ও মর্যাদার উড্ডীয়মান পতাকা, আর যখনই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই লাঞ্ছনা, অপদস্থতা, পশ্চাৎপদতা ও বিপদ-দুর্যোগের অন্ধকার ঘনঘটা। সামনে চলার পথ ক্রমেই অন্ধকার থেকে গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। মুসলমানরা অসহায়ত্ব ও অনাশ্রয়ের মাঝে নিরাপত্তার পথ খুঁজে ফিরছে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তই যেন গ্রহণ করতে পারছে না তারা।

ইতিহাসের ঠিক এই ক্রান্তিলগ্নে আগমন ঘটে ইতিহাসখ্যাত এই মহান দুই মনীষীর। যারা সুসংহত কর্মপন্থা, সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি এবং বিস্ময়কর কীর্তি ও অবদানের মাধ্যমে ইতিহাসের শিরোনাম হয়ে আছেন। কোনো ঐতিহাসিক ইসলামী হিন্দুস্তানের উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনা করবেন আর ইতিহাসের জনক এই মহান ব্যক্তিদ্বয়কে এড়িয়ে যাবেন, তা অসম্ভব। ভারতবর্ষের ইসলামী পুনর্জাগরণ ও সংস্কার-আন্দোলনের অগ্রপথিক এবং মুসলিম উম্মাহর ত্রাণকর্তা হিসাবে তাদেরকে পেশ করতেই হবে এবং স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করতে হবে তাদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি ও অবদানকে।

উভয়ের কর্মক্ষেত্র ছিল আলাদা আলাদা। হযরত নানুতবী রহ. বাতিল ধর্ম ও ভ্রান্ত মতবাদের মোকাবিলায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বাতিলপন্থিদের

ছুড়ে দেয়া প্রতিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন, এমনকি প্রতিপক্ষকে ময়দান ছাড়তে বাধ্য করেছেন পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে। অপরদিকে হযরত গাঙ্গুহী রহ. মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পথ বন্ধ করেছেন এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী অবদান ও কীর্তি সম্পাদন করেছেন। ফলে তিনি সফল ও সমর্থ হয়েছেন ইসলামের মধ্যে শিরকী আকীদা-বিশ্বাস অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করতে।

শিক্ষা ও প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. ৬ জিলকদ ১২৪২ হিজরী মোতাবেক ১ জুন ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাহারানপুর জেলার গাঙ্গুহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাওলানা হেদায়াত আহমদ ছিলেন স্ব-যুগের একজন যোগ্য আলেম এবং তাসাউফ ও তাযকিয়ার ময়দানে ছিলেন দিল্লির হযরত শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দেদী রহ.-এর অন্যতম খলীফা।

গাঙ্গুহী রহ. নিজ এলাকাতেই কুরআন শরীফ পড়া শেখেন। তারপর কারনালে মামার কাছে গিয়ে ফারসি ভাষার কিতাবাদি পড়েন এবং মাওলানা মুহাম্মদ বখশ রামপুরীর কাছে নাহু-সরফের তালিম গ্রহণ করেন। এরপর ১২৬১ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি গমন করে মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী রহ.-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানে আসার পর হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা মৃত্যু পর্যন্ত অটুট-অবিচ্ছিন্ন ছিল। দিল্লিতে মাওলানা সদরুদ্দীন আযুরদার কাছেও যুক্তিবিদ্যার কিছু কিতাব পড়েন। সবশেষে হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন হযরত শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী রহ.-এর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ থেকে।

শিক্ষা সমাপনের পর শায়খুল মাশায়েখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর খেদমতে হাজির হন এবং তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধিতে পূর্ণতা অর্জন করেন। হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. হযরত নানুতবী রহ.-এর জীবনীগ্রন্থে লেখেন, 'তখন থেকেই হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এবং হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. পরস্পরের বন্ধু ও সহপাঠী হন। সর্বশেষ তারা শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী রহ.-এর কাছে হাদীস পড়েন। তারপর উভয়ে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন এবং আধ্যাত্মিকতার পথে যাত্রা শুরু করেন।'

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. খুবই দ্রুততার সাথে আত্মশুদ্ধির পথ অতিক্রম করেন। ফলে মাত্র চল্লিশ দিনের মাথায় খেলাফত ও ইজাযত লাভে ধন্য হন এবং গাঙ্গুহ ফিরে গিয়ে মাওলানা আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর হুজরাকে আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করেন। এ সময় তার জীবন-জীবিকা লাভের মাধ্যম ছিল দাওয়াখানা।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময় তিনি 'খানকাহে কুদ্দুসী' থেকে মরদে মুজাহিদ হয়ে বের হন এবং ইংরেজদের মোকাবিলায় কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। স্বীয় মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ. মুহাজিরে মক্কী ও অন্যান্য সাথি-সঙ্গীদের সাথে শামেলির ময়দানে চরম শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন। হযরত হাজী সাহেবের নেতৃত্বে যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে হযরত নানুতবী রহ.-কে কমান্ডার অব চিফ বা সেনাপতি এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ.-কে যুদ্ধমন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। শামেলি প্রান্তের ঐতিহাসিক জিহাদের পর হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়। তারপর গ্রেফতার করে সাহারানপুর জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় মুযাফফরনগরে। এখানে বহু কয়েদি হযরতের ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয় এবং জেলখানার মধ্যেই বা-জামাত নামায শুরু হয়। মামলা-মোকদ্দমা চলার পর দলিল-প্রমাণ না পাওয়ার কারণে অবশেষে বেকসুর খালাস করে দেয়া হয় হযরত গাঙ্গুহী রহ.-কে।

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ইলমী প্রস্রবণ

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর গাঙ্গুহে এসে হযরত দরস-তাদরিসের মুবারক সিলসিলা শুরু করেন। ১২৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় হজের পর থেকে তিনি প্রত্যেক বছরে পুরো সিহাহ সিত্তাহ একবার খতম করতেন। প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত দরসদানে মশগুল থাকতেন। গাঙ্গুহী রহ.-এর দরসের সুখ্যাতি শুনে দূর-দরাজ থেকে হাদীসের শিক্ষার্থীরা আসত। স্বদেশ এবং বিদেশ থেকেও আসত। যাদের সংখ্যা পৌঁছে যেত কখনো কখনো ৭০/৮০-এর ঘরে। ইলমের পিপাসা নিয়ে উপস্থিত হওয়া ছাত্রদের সঙ্গে তিনি খুবই স্নেহ ও মমতাপূর্ণ আচরণ করতেন।

১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অন্যান্য বিষয়ের কিতাব পড়ানো বন্ধ করে দেন এবং শুধু সিহাহ সিত্তাহর দরস দেয়া শুরু করেন।

১৪ বছর পর্যন্ত দরস-তাদরিসের এ ধারা অব্যাহত রাখেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। এই সময়ে হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন প্রায় তিনশো তালিবে ইলম, যারা পরবর্তী সময়ে বড় মুত্তাকী-পরহেযগার আলেম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং স্ব-যুগে নিজ নিজ অঞ্চলে চন্দ্র-সূর্য হয়ে হেদায়েতের আলো বিকিরণ করেছেন। অবশ্য হযরতের বদস্তুর কোনো মাদরাসা ছিল না। লিওয়াজহিল্লাহ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত নিজ খানকাহেই দরস-তাদরিসের ফরিযাহ আঞ্জাম দিতেন।

দরস-তাদরিসের সময় হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর আলোচনা এমনই সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় হতো যে, সাধারণ থেকে সাধারণ তালিবে ইলমও খুব সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত। তার দরসে হাদীসের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, হাদীসের বিষয়বস্তু শোনার পর হাদীসের ওপর আমল করার শওক ও আগ্রহ পয়দা হয়ে যেত।

তিনি ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলকে হাদীসের ওপর প্রয়োগ করে দরসে হাদীসের এমন এক ধারার প্রচলন ঘটান, যা একদিকে যেমন অনন্য ও অতুলনীয় ছিল, অপরদিকে সময়ের প্রেক্ষাপটে ছিল আবশ্যকও। শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী রহ.-এর তাহকীক ও হাশিয়াসহ 'লামিউদ দারারী' নামে গাঙ্গুহী রহ.-এর দরসে বুখারীর তাকরীর এবং শায়খুল হাদীসেরই তাহকীক ও হাশিয়াসহ 'আল-কাওকাবুদ দুররী' নামে হযরতের দরসে তিরমিযীর তাকরীর প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও *সহীহ বুখারী* ও *সুনানে তিরমিযীর* অতি সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়।

১৩১৪ হিজরী পর্যন্ত গাঙ্গুহী রহ.-এর দরস-তাদরিস অব্যাহত ছিল। তার দরসে হাদীসের সর্বশেষ শাগরিদ হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কান্ধলবী রহ.। শেষদিকে বিভিন্ন কারণে পঠনপাঠনের মহিমান্বিত ধারা বন্ধ হয়ে গেলেও ওয়াজ-নসীহত ও ফাতাওয়া প্রদানের ধারাবাহিকতা চালু রেখেছিলেন। তিনি আল্লাহর যিকিরের প্রতি খুবই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। সুন্নাতে নববীর অনুসরণে সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন। যারাই তার খেদমতে হাজির হতো, আখেরাতের প্রতি কিছু না কিছু আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়েই ফিরত। এটাই আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নূরানী মজলিসের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আত্মশুদ্ধি ও হাদীসশাস্ত্রের পাশাপাশি হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের সাথেও ছিল সুগভীর সম্পর্ক। এজন্যই তাকে বলা হতো 'ফকীহুন নফস' বা স্বভাবগত ফকীহ। তার ইলমী উচ্চতা ও ফিকহী দূরদর্শিতার ঈর্ষণীয় অবদান হচ্ছে 'ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়্যাহ'। এ ছাড়া বিভিন্ন ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ওপরও তিনি কলম ধরেছেন এবং তার যথাযথ হকও আদায় করে দিয়েছেন। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন হচ্ছে, 'হযরত গাঙ্গুহী রহ. শুধু ফিকহে হানাফীতেই পারদর্শী ছিলেন এমন না; বরং বাকি তিন মাযহাবেও রাখতেন সমান দক্ষতা। এমন কোনো ব্যক্তিত্বকে আমি দেখিনি, যিনি একইসাথে চার মাযহাবেই ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য রাখেন। ব্যতিক্রম শুধু হযরত গাঙ্গুহী রহ.।'

তাকওয়া-পরহেযগারী, শরীয়তের পাবন্দী, নবীজীর অনুকরণ, বিদআতের উচ্ছেদ-অভিযান, সুন্নাতের প্রচার-প্রসার, ইসলামী শিয়ারের সমুন্নতকরণ এবং দ্বীনী বিষয়ে কারও কোনো পরোয়া না করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর জীবন্ত নিদর্শন। ইলম-আমল, তাসাউফ-তাযকিয়া ও মুরিদগণের তরবিয়তের নেতৃত্ব এসে সমাপ্ত হয়ে গেছে তার ওপর। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সব শাগরিদ এবং এমন সব খলীফা দান করেছিলেন, যাদের গণ্য করা হয় স্ব-যুগের প্রখ্যাত আলেম ও খোদাভীরু হিসাবে। তার বিশিষ্ট খলীফাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ., শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ., হযরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. এবং হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. প্রমুখ। আর প্রসিদ্ধ শাগরিদদের উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কান্ধলবী রহ. ও হযরত মাওলানা মাজেদ আলী মানবী রহ. প্রমুখ।

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ইলমী স্মারকসমূহ

দুই ডজনেরও অধিক কিতাব ও রিসালাহ হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর স্মৃতি-স্মারক হয়ে আছে, যা ইলমী অঙ্গনে তার সুউচ্চ মাকাম ও মরতবার সাক্ষ্য বহন করে। সেসব রচনা নিম্নরূপ :

- لامع الدراري على جامع البخاري (লামিউদ দারারী আলা জামিয়িল বুখারী)

- الحل المفهم لمشكلات صحيح مسلم (আল-হাল্লুল মুফহিম লি-মুশকিলাতি সহীহি মুসলিম)
- الفيض السمائي على سنن النسائي (আল-ফায়যুস সামায়ী আলা সুনানিন নাসায়ী)
- الكوكب الدري على جامع الترمذي (আল-কাউকাবুদ দুররিয়্যি আলা জামিয়িত তিরমিযী)
- فتاوی رشیدیہ (ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়্যাহ)
- مکاتیب رشیدیہ (মাকাতিবে রশিদিয়্যাহ)
- لطائف رشیدیہ (লাতায়িফে রশিদিয়্যাহ)
- سبیل الرشاد (সাবিলুর রশাদ)
- زبدۃ المناسک (যুবদাতুল মানাসিক)
- قطوف دانیہ (কুতুফে দানিয়াহ)
- اوثق العری فی تحقیق الجمعہ فی القری (আওসাকুল উরা ফী তাহকীকিল জুমআ ফিল কুরা)
- الحق الصریح فی اثبات التراویح (আল-হাক্কুস সারিহ ফী ইসবাতিত তারাবিহ)
- الرای النجیح فی عدد رکعات التراویح (আর-রায়ুন নাজিহ ফী আদাদি রাকাআতিত তারাবীহ)
- رد الطغیان فی اوقاف القران (রদ্দুত তুগইয়ান ফী আওকাফিল কুরআন)
- الشمس اللامعۃ فی کراہۃ الجماعۃ الثانیہ (আশ-শামসুল লামিয়াহ ফী কারাহাতিল জামাআতিস সানিয়াহ)
- فتوی احتیاط الظہر بعد الجمعۃ (ফাতাওয়া ইহতিয়াতিয যুহরি বা'দাল জুমআহ)
- ہدایۃ المعتدی فی قراءۃ المقتدی (হিদায়াতুল মুতাদী ফী কিরায়াতিল মুকতাদী)
- مجموعہ فتاوی میلاد شریف وعرس وغیرہ (মিলাদ, উরশ ইত্যাদি সম্পর্কিত ফাতাওয়ার সংকলন)
- کیا ہندوستان دار الحرب ہے (কিয়া হিন্দুস্তান দারুল হারব হ্যায়?)

- امداد السلوک (ইমদাদুস সুলুক)
- تصفیۃ القلوب (তাসফিয়াতুল কুলুব)
- ہدایۃ الشیعہ (হিদায়াতুশ শিয়া)
- دافع بدعت (দাফিয়ে বিদআত)
- تقلید شخصی (তাকলিদে শাখসি) ইত্যাদি।

হযরত গাঙ্গুহী রহ. এবং দারুল উলূম দেওবন্দ

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে ছিল হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। বিশেষ করে হযরত নানুতবী রহ.-এর সাথে তো সেই ছাত্রজীবন থেকেই ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। তাই একদম শুরু থেকেই তিনি দারুল উলূমের শিক্ষা ও নির্মাণবিষয়ক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করতেন। এসব কারণে ১২৯৭ হিজরীতে যখন হযরত নানুতবী রহ. ইনতেকাল করেন, তখন সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় হযরতের প্রতি। ফলে তিনি দারুল উলূমের নিয়মতান্ত্রিক অভিভাবকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন এবং নানুতবী রহ.-এর চিন্তারেখার ওপরই দারুল উলূমকে এগিয়ে নিয়ে যান। কেননা দারুল উলূমের উন্নতি-অগ্রগতি ও নির্মিতির ক্ষেত্রে একই চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন তিনি আর হযরত নানুতবী রহ.।

যদিও দারুল উলূমে অভিভাবক পদের নীতিগত কোনো ক্ষমতা ছিল না ঠিক। তবে এই পদে আসীন ব্যক্তির ওপর যে পরিমাণ আস্থা রাখা হতো এবং যে পরিমাণ সম্মান করা হতো, তাতে দারুল উলূমের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ছিল তার অপরিসীম ভূমিকা। সমস্ত কাজই সাধারণত তার ইচ্ছা ও মতের অনুকূলে করা হতো এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই তাকে দেওবন্দে আসতে হতো।

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর অভিভাবকত্বের সময়কালে বেশ কিছু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। যাতে তিনি চরম বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বস্তুত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দারুল উলূমে সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচন করা ও জটিলতার জট খুলে দেয়া ছিল তার বড় একটি গুণ।

হযরতের অভিভাবকত্বের সময়ে হযরত নানুতবী রহ.-এর যোগ্য উত্তরসূরি

হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ.-কে দারুল উলূমের মুহতামিম পদে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি ৩৩ বছর পর্যন্ত স্ব-পদে বহাল ছিলেন। এত দীর্ঘ সময় পূর্বসূরিদের কেউই এই দায়িত্ব পালন করেননি। হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় মোতাবেক দারুল উলূমের উন্নতি-অগ্রগতিতে তিনি দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখেন। এটা হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ঈমানী দূরদর্শিতাই বলতে হয় যে, তিনি দারুল উলূমের এই বিরাট পদের জন্য সত্যিকারের যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছিলেন। যিনি একদিকে দারুল উলূমকে বিভিন্ন বিপদ-ঝুঁকি থেকে যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনই দারুল উলূমের পথকে সহজ ও সুগম করেছেন তাকে 'আযহারে হিন্দের' পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে।

হযরত গাঙ্গুহী রহ. ১৩১৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরেও অভিভাবকত্বের পদ অলংকৃত করেন। তার মানে তিনি তখন সকল উলামায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ও উলামায়ে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরের সর্বসম্মত ও সর্বস্বীকৃত বুযুর্গ ও রাহবার ছিলেন।

পরলোকগমন

৯ জমাদিউস সানি ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১১ আগস্ট ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে জুমআর দিন জুমআর আযানের পর ৭৮ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন এবং জন্মভূমি গাঙ্গুহেই সমাহিত হন।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ.

(জন্ম : ১২৪৯ হি./১৮৩৩ খ্রি., মৃত্যু : ১৩০২ হি./১৮৮৪ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীস। তিনি একদিকে যেমন উচ্চস্তরের আল্লাহওয়ালা আলেম ও কাশফসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন, তেমনই অপরদিকে ছিলেন উচ্চমার্গীয় মুহাদ্দিসও। তিনি অসংখ্য আলেমের উস্তাদ হযরত মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী রহ.-এর সুযোগ্য সন্তান ও গৌরবময় শাগরিদ।

মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দকে 'মাদরাসার' সাধারণ পর্যায় থেকে 'দারুল উলূমের' উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা এবং তার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছেন। দেওবন্দে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের মধ্যে যারা প্রথম সারির প্রসিদ্ধ আলেম, তাদের প্রায় সকলেই হযরতের সুযোগ্য ছাত্র।

প্রাথমিক জীবন

জন্মগ্রহণ করেন ১৩ সফর ১২৪৯ হিজরী মোতাবেক ২ জুলাই ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। জন্মস্থান নানুতা। 'মানযুর আহমদ', 'গোলাম হুসাইন' ও 'শামসুদ দুহা' তার ঐতিহাসিক নাম। জন্মভূমি নানুতায়ই কুরআনের হিফজ করেন। ১২৬০ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন তার বয়স ১১ বছর, পিতা তাকে দিল্লি নিয়ে যান। সেখানে *মিযান, মুনশায়িব* ও *গুলিস্তাঁর* মাধ্যমে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। প্রচলিত সকল বিষয়ের ইলম স্বীয় পিতা থেকেই অর্জন করেন। অবশ্য ইলমে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন হযরত শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী রহ. থেকে। মানকুল ও মাকুল তথা কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তিবিদ্যায় ছিলেন তিনি আপন পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি।

১২৬৭ হিজরীর জিলহজ মোতাবেক ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা মামলুক

আলী রহ. ইনতেকাল করেন। তার ইনতেকালের পর মাওলানা ইয়াকুব রহ. এক বছর দিল্লি অবস্থান করেন। তারপর আজমিরের গভর্নমেন্ট কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। 'মাকতুবাতে ইয়াকুবী' গ্রন্থে আছে :

> ত্রিশ রুপি বেতনের চাকরি নিয়ে তিনি আজমিরে গমন করলেন। তখন তার বয়স ছিল খুবই কম। আজমির কলেজের প্রিন্সিপাল দেখে বললেন, 'মাওলানা যোগ্য বটে, কিন্তু সমস্যা হলো অল্পবয়স্ক।' পরে প্রিন্সিপালের সুপারিশে তাকে ডেপুটি কালেক্টরের পদ সোপর্দ করা হলো। কিন্তু তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলেন। এরপর একশো রুপি মাসোহারায় বেনারস গমন করলেন। তারপর সেখান থেকে দেড়শো রুপি মাসোহারায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর হয়ে সাহারানপুর এলেন। এখানে আসার পরেই ঘটে ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা।

এ সময় মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. নানুতায় অবস্থান করছিলেন। তিনি সরকারি চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন এবং মিরাঠে মুনশি মুমতায আলীর ছাপাখানার চাকরি গ্রহণ করেন। হযরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর জীবনীগ্রন্থ 'হালাতে তাইয়েবে' মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. লেখেন :

> মুনশি মুমতায আলী মিরাঠে একটি ছাপাখানা খুললেন এবং পুরোনো বন্ধুত্বের সুবাদে মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-কে সেখানে ডেকে নিলেন। ফলে তিনি এসে প্রুফ রিডিংয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তবে এ দায়িত্ব অর্পণ ছিল নামমাত্র, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত কাসেম নানুতবী রহ.-কে সঙ্গে রাখা। (ইয়াকুব রহ. বলেন,) আমি অধমও বেরেলী ও লাখনৌ হয়ে মিরাঠের ওই ছাপাখানায় চাকরি গ্রহণ করেছিলাম।

দারুল উলূম দেওবন্দে পদার্পণ

১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি দেওবন্দ তাশরীফ আনেন এবং সদরুল মুদাররিসীনের পদ অলংকৃত করেন। তিনি ছিলেন দারুল উলূমের প্রথম শায়খুল হাদীস। তার তালিম-তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষায় বিশিষ্ট বহু আলেম গড়ে ওঠেন, যারা পরবর্তী সময়ে জ্ঞান ও গুণের সুবিশাল আকাশে চাঁদ-সুরুজ হয়ে আলো ছড়িয়েছেন।

১৯ বছরের শিক্ষকজীবনে ৭৭ জন তালিবে ইলম তার থেকে ইলমে নববী হাসিল করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আবদুল হক পুরকাযবী, মাওলানা আবদুল্লাহ আম্বিঠবী, মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ থানভী, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা খলীল আহমদ আম্বিঠবী, মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী, মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী, মাওলানা হাকিম মনসুর খান মুরাদাবাদী, মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান দেওবন্দী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ এবং মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.-এর ন্যায় বিখ্যাত ও যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. ও তার ছাত্রদের ইলমের উচ্ছল ধারা বিবেচনায় যদি এ কথা বলা হয় যে, সম্প্রতি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ায় যে পরিমাণ উলামায়ে কেরাম বিদ্যমান রয়েছেন, তাদের বড় একটা অংশ তারই ইলমী দস্তরখানের উচ্ছিষ্টভোজী, তাহলে অতিরঞ্জন বা অত্যুক্তি হবে না। হযরতের দরসের মজলিস সম্পর্কে 'আশরাফুস সাওয়ানিহ' গ্রন্থে এসেছে :

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. সকল শাস্ত্রে মাহির ও বিজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক গুরু ও শায়খে কামিলও ছিলেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. হযরত থেকে অজস্র ফয়েয ও বরকত হাসিল করেছেন এবং বিরল ও বিস্ময়কর সব ইলম বেশিরভাগ তার থেকেই লাভ করেছেন। নানুতবী রহ.-এর বাণী, অবস্থা, হাকীকত ও মারেফতের কথা বড় মজা নিয়ে আলোচনা করেন আর কেঁদে কেঁদে অশ্রুজলে সিক্ত হন হযরত থানভী রহ.।

উন্নত চরিত্র ও গুণাবলি

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর হাত ধরে সুলুক ও মারেফতের স্তরসমূহ অতিক্রম করেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে বহু উঁচু মাকাম হাসিল করেছিলেন। প্রায় সময়ই তার ওপর ছেয়ে থাকত ঐশী আকর্ষণ ও ভাবতন্ময়তা। পার্থিব সম্পর্ক-বন্ধনের প্রতিও ছিল না তেমন কোনো আকর্ষণ। জনৈক মুরিদ মুনশি মুহাম্মদ কাসেম নিয়ানগরীর নামে তিনি যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন, তা যেমন সুলুক, মারেফতের ও তাসাউফ-তত্ত্বের ভান্ডার, তেমনই তা একজন সালিকের জন্য পূর্ণ আলোর দিশারিও।

'মাকতুবাতে ইয়াকুবী' গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক হাকিম আমির আহমদ ইশরতী সাহেব লেখেন :

> তার শত শত ছাত্র ও মুরিদ এবং ছাত্রদের ছাত্র পুরো ভারতবর্ষসহ কাবুল, বুখারা ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। কুরআন-সুন্নাহ ও মানতিক-ফালসাফার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল তার মাঝে। বিশিষ্ট আলেম হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন সালিক ও মাজযুবও। একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক ছিলেন, তেমনই অপরদিকে ছিলেন দৈহিক চিকিৎসকও।

তিনি খুবই পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, সচ্চরিত্র ও সদালাপী ছিলেন। বড় গুণী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য স্বভাবপ্রকৃতিতে ছিল জালাল ও জযব তথা উষ্ণতা ও ভাবতন্ময়তার প্রাবল্য। যার কারণে মানুষ তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেত। কিন্তু তিনি প্রত্যেকের সাথেই বিনয়-নম্র ও অমায়িক আচরণ করতেন। পার্থিব বিষয়ে তিনি স্বীয় বুযুর্গদের মতো বড়ই নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত ছিলেন। যার কিছুটা অনুমান করা যায় এই ঘটনা থেকে যে, একবার এক ব্যক্তি তাকে বললেন, অমুক নওয়াবের বড় আকাঙ্ক্ষা, আপনি তার কাছে তাশরীফ নিয়ে যাবেন। তখন মাওলানা উত্তর দিলেন, শুনেছি, যে মৌলবি নিজ থেকে নওয়াব সাহেবের কাছে যায়, নওয়াব সাহেব তাকে একশো রুপি বকশিশ করেন। আমাকে যেহেতু তিনি নিজ থেকেই ডাকছেন, তাই সম্ভাবনা আছে আমাকে দুইশো রুপি বকশিশ করবেন। কিন্তু একশো-দুইশো রুপি দিয়ে আমাদের কতদিনই-বা যাবে। না, আমি সেখানে গিয়ে 'মওলবী' নামের ওপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে চাই না।

মাওলানা জামালুদ্দীন ভুপালী ছিলেন হযরত মাওলানা ইয়াকুব রহ.-এর অন্যতম শাগরিদ। তিনি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তিতে হযরতকে ভুপালে নিয়ে যেতে চাইলেন মোটা অঙ্কের বেতনভাতা নির্ধারণ করে। কিন্তু তিনি দারুল উলূমের স্বল্প বেতনসত্ত্বেও দারুল উলূমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা পছন্দ করলেন না। তাই নিজে না গিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন ভাগিনা মাওলানা খলীল আখতার আম্বিঠবীকে।

হজের সফর

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. দুইবার হজব্রত পালন করেছেন। প্রথম হজ সম্পাদন করেন ১২৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর সঙ্গে। হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন কান্ধলবী রহ. ও হযরত আবেদ হুসাইন দেওবন্দী রহ.-ও সঙ্গে ছিলেন। হজের এ সফর হয়েছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধুর পথ হয়ে। 'বায়াযে ইয়াকুবীর' মধ্যে হযরত ইয়াকুব নানুতবী রহ. নিজেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন।

দ্বিতীয় হজ সম্পাদন করেন ১২৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। এ সময়ও উলামায়ে কেরামের বড় একটি জামাত সাথে ছিল। মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ., মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার নানুতবী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ মুনির নানুতবী রহ., মাওলানা হাকিম জিয়াউদ্দীন রামপুরী রহ., শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ.-এর মতো বুযুর্গ উলামায়ে কেরাম ছাড়াও হজ-কাফেলার সৌভাগ্যবান সহযাত্রী ছিলেন প্রায় একশো মানুষ।

ইলমী স্মারকচিহ্ন

উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষার কাব্যের প্রতি ছিল হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ.-এর বিশেষ ঝোঁক। উর্দু ও ফারসি ভাষার কাব্যজগতে তার ছদ্মনাম ছিল 'গমনাম'। ছাত্রজীবনে দিল্লিতে গালিব, মুমিন, যাওক, সহবায়ী ও আযুরদার ন্যায় যুগশ্রেষ্ঠ কবিদের তিনি দেখেছেন এবং তাদের সাহিত্য-মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাদের কবিতা শুনেছেন। হযরতের উর্দু ও ফারসি কবিতাসমূহ 'বায়াযে ইয়াকুবী'-তে লিপিবদ্ধ আছে। তার রচিত কবিতার মাঝে বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় আবেগ, অনুভূতি ও হৃদয়োত্তাপেরও পরিচয়।

স্মারক হিসাবে তিনটি রচনা রেখে গেছেন। যথা :

- হযরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর জীবনীগ্রন্থ হিসাবে লিখিত حالاتِ جنابِ طیب محمد قاسم صاحب مرحوم, যা ভুপাল থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ হিজরীতে। কিতাবটি কলেবরে সুসংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ হলেও ভাষা, সাহিত্য, ঘটনা ও অবস্থার বিবরণে খুবই অমূল্য ও সমৃদ্ধ।

- 'মাকতুবাতে ইয়াকুবী-সমগ্র'। এতে ৬৪টি চিঠি সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাবে লিখিত। আধ্যাত্মিক পথের নানা সমস্যার সমাধান, শরয়ী মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা এবং সুলুক ও তরীকতের কর্মপন্থা উল্লেখ করা হয়েছে এসব চিঠিপত্রে।
- 'বায়াযে ইয়াকুবী-সমগ্র'। এতে হজের সফরের বিবরণ, হাদীসের কিতাবসমূহের সনদ, কবিতা, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। শেষদিকে চিকিৎসাবিষয়ক কিছু ব্যবস্থাপত্রও উল্লেখ রয়েছে।
- হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. সমগ্রদুটিতে প্রয়োজনীয় হাশিয়া ও পাদটীকা যুক্ত করেছেন।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

মৃত্যুর কিছুদিন আগে হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. নানুতা তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেখানেই প্লেগে আক্রান্ত হন। অবশেষে ৩ রবিউল আউয়াল ১৩০২ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন এবং সাহারানপুর রোডের পাশে অবস্থিত নানুতা কবরস্তানে সমাহিত হন।

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ.

(জন্ম : ১২৫২ হি./১৮৩৬ খ্রি., মৃত্যু : ১৩০৮ হি./১৮৯০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুহতামিম। সাধুতা, ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, খোদাভীরুতা ও আল্লাহমুখিতায় ছিলেন সমকালীন উলামায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। একদিকে তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা আবদুল গনী মুজাদ্দেদী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা, অপরদিকে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ও প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান দেওবন্দী রহ. (মৃত্যু : ১৩৪৭ হি./১৯২৮ খ্রি.) ছিলেন তার বিশিষ্ট খলীফা।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ. ১২৫২ হিজরী মোতাবেক ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উসমানী বংশের সন্তান। তার পিতা মাওলানা ফরিদ উদ্দীন উসমানী ছিলেন একজন যোগ্য আলেম এবং হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর অন্যতম খলীফা। হযরত মাওলানার তিন ভাই ছিলেন; জনাব বলন্দ বখ্ত উসমানী, জনাব মাকসুদ আলী উসমানী ও জনাব সাইয়েদ আহমদ উসমানী। তিনজনই শাহাদাতবরণ করেন বালাকোটের ময়দানে জিহাদরত অবস্থায়।

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন রহ. বদস্তুর আলেম ছিলেন না ঠিক, তবে ফারসি ভাষা ও ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে ছিল তার পর্যাপ্ত জ্ঞান। হতে পারে ইলমী অবস্থান সাধারণ ছিল, কিন্তু ব্যবস্থাপনা-যোগ্যতা ছিল তার অসাধারণ। বস্তুত এই বিষয়ে বিস্ময়কর সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি।

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ. ছিলেন শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী রহ.-এর অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ খলীফা। শাহ সাহেব এ নিয়ে গর্বও

করতেন। একইভাবে তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর ইলম ও মারেফতের ঝরনাধারা থেকেও জলসিঞ্চন করেছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন স্ব-যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও ওলীয়ে কামেল। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. বলেন, মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ.-এর মাঝে ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মাঝে এ ছাড়া কোনো তফাত ছিল না যে, গাঙ্গুহী রহ. আলেম ছিলেন, আর তিনি আলেম ছিলেন না। অন্যথায় রুহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে উভয়ে ছিলেন সমপর্যায়ের।

দারুল উলূমের মুহতামিম পদে আরোহণ

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ. দুইবার দারুল উলূমের মুহতামিম পদে নিয়োগ হয়েছেন। প্রথমবার নিয়োগ হন ১২৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। যখন হাজী আবেদ হুসাইন সাহেব রহ. হজব্রত পালনের উদ্দেশে হারামাইন সফরের ইচ্ছা করেছিলেন। যাতে হাজী সাহেবের অনুপস্থিতির দিনগুলোতে তিনি ইহতেমামের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এই দায়িত্বে তিনি বহাল ছিলেন ১২৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১২৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রফী উদ্দীন সাহেব রহ. হজের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে গেলে মুহতামিমের দায়িত্ব পুনরায় হাজী আবেদ হুসাইন রহ.-কে অর্পণ করা হয়।

তারপর হাজী সাহেবের জামে মসজিদ নির্মাণকেন্দ্রিক ব্যস্ততা ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে প্রায় তিন বছর পর ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় রফী উদ্দীন সাহেব রহ.-কে মুহতামিম পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। হযরতের ইহতেমামের দায়িত্ব পালনের পূর্ণ সময়কাল প্রায় ১৯ বছর।

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ. তার সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রসিদ্ধ আছে, ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবস্থাপনা-যোগ্যতার মিলন ও সহাবস্থান নাকি খুবই বিরল। কিন্তু তার মাঝে এই তিন গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল পূর্ণমাত্রায়।

দারুল উলূমের প্রথম দিককার অধিকাংশ বিল্ডিং তার ইহতেমামের জামানায়ই নির্মিত হয়েছে। নির্মাণ ও নির্মিতির ক্ষেত্রে হযরতের কেমন রুচিশীলতা ছিল,

তার কিছুটা আন্দাজ করা যায় ওই সময়ের বিল্ডিং, বিশেষ করে 'নওদারা'-এর নির্মাণ-সৌন্দর্য ও স্থাপত্য-সৌকর্য দ্বারা। দারুল উলূমের অন্যান্য বিল্ডিংয়ের মধ্যে 'নওদারা' অনন্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে।

১২৯২ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভবনটি নির্মাণের সময় তিনি এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবনটির জায়গায় তাশরীফ এনেছেন। নবীজী বললেন, বিল্ডিংয়ের পরিধি তো খুবই স্বল্প। এরপর আপন লাঠি মুবারক দ্বারা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে রেখা টেনে দিয়ে বললেন, এই রেখা অনুসরণ করেই যেন বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। পরে ঠিক সেভাবেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বিল্ডিং নির্মিত হয়। এটিই দারুল উলূমের প্রথম বিল্ডিং। এর ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন *সহীহ বুখারীর* পাদটীকা-লেখক হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ., হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার নানুতবী রহ.-সহ অন্যান্য খোদাভীরু বুযুর্গ উলামায়ে কেরাম।

দারুল উলূম দেওবন্দের মূলকেন্দ্র 'ইহাতায়ে মুলসুরী' তথা বকুল গাছের বাউন্ডারি মূলত তারই যুগের স্মৃতি বহন করে আছে। এই বাউন্ডারির মধ্যেই সেই ঐতিহাসিক কূপ বিদ্যমান রয়েছে, যা 'নওদারা' নির্মাণের সময় খনন করা হয়েছিল। এই কূপটিকে বড়ই বরকতপূর্ণ মনে করা হয়। হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন রহ. একবার স্বপ্ন দেখেন যে, কূপটি দুধে টইটম্বুর, আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে পাত্রে ভরে ভরে দুধ বণ্টন করছেন। কারও হাতে ছোট পাত্র, কারও হাতে বড় পাত্র। প্রত্যেকেই স্ব স্ব পাত্র ভরে দুধ নিয়ে যাচ্ছে। পরে দুধের ব্যাখ্যা করা হয় ইলম দ্বারা, আর পাত্রের ব্যাখ্যা করা হয় ব্যক্তির ইলম ধারণের যোগ্যতা দ্বারা।

হিজরত ও ইনতেকাল

হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ. ১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের জন্য হজে গমন করেন। হযরতের হজের এ সফর ছিল হিজরতের উদ্দেশ্যে। তাই হজ শেষে স্থায়ীভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে থাকেন। হিজরতের দুই বছর পর ১৩০৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে মদীনাতেই তিনি ইনতেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে মাদফুন হন।

হযরত হাজী সাইয়েদ ফযলে হক দেওবন্দী রহ.

(মৃত্যু : ১৩১৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত হাজী মুনশি ফযলে হক ইবনে ইউসুফ রহ. ছিলেন দেওবন্দের সাদাতে রিজবিয়্যাহ বংশের। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন ও সহায়তা দানে শরীক ছিলেন এবং সূচনালগ্ন থেকেই মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য ছিলেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর হাতে বাইয়াতপ্রাপ্ত হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত হাজী ফযলে হক দেওবন্দী রহ.-কে দফতরি কাজকর্ম দেয়া হয়েছিল। পরে ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে যখন হযরত আবেদ হুসাইন দেওবন্দী রহ. ইহতেমামের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন, তখন তিনি উক্ত পদে আসীন হন এবং প্রায় এক বছর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে অব্যাহতি গ্রহণ করেন।

লেখালেখির বিশেষ যোগ্যতার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনাগত যোগ্যতাও ছিল তার পূর্ণমাত্রায়। তিনি দারুল উলূমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে সাহারানপুর সরকারি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন বা শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

হাজী ফযলে হক সাহেব রহ. হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর একটি বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা আলোর মুখ দেখতে পারেনি। মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী কৃত *সাওয়ানিহে কাসেমীর* স্থানে স্থানে 'অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি' নামে উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়, কিতাবটি খুবই সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল। হাজী ফযলে হক রচিত এই জীবনীগ্রন্থ ১৩৮৫ হিজরী পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দের ট্রেজারিতে সংরক্ষিত ছিল।

হযরত হাজী ফযলে হক দেওবন্দী রহ. ১৩০৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্থানে ইনতেকাল করেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুনির নানুতবী রহ.

(জন্ম : ১২৪৭ হি./১৮৩১ খ্রি., মৃত্যু : ১৩২১ হি./১৯০৩ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুনির নানুতবী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের চতুর্থ মুহতামিম। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আহসান নানুতবী রহ. এবং মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার নানুতবী রহ.-এর ছোট ভাই। তা ছাড়া মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এরও আত্মীয়-সম্পর্কের ভাই ছিলেন। শামেলী যুদ্ধের অন্যতম মুজাহিদ ছিলেন। খুবই মুত্তাকী, পরহেযগার ও দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন।

প্রাথমিক অবস্থা

মাওলানা মুহাম্মদ মুনির নানুতবী রহ. ১২৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে নানুতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় পিতা হাফেজ লুতফ আলী সাহেব থেকে গ্রহণ করেন। তারপর দিল্লি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে হযরত মওলানা মামলুক আলী নানুতবী রহ., মুফতী সদরুদ্দীন আযুরদাহ রহ. ও হযরত শাহ আবদুল গনী দেহলভী রহ. থেকে ইলম হাসিল করেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর সঙ্গে ছিল তার সুগভীর সম্পর্ক। তারা ছিলেন শৈশবেরও সাথি।

মাওলানা মুনির সাহেব রহ. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুজাহিদ ও প্রাণবন্ত সদস্য ছিলেন। ঐতিহাসিক শামেলীর যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য আকাবির উলামায়ে কেরামের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করেছেন। 'সাওয়ানিহে কাসেমীর' ভাষ্য অনুযায়ী তিনি যুদ্ধবিষয়ক সেক্রেটারি ছিলেন এবং শত্রুর মোকাবিলায় বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শামেলী যুদ্ধের পর উলামায়ে কেরামের ওপর ইংরেজদের রোষানল বর্ষিত হলে তিনি আত্মগোপন করেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর বড় ভাই

মাওলানা মুহাম্মদ আহসান সাহেবের কাছে বেরেলী চলে যান এবং ১২৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে বেরেলী কলেজে চাকরি গ্রহণ করেন। পেনশন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বেরেলীতেই থাকেন। এ সময় বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সিদ্দিকী ছাপাখানার জিম্মাদারিও পালন করেন। ১২৯৪ হিজরীর পর বেরেলীর সাথে তার সম্পর্কের ইতি ঘটে।

মাওলানা মুনির সাহেব রহ. নকশবন্দী সিলসিলার বাইয়াত ছিলেন এবং খুবই ভাবগম্ভীর ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'সিরাজুস সালিকীন' নামে ইমাম গাযালী রহ.-কৃত 'মিনহাজুল আবিদীন' কিতাবের উর্দু অনুবাদ করেছেন, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮১ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বেরেলী সিদ্দিকী ছাপাখানা থেকে।

হযরতের দ্বিতীয় রচনার নাম 'ফাওয়ায়িদে গারিবা'। তাসাউফ ও তাযকিয়া সম্পর্কিত এ কিতাবটি তিন অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নফস ও আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত সম্পর্কে।

মাওলানা মুনির সাহেব রহ. দুইবার হজ করেছেন। প্রথম হজ ১২৭৮ হিজরীতে এবং দ্বিতীয় হজ ১২৯৫ হিজরীতে। হজ সম্পর্কেও একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন।

দারুল উলূমের সাথে সম্পর্কস্থাপন

মুনশি সাইয়েদ ফযলে হক দেওবন্দী রহ.-এর পর ১৩১১ হিজরীতে দারুল উলূমের অভিভাবকপুরুষ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর ইঙ্গিতে মাওলানা মুনির সাহেব রহ. দারুল উলূমের মুহতামিম পদে বরিত হন। এক বছরের কিছু বেশি সময় তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ইহতেমামের দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার পাশাপাশি মূল সময়ের বাইরে তিনি দারুল উলূমে ছাত্রদের আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন কিতাব পড়াতেন।

দ্বীনদারী ও আমানতদারীতে তিনি অনেক উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। 'আরওয়াহে সালাসাহ' নামক গ্রন্থে তার সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ আছে। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

দারুল উলূমের বাৎসরিক কার্যবিবরণী ছাপানোর জন্য তিনি আড়াইশো রুপি নিয়ে দিল্লি যান। ঘটনাক্রমে সেখানে পৌঁছার পর রুপিগুলো চুরি হয়ে গেল। তখন কাউকে কিছু না জানিয়ে জন্মভূমি নানুতায় ফিরে গেলেন এবং নিজের জমি বেচে রুপি জোগাড় করলেন। তারপর সেই রুপি দিয়ে দেওবন্দের কার্যবিবরণী ছাপিয়ে আনলেন।

মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দ যখন সুরতেহাল সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তারা এ সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে। তিনি উত্তরে বললেন, 'মুহতামিম সাহেব যেহেতু আমানতদার ছিলেন, আর রুপিগুলোও যেহেতু তার অবহেলা ছাড়াই চুরি হয়ে গেছে, সেহেতু তার ওপর কোনো জরিমানা আসবে না।'

শুরা-সদস্যগণ এই ফাতাওয়া দেখে মাওলানা মুনির নানুতবী রহ.-এর কাছে দরখাস্ত করলেন রুপি ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে। কিন্তু শত পীড়াপীড়ির পরেও মাওলানা এই বলে না করে দিলেন যে, 'এটি ফাতাওয়ার বিষয় নয়। খোদ মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেবের সাথেও যদি এই ঘটনা ঘটত, তাহলে কি তিনি রুপি ফিরিয়ে নিতেন?'

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

বড় ভাই হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহসান নানুতবী রহ.-এর ইনতেকালের পর হযরত মাওলানা মুনির নানুতবী রহ. ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূমের ইহতেমামের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং মাতৃভূমি নানুতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন, তা সংরক্ষিত নেই। অবশ্য ১৩২১ হিজরী মোতাবেক ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবদ্দশায় থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ.

(মৃত্যু : ১৩১১ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় সদরুল মুদাররিসীন। তিনি ছিলেন একজন সুপ্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৃতীয় বছরে, ১২৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষক হিসাবে হযরতকে দারুল উলূমে নিয়ে আসা হয়। ১৩০২ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ.-এর ইনতেকালের পর তাকে সদরুল মুদাররিসীনের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। স্বপদে তিনি ছয় বছর পর্যন্ত বহাল ছিলেন। এই ছয় বছরে ২৮ জন তালিবে ইলম দাওরা হাদীস সমাপন করে। ১৩০৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত দেহলভী রহ. দেওবন্দ থেকে অব্যাহতি নেন এবং ভুপাল চলে যান।

সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ. হযরত নানুতবী রহ.-এর হাতে বাইয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন। হযরত থানভী রহ. স্বীয় মসনবী 'ঝের ও বাম'-এর পাদটীকায় দেহলভী রহ. সম্পর্কে লেখেন, 'জনাব মাওলানা সাইয়েদ আহমদ সাহেব বিশেষ করে গণিতশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।'

যে কবিতাগুলোর ওপর উপরিউক্ত পাদটীকা লেখা হয়, তা হচ্ছে এই :

دوئی آں سالک شرع نبی * مولوی سید احمد دہلوی

শরীয়তে মুহাম্মদের একনিষ্ঠ অনুসারী;
মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী।

وصف ذہن او اگر سازد قلم ٭ ختم نبود بشکند صدہا قلم

তার প্রতিভার কথা যদি লেখে কলমের কালি,
শেষ হবে না তা; শেষ হবে হাজারো লেখনী

خاتم معقول وعلم فلسفہ ٭ ہم ریاضی وعلوم مشکلہ

যুক্তিতর্কের ইমাম ছিলেন, দর্শনশাস্ত্রেও তিনি।
গণিতের মতো জটিল বিষয়ে ছিলেন পারদর্শী

پارسا و متقی، کم گو، حلیم ٭ ہم سخی وہم جواد وکریم

কথা-কর্মে সংযত ও পরহেযগার-মুত্তাকী।
উদার, মহান, মহানুভব ও বদান্যতার খনি।

হযরত সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বলেন :

নাম : সাইয়েদ আহমদ। উপনাম : আবুল খায়ের। পিতা : মাওলানা ইমামুদ্দীন। সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ. ছিলেন দিল্লির বিখ্যাত আলেম ও সাইয়েদ বংশের সন্তান। রানি যিনত মহল ও শাহজাদাদের শিক্ষক হওয়ার সুবাদে তার পিতা ছিলেন খুবই সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ। মাওলানা আহমদ সাহেব রহ. ছিলেন মাওলানা মির সাইয়েদ মাহবুব আলী জাফরী সাহেব রহ.-এর ভাগিনা, যিনি হযরত শাহ আবদুল আযিয রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্রদের অন্যতম। যুক্তিবিদ্যা, বিশেষ করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল সাইয়েদ সাহেবের। হযরত কাসেম নানুতবী রহ. তার সম্পর্কে বলতেন, গণিতশাস্ত্রে আল্লাহ তাআলা তাকে এই পরিমাণ যোগ্যতা ও দক্ষতা দান করেছিলেন যে, শাস্ত্রবিদদেরও বুঝি এর চেয়ে বেশি ছিল না। ১৩০৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে নওয়াব শাহজাহান বেগমের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি ভুপাল গমন করেন এবং মাদরাসায়ে জাহাঙ্গিরিতে মুহতামিম ও সদরুল মুদাররিসীনের পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু ইলমের এ ধারা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র চার বছর পর ১৩১১ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মাওলানা রহ. ছিলেন খুবই শান্ত, সৌম্য, নিরিবিলিপ্রিয় ও ভাবগম্ভীর।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ.

(জন্ম : ১২৬৮ হি./১৮৫১ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৩৯ হি./১৯২০ খ্রি.)

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র, গাঙ্গুহী রহ.-এর পর দারুল উলূমের দ্বিতীয় অভিভাবক এবং দারুল উলূমের প্রথম সারির উলামায়ে কেরামের উস্তাদ ও মুরুব্বি। অধ্যাপনা, গ্রন্থরচনা ও ওয়াজ-নসীহতের ময়দানে এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। দ্বীন-ইসলামের সকল অঙ্গনে তার কীর্তি ও অবদান স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর জন্ম ১২৬৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে বেরেলী শহরে, যেখানে তার পিতা মাওলানা যুলকিকার আলী রহ. সরকারি শিক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন স্বীয় চাচা প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মেহতাব আলী রহ.-এর কাছে।

পড়াশোনার ধারাবাহিকতায় হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তখন *কুদুরী* ও *শরহে তাহযিব* পড়ছিলেন, এরইমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ। ফলে দারুল উলূমের প্রথম ছাত্র হিসাবে তিনি সেখানে ভর্তি হন। তার উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা মোল্লা মাহমুদ দেওবন্দী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ.। দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা-সিলেবাস সমাপ্ত করার পর তিনি হযরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর নিকট হাদীসশাস্ত্র চর্চা করেন এবং পিতার নিকট বিভিন্ন শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের কিছু কিতাব পড়েন। অবশেষে ১২৯০ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হযরত নানুতবী রহ.-এর হাতে 'দস্তারে

ফযিলত' হাসিল করেন।

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর প্রতি হযরত নানুতবী রহ.-এর ছিল বিশেষ স্নেহ-মমতা। ছাত্রজীবনেই তাকে নানুতবী রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হতো। কাসেমী ইলম ও মারেফতের যে উচ্ছল ধারা তার থেকে প্রবাহিত হয়েছে, অন্যান্য ছাত্রদের মাঝে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বস্তুত শায়খুল হিন্দ রহ. ছিলেন হযরত নানুতবী রহ.-এর ইলম ও ফিকির তথা জ্ঞান ও চেতনার সুবিশ্বস্ত রক্ষক এবং তার স্বার্থহীন ব্যাখ্যাকার।

ইলম ও তাকওয়ায় যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব

হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ.-এর ইলমী ও যেহনী, তথা জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার কারণে আকাবিরগণ তাকে দারুল উলূমের শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করেন। সে মতে ১২৯১ হিজরীতে দারুল উলূমের চতুর্থ স্তরের উস্তাদ হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকজীবনের শুরু থেকেই তিনি অত্যন্ত মেহনত ও কষ্টসহিষ্ণুতার সাথে দারুল উলূমের খেদমত আঞ্জাম দেন। কখনো কখনো উনিশটি কিতাবের দরস দিতেন। মাগরিব, এশা ও ফজরের পরেও সবক পড়াতেন।

হযরত নানুতবী রহ.-এর শোকাবহ মৃত্যুর পর শায়খুল হিন্দ রহ. দরস দেয়া বন্ধ করে দেন। পরে দারুল উলূমের তদানীন্তন মুহতামিম হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন দেওবন্দী রহ.-এর পীড়াপীড়িতে পুনরায় দরস দেয়া শুরু করেন। ১২০৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী রহ.-এর অব্যাহতি নেয়ার পর তিনি দারুল উলূমের পরবর্তী সদরুল মুদাররিস নিযুক্ত হন। সে সময় সদরুল মুদাররিসের মুশাহারা ছিল ৭৫ রুপি। কিন্তু তিনি পঞ্চাশ রুপি গ্রহণ করে বাকি পঁচিশ রুপি দারুল উলূমেই দান করে দিতেন। পঞ্চাশ রুপির বেশি কখনো গ্রহণ করতেন না।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. জাহেরী ইলমের পাশাপাশি বাতেনী ইলমেও ছিলেন সজ্জিত ও সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিক সাধনা করেন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর দরবারে। তাসাউফ ও সুলুকের একেকটি স্তর অতিক্রম করে যখন পূর্ণতায় পৌঁছেন, তখন গাঙ্গুহী রহ. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-কে পত্রমারফত জানান, 'মাওলানা মাহমুদুল হাসান রুহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতার এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন যে, সে ইজাযত ও খেলাফত

লাভের যোগ্য। সুতরাং তাকে ইজাযত ও খেলাফত দান করুন।' যতদিন পর্যন্ত হযরত হাজী সাহেব রহ. জীবদ্দশায় ছিলেন ততদিন পর্যন্ত গাঙ্গুহী রহ. নিজে ইজাযত ও খেলাফত দেয়ার পরিবর্তে হাজী সাহেবের কাছে সুপারিশ করতেন, আর হাজী সাহেব লিখিতভাবে ইজাযত ও খেলাফত দান করতেন। তারপর গাঙ্গুহী রহ.-ও নিজের পক্ষ থেকে ইজাযত ও খেলাফত দান করতেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ওজিফা পাঠ, রাত্রিজাগরণ ও তাহাজ্জুদ আদায়ে ছিলেন খুবই একনিষ্ঠ ও নিয়মানুবর্তী। যে দিনগুলোতে দেওবন্দে আঠারো-উনিশটি সবক পড়াতেন, এশার পর ও ফজরের পরও দরস দিতেন, সেইসাথে রাতে মুতাআলাও করতেন, তখনও রাত্রিজাগরণ ও ওজিফা পালনে কোনো ত্রুটি হতো না। মাল্টা দ্বীপে বন্দি থাকার দিনগুলোতে যখন সেখানকার ঠান্ডার তীব্রতা নওজোয়ান সাথি-সঙ্গীদের জন্যও দুঃসহ হয়ে দাঁড়াত, তখনো বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও শীর্ণতা নিয়ে রাতের শেষ প্রহরে তিনি নিয়মিত জাগ্রত হতেন এবং মাওলার দরবারে আহাজারি ও রোনাজারিতে মশগুল হয়ে যেতেন।

হযরতের জীবনযাপন ছিল একেবারেই সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন। কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার-অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে কোনোভাবেই বড়ত্ব ও অহমিকার প্রকাশ ঘটাতেন না। স্বভাবচরিত্রে বিনয়-নম্রতা ও শিষ্টাচার ছিল অত্যধিক। গরিব, অসহায় ও সাধারণ মানুষের মাঝে থাকতেই পছন্দ করতেন তিনি। বিত্তশালী ও দুনিয়াদার লোকদের কৃত্রিম ও লৌকিকতাপূর্ণ আচরণে খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন। একদিকে যেমন বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন, তেমনই ছিলেন কুরআন-সুন্নাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানসমূহেও সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত। ইতিহাসের অধ্যয়নও ছিল ব্যাপক-বিস্তৃত। সাহিত্য ও কবিতার প্রতিও ছিল ঝোঁক-প্রবণতা। অসংখ্য কবিতা তার মুখস্থ ছিল এবং নিজেও কবি ছিলেন। আওয়াজ ছিল পরিষ্কার, কথা ছিল সংক্ষিপ্ত, আর শরীর ছিল মধ্যম। চলাফেরা ও কথাবার্তায় গাম্ভীর্য ধরে রাখতেন। তার সুদর্শন চেহারায় উচ্চ মনোবল ও বিনয়-নম্রতার চিহ্ন ফুটে উঠত, ইবাদত-বন্দেগী ও মুজাহাদার নূর বিচ্ছুরিত হতো। সাথি-সঙ্গী, ভক্ত-অনুরক্ত ও ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতেন মুখে হাসির রেখা টেনে, কিন্তু এর পরও চেহারায় সুস্পষ্ট দেখা যেত ভাবগাম্ভীর্যের ছায়া ও ছাপ।

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইলমের উচ্ছল প্রবাহধারা

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে তার শিক্ষকজীবনের উদ্বোধন করেন এবং শেষ পর্যন্ত চালু থাকে তার ইলমী নির্ঝরের উচ্ছল ধারা। হযরতের দরস-তাদরিসের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাহকীক, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সুসংক্ষিপ্ততা। মূলকথা ও সারবত্তা আলোচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন। বাড়তি ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকতেন। মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও ইমামদের নাম যখন আসত, অত্যন্ত সম্মান ও সমীহের সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। তার হালকায়ে দরস দেখে চোখের সামনে ভেসে উঠত সালফে সালেহীন ও আকাবির মুহাদ্দিসীনের দরসে হাদীসের ভাবগম্ভীর মজলিসের মনোজ্ঞ চিত্র। পুরো কুরআন ও হাদীসই যেন ছিল তার মুখস্থ। সাহাবা, তাবেয়ীন, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের উক্তি এবং চার মাযহাবের চার ইমামের মাযহাব ছিল পূর্ণ আত্মস্থ ও ঠোঁটস্থ।

বহু মেধাবী ও প্রতিভাবান তালিবে ইলম অন্যান্য উস্তাদের থেকে ইসতেফাদা করার পর হযরতের খেদমতে হাজির হতো। যখন হযরতের জবানে কুরআন ও হাদীসের অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্য শ্রবণ করত এবং নিজেদের বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ ও আপত্তির সন্তোষজনক সমাধান লাভ করত, তখন তারা অবনত মস্তকে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে স্বীকার করত যে, এমন ইলম আমরা কারও মধ্যে পাইনি এবং এমন আলেমও দুনিয়ার বুকে কোথাও দেখিনি। অসাধারণ ইলমী ব্যক্তিত্বের কারণে হযরত থেকে বিপুল-সংখ্যক তালিবে ইলম হাদীসের শিক্ষা লাভ করেছে। বস্তুত দারুল উলূমের প্রথম সারির যত আলেম ও ফাযেল তাদের অধিকাংশই তার থেকে ইলমের দরস গ্রহণ করেছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রে দক্ষ, বিদগ্ধ ও পারদর্শী উলামায়ে কেরামের একটি মুবারক জামাত তৈরি করে গেছেন। যাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ., হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ., হযরত মাওলান আশরাফ আলী থানভী রহ., হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী রহ., হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ., হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ., হযরত মাওলানা আসগর হুসাইন দেওবন্দী রহ., হযরত মাওলানা মানসুর আনসারী রহ., হযরত মাওলানা ইবরাহীম

বালিয়াবী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইজায আলী আমরুহী রহ., হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ রহ., হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ ফয়েযাবাদী রহ., শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলবী রহ., হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল হাযরাবী রহ., হযরত মাওলানা রাসূল খান হাযরাবী রহ., হযরত মাওলানা ফযলে রাব্বি হাযরাবী রহ., হযরত মাওলানা আকবার শাহ পেশাওয়ারী রহ., হযরত মাওলানা উযায়ের গুল সারহাদ্দী রহ., হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব দরভাঙ্গবী রহ., হযরত মাওলানা আবদুস সামাদ রহমানী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক করাচি রহ., হযরত মাওলানা ডক্টর আবদুল আলী লাখনৌবি রহ., হযরত মাওলানা আহমদুল্লাহ পানিপথী রহ. প্রমুখ।

রচনাবলি

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. দরস-তাদরিস নিয়ে অত্যধিক ব্যস্ত থাকার কারণে রচনা ও গ্রন্থনার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি। কর্মজীবনের শুরুর পঁচিশ-ত্রিশ বছর কেটেছে দরস-তাদরিসের মধ্যে এবং পরের বাকি জীবন কেটেছে জিহাদ ও সংগ্রামের মধ্যে। এরপরেও সুযোগ্য ও সুদক্ষ ছাত্রদের সহযোগিতায় অমূল্য ইলমী অবদান রেখে গেছেন তিনি। তার রচিত কিতাবসমূহের তালিকা নিম্নরূপ :

- ترجمہ شیخ الہند (তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ)। এটি কুরআন শরীফের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তরজমা। সূরা নিসা পর্যন্ত তরজমা করার পাশাপাশি হাশিয়াও সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু পুরো করে যেতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. সমাপ্ত করেছেন। এই তরজমা সউদি সরকারের পক্ষ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

- الأبواب والتراجم (আল-আবওয়াব ওয়াত-তারাজিম)। যা *সহীহ বুখারীর* অধ্যায়-শিরোনামের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রচিত।

- تقرير الترمذي (তাকরীরুত তিরমিযী), যা আরবি ভাষায় সংকলিত।

- حواشي وتعليقات على سنن أبي دؤود (হাওয়াশী ওয়া তালিকাত আলা সুনানি আবি দাউদ)।

- حاشية مختصر المعاني (হাশিয়াতু মুখতাসারুল মাআনী)।
- جهد المقل في تنزيه المعز والمذل (জুহদুল মুকিললি ফী তানযীহিল মুয়িযযি ওয়াল মুযিললি)।
- الادلۃ الکاملۃ (আল-আদিল্লাতুল কামিলা)। এটি গায়রে মুকাল্লিদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটলাবির দশ প্রশ্নের জবাবে রচিত।
- ایضاح الادلۃ بجواب مصباح الادلۃ (ইযাহুল আদিল্লাহ বি জাওয়াবি মিসবাহিল আদিল্লাহ)।
- احسن القری فی توضیح اوثق العری (আহসানুল কুরা)।
- افادات (ইফাদাত), যা দুটি প্রবন্ধের সংকলন।
- فتاوی شیخ الہند (ফাতাওয়ায়ে শায়খুল হিন্দ।
- مکتوبات شیخ الہند (মাকতুবাতে শায়খুল হিন্দ)।
- کلیات شیخ الہند (কুল্লিয়াতে শায়খুল হিন্দ)।

জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কীর্তি-অবদান

ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর চাই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ আসুক, চাই স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের গৌরব ও মর্যাদার প্রসঙ্গ আসুক, বা মুজাহিদদের আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রসঙ্গ আসুক, কিংবা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অতুলনীয় পরিকল্পনা তৈরির প্রসঙ্গ আসুক, সবখানেই চিন্তা, গবেষণা, দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং অপূর্ব ত্যাগ ও আত্মত্যাগের জন্য হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর মহান নাম উচ্চারিত হয় অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহের সঙ্গে।

বস্তুত শায়খুল হিন্দ রহ. ছিলেন সেসব উলামায়ে দেওবন্দের সত্যিকারের ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী, যারা দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি রেখেছিলেন এই চিন্তা ও চেতনার মশাল হাতে যে, সেখান থেকে উলামায়ে কেরামের এমন একটি জামাত তৈরি হবে, যারা একদিকে যেমন মুসলমানদের দ্বীন-ঈমানের হেফাজতে ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, তেমনই মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করবে ভারত ভূখণ্ডকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করে।

শায়খুল হিন্দ রহ. প্রথমে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তানৈতিকভাবে সুসংহত ও সুসংগঠিত করার জন্য 'সামারাতুত তারবিয়াহ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। তারপর 'জামইয়্যাতুল আনসার' নামে আরেকটি সংগঠন তৈরি করেন। যার সেক্রেটারি ছিলেন মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ.। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে দারুল উলূমের শ্রেষ্ঠত্ব ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত করা, দারুল উলূমের শিক্ষাদীক্ষা, চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটানো, সর্বোপরি দারুল উলূমকে সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়া। 'জামইয়্যাতুল আনসার' সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম থেকে শায়খুল হিন্দ রহ. আপন শাগরিদদের গড়ে তোলা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দিক বিবেচনায় 'নাযারাতুল মাআরিফিল কুরআনিয়্যাহ' নামক সংগঠন তৈরি করেন। ওই সময় মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ছিল খুবই নাযুক। ত্রিপলী ও বলকানের যুদ্ধের কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করছিল টানটান উত্তেজনা।

ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ অপশাসনের বিদায়ঘণ্টা বাজানোর জন্য ১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আর সেজন্য সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে ইংরেজদের মসনদ উলটে দেয়ার একটা স্কিম তৈরি করেছিলেন এবং খুবই নিখুঁতভাবে আপন প্ল্যান-প্রোগ্রাম বিন্যাস করেছিলেন। প্রস্তাবিত প্ল্যান-প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্যন্ত সাহসিকতা ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার ছাত্র ও সহকর্মীদের বড় একটি দল, যারা দেশ ও দেশের বাইরে অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ. ও মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মানসুর আনসারী রহ.-সহ ভারতের ও ভারতের বাইরের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন শায়খুল হিন্দ রহ.-এর রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর উপরিউক্ত প্ল্যান-প্রোগ্রামের অংশ হিসাবেই হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ. আফগানিস্তানে স্বাধীন ভারতের সরকার গঠন করেছিলেন, যার রাষ্ট্রপতি ছিলেন রাজা মেহেন্দর প্রতাপ শিং, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাওলানা বরকতুল্লাহ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মাওলানা

উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ. নিজেই। ওই সময় সাধারণভাবে এই চিন্তা করা হয়েছিল যে, শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া ইংরেজদের ভারতছাড়া করা সম্ভব নয়। আর সেজন্য দরকার অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী। তাই অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী সরবরাহ করার জন্য নির্বাচন করা হয় আফগানিস্তান ও তুরস্ককে।

হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ রহ. বার্ধক্য ও দুর্বলতা নিয়ে আপন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে হিজায সফর করেন। সেখানকার তুর্কি গভর্নর গালিব পাশা ও তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতা-চুক্তি করেন। তখন 'জুনুদে রব্বানী' নামে একটি মুসলিম সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়, যার কেন্দ্র ছিল মদীনায়। কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন উসমানী খলীফা। কমান্ডার জেনারেল ছিলেন শায়খুল হিন্দ রহ. নিজে।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর প্ল্যান ছিল বাগদাদের পথ ধরে বেলুস্তান হয়ে সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীন গোত্রসমূহে পৌঁছা। কিন্তু এরইমধ্যে বেজে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা। আর তখনই মক্কার গভর্নর শরীফ হুসাইন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ইশারায় হযরতকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সাথে গ্রেফতার করা হয় মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., মাওলানা উযায়ের গুল রহ., হাকিম নুসরত হুসাইন রহ. ও মাওলানা ওয়াহেদ আহমদ ফয়েযাবাদী রহ.-কেও। গ্রেফতার করে প্রথমে তাদেরকে মিশরে, তারপর সেখান থেকে মাল্টা দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়, ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য যাকে মনে করা হতো সবচেয়ে সংরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ও তার সহকর্মীদের আন্দোলন ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলে ইংরেজ সরকার নিজেদের কাগজপত্রে সেটাকে ঝরষশ খবঃঃবৎ ঈড়হংঢ়রৎধপু ঈধংব বা 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র মামলা' বলে আখ্যায়িত করে। শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী এসব নথিপত্র আজও লন্ডন ইন্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর বন্দিজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে তিনি হিন্দুস্তানে আসার অনুমতি লাভ করেন এবং ২০ রমজান ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাই বন্দরে পা রাখেন। ভারতবাসী অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সাথে হযরতকে অভ্যর্থনা

জ্ঞাপন করে। অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মাওলানা শওকত আলী ও মুহিন দাস করমচাঁদ গান্ধীসহ ইলমী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। খেলাফত আন্দোলনের সাধারণ অধিবেশনে হযরতকে প্রশংসাপত্র দেয়া হয় এবং ওই অধিবেশনেই আকাবির উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে তাকে ভূষিত করা হয় 'শায়খুল হিন্দ' খেতাবে।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. মাল্টার বন্দিজীবন থেকে এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন যে, স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল এবং শারীরিক দুর্বলতা জেঁকে ধরেছিল। কারণ, একদিকে বার্ধক্য ও বয়োবৃদ্ধির শীর্ণতা যেমন ছিল, তেমনই অপরদিকে ছিল বন্দিজীবনের অসহ্য জুলুম-নির্যাতন। কিন্তু এতকিছুর পরও তিনি চরম আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন এবং পুরো ভারতবর্ষের সকল শহর প্রদক্ষিণ করার সংকল্প করেন। আলীগড় গমন করেন, জামিয়া মিল্লিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেন, বয়ান ও বক্তৃতা পেশ করেন এবং ফাতাওয়া প্রদান করেন ইংরেজদের সঙ্গে সবধরনের লেনদেন বর্জন করার বিষয়ে।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. যে অসামান্য কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন, হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক ও ইসলামী ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। এর কারণ হলো, তিনি এককভাবে এত বিরাট ও ব্যাপক কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন, যা বড় থেকে বড় কোনো প্রতিষ্ঠান সামাজিক শক্তি ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেই কেবল আঞ্জাম দিতে পারে। বলাবাহুল্য, এই অনন্যসাধারণ কীর্তি ও অবদান ছিল হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর দৃঢ় সংকল্প ও প্রবল হিম্মতেরই কারিশমা, যার সামনে মুসলিম হিন্দুস্তানের মস্তক সদা অবনমিত থাকবে এবং ভক্তিভরে তা স্মরণ করতে থাকবে।

পরকালযাত্রা

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. লাগাতার রিয়াযত-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, বন্দিত্ব ও বার্ধক্যের কারণে অবশেষে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন ১৮ রবিউল আউয়াল ১৩৩৯ হিজরী মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সকালবেলা। হযরতের মরদেহ দেওবন্দে আনা হয় এবং পরেরদিন হযরত নানুতবী রহ.-এর সন্নিকটেই দাফন করা হয়।

হযরত মাওলানা
শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ.

(জন্ম : ১২৭২ হি./১৮৫৫ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৩৭ হি./১৯১৯ খ্রি.)

হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. আকাবিরে দেওবন্দের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ১৩৩৩ হিজরীতে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. যখন হিজায গমন করেন, তখন তিনি দারুল উলূমের অভিভাবকরূপে বরিত হন এবং ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মর্যাদাপূর্ণ পদে বহাল থাকেন।

শুরুর জীবন

হযরত মাওলানা রায়পুরী রহ.-এর জন্ম ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে। তার মূল বাড়ি ছিল আম্বালা জেলার তাগরি গ্রামে। তবে পরবর্তী সময়ে সাহারানপুর জেলার রায়পুরের বাসিন্দা হন। হযরত ছিলেন বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আধার। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর হযরত হাজী সাহেবের আত্মগোপনে থাকার সময় যখন ইমামে রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. পাঞ্জালাসা গমন করেন, তখন তাগরিতে অবস্থান করেন এবং হযরত রায়পুরী রহ.-এর পিতা জনাব রাও আশরাফ আলী খান সাহেবের মেহমান হন। রায়পুরী রহ. তখন তিন বছরের ছোট্ট শিশু। গাঙ্গুহী রহ. তাকে স্নেহ-মমতা দিয়ে সিক্ত করেন এবং তাকে বিশেষ দুআ দান করেন। তখন থেকেই ইমামে রব্বানীর সঙ্গে হযরত রায়পুরী রহ.-এর সম্পর্ক-বন্ধন। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে পিতার জবানে হযরতের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা শুনতে থাকেন এবং হযরতের প্রতি মুহাব্বত ও ভক্তি-ভালোবাসা নিয়েই বেড়ে ওঠেন।

বাইয়াত ও ইজাযত

হযরত রায়পুরী রহ. শৈশবেই গাঙ্গুহে আসা-যাওয়া শুরু করেন এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর তরবিয়ত গ্রহণ করতে থাকেন। সাহারানপুরের ছাত্রজীবনে

তিনি হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহারানপুরী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন এবং পরে ইজাযতপ্রাপ্ত হন। তখনো ইমামে রব্বানী হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর খেদমতে সেই আগ্রহ ও আবেগ নিয়েই উপস্থিত হতেন, যা আগে-পরেও অক্ষুণ্ণ ছিল। অন্য জায়গায় মুরিদ হওয়ার পরেও হযরতের সঙ্গে আগে-পরে একইরকম মুরুব্বিসুলভ সান্নিধ্য-সম্পর্ক ছিল। শাহ আবদুর রহীম সাহারানপুরী রহ.-এর ইনতেকালের চার বছর পর হযরত গাঙ্গুহী রহ. তাকে বাইয়াত করেন এবং বাইয়াতের সাথে সাথে ইজাযতও দিয়ে ধন্য করেন।

গুণ ও বৈশিষ্ট্য

হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ-নির্ভরতার সঙ্গে জীবনযাপনে ঠিক যেন আপন শায়খ ও মুরশিদের প্রতিবিম্ব ও প্রতিকৃতি ছিলেন। নির্মোহতা, দুনিয়াবিরাগ ও পর-অমুখাপেক্ষিতায় ছিলেন একক দৃষ্টান্ত। বিনয়, বিনম্রতা ও আত্মবিলীনতায় ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। মেহমানদারি ও মেহমাননেওয়াযির কোনো সীমাপরিসীমা ছিল না তার। রাতদিন চলতে থাকত অকৃপণ উদারতার সাথে। তার দস্তরখানের ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা দেখে বিত্তশালীরা পর্যন্ত হতবাক হয়ে যেত। নিজের অবস্থা গোপন করতে এবং নির্জনতা অবলম্বন করতে তিনি পছন্দ করতেন। এজন্যই বসবাসের জন্য রায়পুরের পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি বাগানকে নির্বাচন করেছিলেন।

আসলে হযরত রায়পুরী রহ. ছিলেন গুণ, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মিলনমোহনা। 'তাযকিরাতুল খলীল' গ্রন্থে মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী রহ. প্রসঙ্গক্রমে ভক্তি-ভালোবাসা ও হৃদ্যতা থেকে হযরতের গুণকীর্তন করেছেন। এতে তিনি বলেন :

> হযরত রহ. বর্তমান শতাব্দীর সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যিনি বিগত শতাব্দীগুলোর বিখ্যাত বুযুর্গানে দ্বীনের নমুনা হয়ে দুনিয়াতে পদার্পণ করেছিলেন। আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের মূর্তপ্রতীক। তাওহীদ ও একত্ববাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত। সমর্পণ, অল্পেতুষ্টি, আস্থা ও আল্লাহ-নির্ভরতায় উৎসর্গিত। শরীয়তের বিদগ্ধ আলেম ছিলেন, কিন্তু তরীকতের ছায়া ও ছাপ ছিল তার মাঝে এতটাই প্রগাঢ় যে, তাকে যে-ই দেখত, সাধারণ মানুষ বলেই মনে করত। একাগ্রতা ও নির্জনতা

হযরতের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। মাহবুবিয়াত ও জনপ্রিয়তা তাকে শীর্ষস্থানে পৌছে দিয়েছিল। সুন্নতে নববীর ছিলেন তিনি সত্যিকারের আশেক। স্থানে স্থানে কুরআনী মক্তব কায়েমে ছিলেন বিপুল আগ্রহী। বাচ্চাদের সহীহ-শুদ্ধ ও সহজ-সরল ভঙ্গিতে যখন কুরআন পড়তে দেখতেন, খুবই আনন্দিত হতেন, খুবই পুলকিত হতেন। নিজ বাগানের মধ্যেও তিনি একটি মক্তব ও মাদরাসা কায়েম করেছিলেন, যা ছিল তাওয়াক্কুল ও ভরসার জীবন্ত নমুনা। এটিই নায়েবে নবী, শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বয়কারী হযরত রহ.-এর খানকাহ ছিল।

মোটকথা তিনি ছিলেন সবর ও শোকর, অল্পেতুষ্টি ও ইখলাস, ইলম ও ইয়াকীন, সমর্পণ ও নিবেদন, তাওয়াক্কুল ও ভরসা এবং মান্যতা ও সন্তুষ্টির স্ব-মূর্ত প্রতিচ্ছবি। সবসময় তিনি চিন্তামগ্ন ও নিশ্চুপ থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথাই যেন বলতে জানতেন না। কিন্তু যখনই আমর বিল মারুফ তথা সৎ ও সঠিক কথা বলার উপলক্ষ তৈরি হতো, আলেমসুলভ এমন বক্তৃতা পেশ করতেন যে, শ্রোতাদের অন্তরে তা গভীর রেখাপাত করত এবং পাষাণ হৃদয়কে পর্যন্ত মোমের মতো গলিয়ে দিত।

কুরআনের তালিম দেয়ার প্রতি হযরত রহ.-এর যেমন অনুরাগ-আকর্ষণ ছিল, তেমনই অনুরাগ-আকর্ষণ ছিল কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিও। রাতের প্রায় পুরো সময়ই তিনি কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। রাতদিনের মধ্যে সাধারণত এক ঘণ্টার মতো ঘুমাতেন। কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে, এজন্য লোকজনের সঙ্গে বেশি সাক্ষাৎ করাও পছন্দ করতেন না। আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টুকু তার উন্মুক্ত মজলিস ও পারস্পরিক দেখাসাক্ষাতের জন্য। এর বাইরে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কারও সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতেন না, বরং পুরো সময় নির্জনে, নিবিড়চিত্তে জানালা-দরজা বন্ধ করে মাওলার সঙ্গে রহস্যালাপে নিমগ্ন থাকতেন।

হযরতের খাদ্যাভ্যাস ছিল একেবারেই সামান্য। রমযান মাসে সেই সামান্য খাবারের পরিমাণও এত কমিয়ে দিতেন এবং এই পরিমাণ মেহনত-মোজাহাদা করতেন যে, যে-ই দেখত তার মাঝে করুণার উদ্রেক হতো। ইফতার ও সাহরির দুই সময়ে তার খাবার ছিল সর্বসাকুল্যে দুই কাপ চা

এবং এক-আধটি পাতলা রুটি। শুরুর জীবনে হযরত নিজেই তারাবিতে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং দুই-আড়াইটা বাজে শেষ করতেন। কিন্তু শেষের দিকে এসে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে গেলে তিনি তারাবিতে শ্রোতা হিসাবে দাঁড়াতেন এবং নিজ তেলাওয়াত বাদে তিন-চার খতম কুরআন শ্রবণ করতেন। যেহেতু রমযান মাসে রায়পুরী রহ.-এর রাতদিনের ব্যস্ততা ছিল কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত, তাই পুরো মাস মেহমানদের আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিতেন এবং পত্রবিনিময় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতেন। ঈদের আগে কারও কোনো চিঠিই পড়তেন না।

দারুল উলূমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ

হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. ছিলেন দেওবন্দী জামাতের সর্বজনস্বীকৃত বুযুর্গ। ১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের শুরা-সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর হিজায সফরের পর দারুল উলূমের অভিভাবক মনোনীত হন। ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত মর্যাদাপূর্ণ পদে বহাল থাকেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের পাশাপাশি মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরেরও অভিভাবক ছিলেন তিনি। তার প্রতি হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-এর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা এককথায় ছিল অতুলনীয়। হযরত সাহারানপুরী রহ. যখন হিজায সফরে যেতেন, তখন স্বীয় ভক্ত-অনুরক্তদের এই উপদেশ দিতেন যে, তোমরা নিয়মিত রায়পুর যাওয়া-আসা অব্যাহত রাখবে এবং যেকোনো বিষয়ের পরামর্শের জন্য বা জানাশোনার জন্য মাওলানা রায়পুরীর শরণাপন্ন হবে।

আখেরাতের সফর

জীবনের বেলাভূমিতে এসে হযরত রায়পুরী রহ. হারামাইনের জিয়ারতের জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব ও উতলা হয়ে পড়েন। যদিও ইতিপূর্বে বেশ কবার হজে বাইতুল্লাহ ও জিয়ারতে মদীনা দ্বারা ধন্য হয়েছেন, কিন্তু এবার আবেগ-অনুরাগের অবস্থা ছিল অন্যরকম। হযরত মৃত্যুর আগে নিজের মালিকানাধীন সকল আসবাবপত্র দান করে দিয়েছিলেন, এমনকি হেবা ও

ওসিয়তের মাধ্যমে পরনের কাপড়চোপড়ে পর্যন্ত অন্যদের মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নগদ তেরোশো রুপি পথখরচা হিসাবে মাওলানা আবদুল কাদির রহ.-কে এই বলে অর্পণ করেছিলেন যে, এগুলো হেফাজত করে রাখো। তা আমার ও আপনার হজের সফরের খরচ। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, হজের মওসুম যতই সমাসন্ন হয়, হযরতের অসুস্থতা ও দুর্বলতা ততই বাড়তে থাকে, এমনকি মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে।

হযরত আঁচ করতে পারলেন, যিন্দেগীর ফুরসত বুঝি এখানেই শেষ, রুপিগুলো মনে হয় মিরাস হিসাবেই রয়ে যাবে। তখন আবদুল কাদির রহ.-কে ডেকে সেগুলোও বণ্টন করে দিলেন। কেননা তার একান্ত ইচ্ছা ও অভিলাষ ছিল, মাওলায়ে কারীমের সঙ্গে তিনি এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন যে, দুনিয়ার একটা দানা কিংবা একখণ্ড কাপড়েরও মালিকানা থাকবে না তার। তারপর 'বাইত' তথা গৃহের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে 'রাব্বুল বাইত' তথা গৃহের মালিকের চিন্তায় আত্মনিমগ্ন হয়ে গেলেন। পরিশেষে কয়েকদিন পর সেই মহিমান্বিত সময় সমুপস্থিত হলো, যার আকাঙ্ক্ষায় শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ডেকে ডেকে বলছিল :

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم * راحت جاں طلبم وز پے جاناں بروم

نذر کردم کہ گر ازایں غم درآیم روزے * تادر میکدہ شادمان وغزل خواں بروم

কত না মধুর সেদিন যখন রওনা হব এ বিরানভূমি ছেড়ে
আর মনের প্রশান্তি খুঁজে পাব গিয়ে প্রিয়তমের দুয়ারে।
করেছি মান্নত, যদি কোনোদিন ঘটে এ কষ্টের ইতি,
সুরের তালে, মনের সুখে উপস্থিত হব আসরে, করব মৌজ-মাস্তি।

২৫ রবিউস সানী ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ২৭ জানুয়ারি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে রোজ সোমবার রাত্রিবেলায় নিজ এলাকা রায়পুরে ইনতেকাল করলেন। যে বাগানে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন, সেখানেই মসজিদের দক্ষিণ দিকে তিনি সমাহিত হলেন।

একনজরে দ্বিতীয় যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ

ক্র.	নাম	মৃত্যুসন	পদ
১	হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ.	১৩৪৭ হি./ ১৯২৮ খ্রি.	মুহতামিম
২	হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.	১৩৪৮ হি./ ১৯২৯ খ্রি.	মুহতামিম
৩	হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.	১৩৬২ হি./ ১৯৪৩ খ্রি.	অভিভাবক
৪	হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.	১৩৫২ হি./ ১৯৩৩ খ্রি.	সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীস
৫	হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.	১৩৭৭ হি./ ১৯৫৭ খ্রি.	সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীস
৬	হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.	১৩৬৯ হি./ ১৯৪৯ খ্রি.	সদর মুহতামিম
৭	হযরত মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান দেওবন্দী রহ.	১৩৪৭ হি./ ১৯২৮ খ্রি.	প্রধান মুফতী
৮	হযরত মাওলানা ইজায আলী আমরুহী রহ.	১৩৭৪ হি./ ১৯৫৫ খ্রি.	প্রধান মুফতী
৯	হযরত মাওলানা মুফতী শফী দেওবন্দী রহ.	১৩৯৬ হি./ ১৯৭৬ খ্রি.	প্রধান মুফতী

হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ.

(জন্ম : ১২৭৯ হি./১৮৬২ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৪৭ হি./১৯২৮ খ্রি.)

হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ. হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর সুযোগ্য সন্তান এবং হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কারী তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর সম্মানিত পিতা। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের পঞ্চম মুহতামিম, যিনি লাগাতার ৩৪ বছর ইহতেমামের দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ রহ.-এর ইহতেমামের সময়কাল ছিল দারুল উলূমের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উন্নতি, অগ্রগতি ও সুসংহতির অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রতিষ্ঠানটি এ সময় মাদরাসার স্তর থেকে উন্নীত হয় দারুল উলূমের স্তরে। বস্তুত হযরতের ইহতেমামের জামানা ছিল দারুল উলূম দেওবন্দের সোনালি যুগ, যখন হযরত গাঙ্গুহী রহ. ছিলেন দারুল উলূমের অভিভাবকপুরুষ এবং শায়খুল হিন্দ রহ. ছিলেন শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ. ১২৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে নানুতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কুরআন মাজীদের হিফয সম্পন্ন করেন। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন হযরত নানুতবী রহ. প্রতিষ্ঠিত গিলাওটি মাদরাসায়, যা উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় অবস্থিত। এখানে শিক্ষক হিসাবে ছিলেন হযরত নানুতবী রহ.-এর বড় জামাই হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ আম্বিঠবী রহ.। এরপর পরবর্তী স্তরের শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে গমন করেন মাদরাসা শাহী মুরাদাবাদে, যেখানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে ছিলেন হযরত নানুতবী রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্র

ও বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী রহ.। এখানে বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন শাস্ত্রের কিতাবাদি পড়ার পর গমন করেন দারুল উলূম দেওবন্দ। এখানে হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ. ও শায়খুল হিন্দ রহ.-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর সর্বশেষ হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর দাওরা হাদীসের সবকে বসেন এবং হাদীসের সনদ হাসিল করে ধন্য হন।

১২৯৭ হিজরীতে হযরত নানুতবী রহ.-এর ইনতেকালের পর হযরতেরই প্রতিষ্ঠিত থানাভবনের একটি মাদরাসায় গমন করেন হযরত হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ.। সেখানে কয়েক বছর পর্যন্ত শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৩০৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন। এখানে প্রায় সকল বিষয়েরই কিতাবাদি পড়ানোর সুযোগ লাভ করেন। হযরতের *মিশকাত শরীফ*, *মুখতাসারুল মাআনী*, *জালালাইন শরীফ* ও *মির যাহেদ* ইত্যাদির দরস ছিল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। যার ফলে ছাত্ররা দলে দলে উপস্থিত হতো তার দরসে।

দারুল উলূমে ইহতেমামের মসনদে

১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত হাজী আবেদ হুসাইন রহ.-এর ইনতেকালের পর দারুল উলূমে মুহতামিমের পদে আসীন হন পরপর দুজন ব্যক্তি, হাজী ফযলে হক দেওবন্দী রহ. ও মাওলানা মুনির নানূতবী রহ.। কিন্তু এক-দেড় বছরের বেশি তারা দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এভাবে বছরে বছরে রদবদল হওয়ার ফলে দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা দেখা দেয়। তাই ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে হযরত গাঙ্গুহী রহ. মুহতামিম হিসাবে নির্বাচন করেন হযরত হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-কে। হাফেজ আহমদ সাহেব রহ. ছিলেন খুবই নিয়মানুবর্তী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ফলে খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দারুল উলূমের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। দায়িত্ব অর্পণের সময় তার থেকে যেসব আশা করা হয়েছিল, কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তিনি নিজেকে তার উপযুক্ত প্রমাণ করেন।

হযরত হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর সময় থেকেই দারুল উলূমের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়, যাকে উন্নতি-অগ্রগতি ও সুসংহতির যুগ বলাই অধিক সংগত। মুহতামিম থাকাকালে তিনি দারুল উলূমের অস্বাভাবিক উন্নতি

সাধন করেন। যখন ইহতেমামের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন দারুল উলূমের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র পাঁচ-ছয় হাজার রুপি। কিন্তু তার আমলে এ আয় পৌঁছে যায় নব্বইয়ের ঘরে। ওই সময় পর্যন্ত দারুল উলূমের কুতুবখানায় কিতাব ছিল পাঁচ হাজারের মতো, কিন্তু তার সময়ে কিতাবের সংখ্যা পৌঁছে চল্লিশ হাজারের কোঠায়। ১৩১৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দারুল উলূমের বিল্ডিংয়ের নির্মাণব্যয় ছিল ছত্রিশ হাজার রুপি, কিন্তু তার যুগে এ ব্যয় পৌঁছে চার লাখে গিয়ে।

দারুল উলূমের উন্নয়নকল্পে হাফেজ আহমদ সাহেব রহ. দেশের বিভিন্ন শহর সফর করেন এবং দারুল উলূমের জন্য স্থায়ী চাঁদার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শহর, বিশেষত ভুপাল, ভাওলপুর ও হায়দারাবাদের যে সফর তিনি আঞ্জাম দিয়েছিলেন, দারুল উলূমের ইতিহাসে তা চির-অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আগে হায়দারাবাদ থেকে দারুল উলূমের মাসিক একশো রুপির সহায়তা আসত। কিন্তু আহমদ সাহেব রহ. হায়দারাবাদ সফর করে মাসিক আড়াইশো রুপি সহায়তা নির্ধারণ করেন। তারপর দ্বিতীয় সফরে পাঁচশো রুপি এবং তৃতীয় সফরে এক হাজার রুপি নির্ধারণ করেন, যা হায়দারাবাদের পতনের আগ পর্যন্ত চালু ছিল। এসব হয়েছিল হযরতের শানশওকতের বদৌলতে।

মোটকথা, হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর আমলে দারুল উলূম দেওবন্দ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই যে ব্যাপক-বিস্তৃত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করেছিল, ইতিপূর্বে তা সম্ভব হয়নি। আগে শ্রেণিবিন্যাস ও দফতরের পরিচ্ছন্ন ও নিয়মতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না। যদিও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে দারুল উলূম 'দারুল উলূম'-এর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু ভবন-স্থাপনা ও বাহ্যিক আকার-অবয়বের দিক থেকে মাদরাসা থেকে দারুল উলূমের রূপ পরিগ্রহ করেছিল তারই সময়ে। শ্রেণিবিন্যাস ও দফতরের নিয়ম চালু হয়েছিল এবং দারুল উলূমের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও বিস্তৃত হয়েছিল। এককথায় দারুল উলূম প্রতিনিয়তই শক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির পথে ছিল প্রাগ্রসরমান। এজন্যই দারুল উলূমের ইতিহাসে তার ইহতেমামের আমলকে মনে করা হয় দারুল উলূমের উন্নতি-অগ্রগতির স্বর্ণোজ্জ্বল সময়। হযরতের বিচক্ষণ উপদেষ্টা ও নায়েব ছিলেন হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ., যিনি সর্বজনমান্য মুদাব্বির, আল্লাহওয়ালা আলেম ও

দূরদর্শী বুযুর্গ ছিলেন।

হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর সময়েই 'দারুল হাদীস'-এর মতো শানদার ইমারতের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়। হযরতের পক্ষ থেকে যখন এই ভবনের প্রস্তাবনার কথা প্রচার করা হয়, তখন যেন বৃষ্টির মতো চাঁদা আসতে থাকে। তারপর আবার ছাত্রসংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, স্থানসংকুলান না হওয়ায় 'দারে জাদীদ' নামে আরেকটি বিরাট আবাসিক ভবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কিন্তু ভবনদুটির কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি তার আমলে।

হযরতের ইহতেমামের জামানায় ১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে দস্তারবন্দির সেই আযিমুশ শান জলসা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল এবং হাজারেরও অধিক শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রকে পাগড়ি প্রদান করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে হযরত মাওলানা আহমদ সাহেব রহ.-কে 'শামসুল উলামা' খেতাব প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দারুল উলূমের স্বাধীনতাপ্রিয় আদর্শের ভিত্তিতে পদবিধারী হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। এজন্য তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং নির্মোহ ও নিঃসংকোচ চিত্তে ফিরিয়ে দেন সরকারপ্রদত্ত রাজকীয় পদবি।

তারই আমলে মুত্তাহিদাহ প্রদেশের গভর্নর দুই-দুইবার দারুল উলূমে আসেন। দারুল হাদীসের প্রস্তাবিত জায়গায় শহরের পানি গড়ানো ড্রেন ছিল, যার ফলে দারুল হাদীসের ভবন তোলাতে যেমন সমস্যা হচ্ছিল, তেমনই ড্রেনটি কাছাকাছি থাকায় দারুল উলূমের পরিবেশও হচ্ছিল অপরিচ্ছন্ন। দারুল উলূমের আকাবির যারা ছিলেন, তাদের অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টাসত্ত্বেও স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ ড্রেনটি সরাতে কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলেন না। হাফেজ আহমদ রহ. গভর্নরকে দাওয়াত করে এই সমস্যার সমাধান করেন। ফলে প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের নির্দেশে সম্পূর্ণ সরকারি খরচেই ড্রেন সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। এটিই ছিল হযরতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে, দারুল উলূমের কঠিন থেকে কঠিন, জটিল থেকে জটিল সমস্যারও সহজ সমাধান করে দিতেন খুব সহজভাবে।

বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ. তালিবে ইলমদের ছোট ছোট বিষয়েও গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং প্রয়োজনে ধরপাকড়ও করতেন। সেইসাথে অপরিসীম স্নেহ-মমতারও প্রকাশ ঘটাতেন। ছাত্রদের সাধারণ সাধারণ বিষয়কেও অভিভাবক ও মুরুব্বি হিসাবে দেখতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। ছাত্র-শিক্ষক সকলের ওপর হযরতের ভাবগাম্ভীর্য ছিল প্রবাদতুল্য। তার দস্তরখান ছিল খুবই প্রশস্ত। দারুল উলূমে যত মেহমান আসতেন, হযরত নিজস্ব তহবিল থেকেই তাদের মেহমানদারি করতেন দিল খুলে, হাত খুলে।

তিনি শুরু থেকে দরস-তাদরিসের যে কর্মব্যস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, মুহতামিম হওয়ার পরেও তা অব্যাহত ছিল; কখনো বন্ধ হয়নি। *জালালাইন শরীফ*, *সহীহ মুসলিম*, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, *মুখতাসারুল মাআনী*, *মির যাহেব* প্রভৃতি কিতাব অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়াতেন। পিতা হযরত নানুতবী রহ.-এর জ্ঞান ও লেখা সম্পর্কে ছিল গভীর দৃষ্টি ও পর্যাপ্ত জানাশোনা।

হযরত হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ রহ. ছিলেন খুবই প্রভাবশালী ও মান্যবর ব্যক্তিত্ব। দারুল উলূমের আঙিনায় প্রবেশমাত্রই একধরনের নিস্তব্ধতা বিরাজ করত ছাত্র-শিক্ষক সকলের মাঝে। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. নিজে মুদাররিস ও শায়খুল হাদীস হওয়া সত্ত্বেও হযরত নানুতবী রহ.-এর সন্তান হওয়ার সুবাদে তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তার সঙ্গে বিনয়াবনত ও আনুগত্যপূর্ণ আচরণ করতেন। হযরত সাধারণত দৃষ্টি নত রেখে চলাফেরা করতেন। চলনভঙ্গি ছিল গম্ভীর ও ভারিক্কি। কেউ তার কাছে গেলে অদৃশ্য এক প্রভাব ও প্রতাপ অনুভব করত। স্পষ্ট ভাষণ ও ভেতর-বাহির সমান হওয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন তিনি অনন্য ও অসাধারণ। প্রত্যেকের সাথেই মন খুলে নিঃসংকোচে কথা বলতেন। অনেক কঠিন ও জটিল বিষয়েরও সহজ সমাধান হয়ে যেত তার সাহসী ভূমিকা এবং আল্লাহপ্রদত্ত গাম্ভীর্য ও আভিজাত্যের কল্যাণে।

ইনতেকাল

হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ রহ.-কে দাকান প্রদেশের নিযাম হায়দারাবাদ প্রদেশের 'মুফতীয়ে আযম' পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আসিফিয়া

সরকারের দেয়া এই বিরাট ধর্মীয় পদে তিনি ১৩৪১ হিজরী মোতাবেক ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। হায়দারাবাদের নিযামকে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে আমন্ত্রণ করেছিলেন, যা গৃহীত হয়েছিল। প্রোগ্রাম এভাবে সাজানো হয়েছিল যে, নিযাম যখন দিল্লি আসবেন তখন দেওবন্দও জিয়ারত করে যাবেন। ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে নিযামের দিল্লি আসার কথা ছিল। ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দিতে আহমদ সাহেব রহ. হায়দারাবাদ গমন করেন। এ সময় খুবই অসুস্থ ছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও উপর্যুপরি রোগের প্রকোপ তাকে একেবারে কাহিল করে দিয়েছিল। এরপরও স্বাস্থ্যের চিন্তা না করে দারুল উলূমের কল্যাণচিন্তায় তিনি হায়দারাবাদ গমন করেছিলেন।

হায়দারাবাদ পৌঁছার পর স্বাস্থ্যের আরও বেশি অবনতি ঘটে। প্রথম পর্যায়ে অপেক্ষা করা হয়, স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হলে নিযামের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু দিনদিন যখন অসুস্থতা বেড়েই চলল, তখন ভক্ত-অনুরক্ত ও সফরসঙ্গীদের সিদ্ধান্ত স্থির হলো হযরতকে দেওবন্দ নিয়ে যাওয়ার। সে মতে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি হায়দারাবাদ থেকে রওনা হয়ে যান। কিন্তু হায়দারাবাদের সীমানাও পার হননি, নিযামাবাদ স্টেশনে পৌঁছেই ইনতেকাল করেন। তখন জবান মুবারকে জারি ছিল আল্লাহর যিকির। হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ রহ.-এর মৃত্যুর এ ঘটনা ঘটে ৩ জমাদিউল উলা ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে।

নিযামাবাদ স্টেশনে হযরতের মরদেহ নামানো হয় এবং ভক্ত-অনুরক্তদের ও দাকানের নিযামকে তারবার্তার মাধ্যমে মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়। তখন নিযামের পক্ষ থেকে বলা হয় মরদেহ হায়দারাবাদে নিয়ে যাওয়ার কথা। নিযামাবাদ ও হায়দারাবাদে বেশ কয়েকবার হযরতের জানাযা পড়া হয়। পরেরদিন ৪ জমাদিউল উলা 'খিত্তায়ে সালেহীন' নামক বিশেষ কবরস্তানে রাষ্ট্রীয় খরচে দাফন করা হয়। দাকানের নিযাম শোক প্রকাশ করেন এবং আক্ষেপের সুরে আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, 'হায়, আফসোস! তিনি আমাকে নিতে এসেছিলেন, কিন্তু নিজেই এখানে রয়ে গেলেন।'

হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ. দারুল উলূম দেওবন্দে ৪৫ বছর খেদমত করেছেন। প্রথম দশ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন শিক্ষক হিসাবে, আর বাকি পঁয়ত্রিশ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন মুহতামিম হিসাবে।

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.

(মৃত্যু : ১৩৪৮ হি. মোতাবেক ১৯৩৯ খ্রি.)

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ. হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান রহ.-এর সুযোগ্য সন্তান এবং হযরত মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী রহ. ও হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.-এর সহোদর ভাই। আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.-কে দ্বীনের বিশেষ সমঝ ও উপলব্ধি দান করেছিলেন। তার বুদ্ধিমত্তা ও পরিচালনা-কুশলতা ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি ভাষা ও সাহিত্যের যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই আরবি গদ্য ও পদ্যের ক্ষেত্রেও ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি। দারুল উলূমের ইতিহাসে তার দূরদর্শিতা ও পরিচালনা-দক্ষতাকে মনে করা হয় প্রবাদতুল্য। বস্তুত দারুল উলূমের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার কর্মতৎপরতা ও আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার ভূমিকা ছিল অনন্য ও অসামান্য।

প্রাথমিক অবস্থা ও দারুল উলূমের সাথে সম্পৃক্ততা

হযরত উসমানী রহ.-এর জন্মতারিখ সংরক্ষিত নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দারুল উলূমেই পড়েছেন। ১৩০০ হিজরীতে ফারেগ হন এবং ওই বছরেই দারুল উলূমের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন। তিনি হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর মুরিদ ছিলেন। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মামুলাত পালন করতেন।

১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর কর্মব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং দারুল উলূমের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এমন একজন যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়, যিনি প্রশাসনের কাজে ও উন্নয়নপ্রকল্পে হযরত হাফেজ সাহেব রহ.-এর সহকর্মী ও সহযোগী হতে পারেন। আর এজন্য হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ. থেকে অধিক উপযুক্ত আর কেউ ছিলেন না। তাই অস্বীকৃতি ও ওজর-আপত্তি জানানোর পরও একরকম বাধ্য করেই

তাকে নায়েবে মুহতামিমের পদে আসীন করা হয়। হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.-এর ন্যায় আন্তরিক ও বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনাবান্ধব ব্যক্তিত্ব মিলে যাওয়া ছিল সত্যিই দারুল উলূমের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আপন দায়িত্বের প্রতি তিনি এতটাই একাগ্র ও ঐকান্তিক ছিলেন যে, রাতদিনের সিংহভাগ সময় তাতেই ব্যয় করতেন।

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ. প্রশাসন বিভাগকে খুবই সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও নিখুঁতভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তাই তো আসিফিয়্যাহ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যখন নওয়াব সদর ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর দারুল উলূমের এডিটিং করতে আসেন, তখন এটা দেখে যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত হন যে, এক-এক, দুই-দুই আনার কাগজপত্র ও রসিদও ফাইলে সংরক্ষিত আছে। নওয়াব সদর ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর সাহেবের স্বীকারোক্তি হচ্ছে, 'মাওলানা সাহেবের কাছে যে কাগজই তলব করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিয়েছেন; কোনোরকম ব্যত্যয় ও ব্যতিক্রম ঘটেনি।'

বস্তুতপক্ষে হযরত হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর আমলে যত উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে, তা মনে করা হয় হযরত হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.-এর সঙ্গ ও সহযোগিতারই সুফল। তিনি সবসময়ই মুহতামিম সাহেবের সহকারী, আস্থাশীল ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

১৩৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বয়োবৃদ্ধির কারণে হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ. যখন হায়দারাবাদের 'মুফতীয়ে আযম' পদ থেকে অব্যাহতি নেন, তখন উক্ত পদ অলংকৃত করেন মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.। কিন্তু দারুল উলূমের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দেখা দিলে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই তিনি সেখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন। একইভাবে মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী রহ., মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. ও অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরামের পাশাপাশি ছাত্রদের বড় একটি জামাত নিয়ে হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. যখন দারুল উলূম থেকে পৃথক হয়ে যান, যা ছিল খুবই নাযুক ও সঙ্গিন মুহূর্ত, তখনো তিনি হিম্মত, মনোবল, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এবং দারুল উলূমের টলটলায়মান কিশতিকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। সত্যিই আল্লাহ তাআলা হযরতকে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন। তাই তো দেখা যায়, দারুল

উলূমের ওপর কঠিন থেকে কঠিনতর সময় এসেছে, ঘোর থেকে ঘোরতর আক্রমণ এসেছে, কিন্তু কখনো তিনি বিচলিত হননি। সঙ্গিন থেকে সঙ্গিন পরিস্থিতিতেও কোনো ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়নি তার আস্থা, আত্মনির্ভরতা ও নিরুদ্বিগ্নচিত্ততায়।

সর্ববিবেচনায় অনন্য ব্যক্তিত্ব

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ., যার ব্যক্তিসত্তা ছিল সর্ববিবেচনায় যুগের অনন্য ও অসাধারণ, তার বিষয়ে মনে করা হয়, দেশের রাজনীতির প্রতি যদি তার এই পরিমাণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকত, যে পরিমাণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল দারুল উলূমের প্রতি, তাহলে সন্দেহ নেই, ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি আবির্ভূত হতেন একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নির্দেশনা ছিল, জমিয়তে উলামার দুজন সদস্যকে যেন কখনো হাতছাড়া করা না হয়। সেই দুজন সদস্যের অন্যতম ছিলেন মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.। পরবর্তী সময়ে জমিয়তে উলামার শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসাবেও প্রমাণ করেছেন নিজেকে। ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের গায়া নামক স্থানে জমিয়তে উলামার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে উসমানী রহ. সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতিত্বের ভাষণে তিনি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরেন, যা কেবল জনসাধারণকেই আপ্লুত করেনি, রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় সে বক্তব্য রাজনৈতিক মহলেও লাভ করেছিল ব্যাপক প্রশংসা ও সুখ্যাতি।

অন্যান্য বহু গুণের পাশাপাশি হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.-এর অন্যতম বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি ছিলেন খুবই অধ্যয়নপ্রিয়। অধিক অধ্যয়নের ফলে তার জ্ঞান ও জানাশোনার পরিধি ছিল ব্যাপক-বিস্তৃত। হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. বলতেন, 'আমার ওপর যদি কারও ইলমের প্রভাব পড়ে থাকে, তাহলে তিনি হলেন একক ব্যক্তিত্ব মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.।'

গ্রন্থনা ও রচনা

আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি ছিল হযরতের বিশেষ রুচি ও প্রবণতা। এসব বিষয়ে তার পারদর্শিতা ও জ্ঞানের গভীরতাও ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ রচনা রেখে গেছেন তা নিম্নরূপ :

- قصيدة لامية المعجزات (কসিদাতু লামিয়াতুল মুজিযাত)। কিতাবটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণকীর্তনে রচিত প্রায় তিনশোটি আরবি কবিতা রয়েছে। যার মধ্যে নবীজীর একশোটি মুজিযা বর্ণনা করা হয়েছে মন ছুঁয়ে যাওয়া সাহিত্যধর্মী ও আবেগময় ভাষায়।
- اشاعت اسلام (ইশায়াতে ইসলাম)। পৃথিবীর বুকে ইসলাম কীভাবে ছড়িয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে পাঁচশো পৃষ্ঠার এই কিতাবে ঐতিহাসিক সেসব ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, যা নিজস্ব গুণে ও আকর্ষণে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রেখেছে। সাধারণ-বিশিষ্ট সর্বমহলে সাড়া জাগানো তুমুল আলোচিত এই কিতাবটি প্রথমে মাসিক 'আল-কাসিম'-এ কিস্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তা গ্রন্থরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।
- تعلیمات اسلام (তালিমাতে ইসলাম)। এই কিতাবে ইসলামের শাসনপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে এটাও তুলে ধরা হয়েছে যে, আমিরে জামাআত বা দলপ্রধানের জন্য পারস্পরিক পরামর্শ কতটা জরুরি। সেইসাথে এটাও আলোচিত হয়েছে যে, দলপ্রধান যদি আপন ব্যক্তিসত্তার ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হয়, তাহলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি এমন না হয় তাহলে কার্যপরিচালনার জন্য এর বিকল্প নেই যে, অধিকাংশের মতামতই গ্রহণ করতে হবে।
- *মাকামাতে হারীরির* হাশিয়া। এটি হললে লুগাত বা শাব্দিক বিশ্লেষণসহ প্রথমে দিল্লি মুজতবায়ী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
- *তাফসীরে জালালাইনের* হাশিয়া।
- رحمة للعالمين (রহমাতুল লিল আলামিন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীর ওপর এটি অনবদ্য এক সংকলন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, কিতাবটির রচনা পূর্ণ করে যেতে পারেননি লেখক। তবে

যতটুকু লিখেছেন সেটাও নবীজীর সীরাতের ওপর লিখিত রচনাবলির তালিকায় নিঃসন্দেহে বিরাট এক সংযোজন।

- القاسم (আল-কাসিম) ম্যাগাজিন। হযরত হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.-এর প্রচেষ্টার ফসলরূপেই দারুল উলূমে সাংবাদিকতার সূচনা হয়। উলামায়ে দেওবন্দের ইলম ও মারেফত, সহীহ আকীদা-বিশ্বাস ও মাসআলা-মাসায়েল মুসলিম জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৩২৮ হিজরীতে তিনি 'আল-কাসিম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা চালু করেন। পরে অবশ্য পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে দারুল উলূম।

মৃত্যুবরণ

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ. খুবই জীর্ণশীর্ণ ও ক্ষীণকায় ছিলেন। খাদ্যাভ্যাস ছিল একেবারেই সামান্য। কিন্তু শত দুর্বলতা ও জীর্ণশীর্ণতার মধ্যেও তিনি ছিলেন বুলন্দ হিম্মত ও উচ্চ মনোবলের পাহাড়। হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর মৃত্যুর ঠিক চৌদ্দ মাস পর ৩ রজব ১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন এবং দারুল উলূমকে তার চির-স্মৃতিকারী হিসাবে রেখে যান।

হযরত মাওলানার ইনতেকালের পর আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ. *মাআরিফ* পত্রিকায় শোকবার্তায় বলেন :

> এই মাসের সবচেয়ে ইলমী ও তালিমী দুঃসংবাদ হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানীর মৃত্যুবরণ। দেওবন্দের মাদরাসা যদি আমাদের পুরাতন মাদরাসাসমূহের প্রাণ হয়ে থাকে, তাহলে সন্দেহ নেই, দেওবন্দ মাদরাসার প্রাণ ছিলেন হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ.। মরহুম এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন। সুবিজ্ঞ আলেম ও আরবি সাহিত্যিক ছিলেন। অন্যান্য ইলমের পাশাপাশি আরবি গদ্য ও পদ্যেও তার সমান পাণ্ডিত্য ছিল। ইসলামী ইতিহাসের প্রতিও ছিল পূর্ণ রুচিবোধ। উর্দু প্রবন্ধ-নিবন্ধেও ছিল তার নিজস্ব রচনাশৈলী ও বর্ণনারীতি।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

(জন্ম : ১২৮০ হি./১৮৬৩ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খ্রি.)

তিনি একাধারে আলেমে রব্বানী, সুমহান লেখক, যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন এবং পুরো বিশ্বে সকল মহলে 'হাকীমুল উম্মত' নামে বিখ্যাত ছিলেন। দ্বীনের সকল অঙ্গনে এবং সকল বিষয়ে অমূল্য রচনাসম্পদ রেখে গেছেন তিনি। যার ফলে তাকে গণ্য করা হয় ইসলামী শরীয়তের সুবিজ্ঞ আলেম ও মুসলিম ইতিহাসের বহু-গ্রন্থপ্রণেতা লেখকদের অন্যতম। দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের মধ্যে রচনা ও গ্রন্থনায় যেমন তিনি সকলের শীর্ষে ছিলেন, তেমনই সুলুক ও তরীকতের ময়দানেও ছিলেন শীর্ষ অবস্থানে।

বস্তুত থানভী রহ.-এর ব্যক্তিসত্তা ছিল ইলমে যাহের ও বাতেনের ভান্ডার, তার রচনাসমগ্র ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার এবং বয়ান ও বক্তৃতা ছিল ভাব ও প্রভাবের আকর। নিজে নির্জনতাপ্রিয় দরবেশ ছিলেন, কিন্তু তার ধ্যানালয় ছিল ধনী ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের ভরসাস্থল এবং তার খানকাহ ছিল ইলম, মারেফত ও রুহানিয়্যাতের স্বচ্ছ নির্ঝর, হাজার হাজার পিপাসার্ত মানুষ এসে যেখান থেকে মনের তৃষ্ণা নিবারণ করত এবং তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হতো।

হযরত থানভী রহ.-এর জীবন ছিল নববী সুন্নাহ ও আদর্শের জীবন্ত নমুনা এবং কথা ও কালাম ছিল মারেফতের গুপ্তরহস্যের অমূল্য দফতর। হৃদয়ছোঁয়া ওয়াজ-নসীহত ও ব্যাপক লেখালেখির মাধ্যমে আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের সংশোধনে এবং কুসংস্কার ও কুপ্রথার অপনোদনে তিনি যে অবিস্মরণীয় বিরাট কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন, সমকালীন সকলের মাঝে তা তার জন্য এনে দিয়েছে অনন্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। তাকওয়া, পরহেযগারী, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, সত্যিকারের দ্বীনী বুঝ ও সমঝ, শরয়ী ইলমের দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা, সততা ও সত্যবাদিতা, ইখলাসপূর্ণ আমলের চেষ্টা,

নির্মোহ দ্বীনী খেদমত, নিঃস্বার্থ তালকীন-তাবলীগ ইত্যাদি এমন উঁচু ও উচ্চাঙ্গের গুণ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছিলেন, যা শত্রু-মিত্র, পক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলের কাছেই সমানভাবে স্বীকৃত।

জন্ম ও শিক্ষা

তিনি ৫ রবিউস সানি ১২৮০ হিজরী মোতাবেক ৯ ডিসেম্বর ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার ঐতিহাসিক নাম হচ্ছে করম আযিম। পিতৃবংশীয় লোকদের রাখা নাম হচ্ছে আবদুল গনী। আর হযরত হাফেজ গোলাম মুরতাযা মাজযুব পানিপথী রহ.-এর নির্বাচন করা নাম হচ্ছে আশরাফ আলী। গোটা বিশ্বে এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি থানাভবনের ফারুকী মাশায়েখদের মধ্যে ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের মমতার আঁচল হারান। এরপর পুরোপুরি পিতার লালন-প্রতিপালনেই বেড়ে ওঠেন। তার মাঝে মেধা, প্রতিভা ও মনীষার নিদর্শন ফুটে ওঠে শৈশব থেকেই।

হযরত থানভী রহ. কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেন হাফেজ হুসাইন আলীর কাছে। ফারসি ও আরবির প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন নিজ এলাকায় মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ থানভী রহ.-এর কাছে, যিনি দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপনকারী প্রথম যুগের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ফারসির উঁচুস্তরের কিতাবাদি পড়েন মামা ওয়াজেদ আলী সাহেবের কাছে। শিক্ষা সমাপনের উদ্দেশ্যে ১২৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে দাখেলা নেন এবং ফারাগাত হাসিল করেন ১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে।

দারুল উলূমে শিক্ষালাভের সময় তিনি তদানীন্তন সদরুল মুদাররিসীন হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. থেকে অনেক বেশি উপকৃত হন। তাফসীরের কিছু দরসে শরীক হয়ে হযরত কাসেম নানুতবী রহ. থেকেও উপকৃত হন। কিন্তু থানভী রহ. যে বছর দেওবন্দে ভর্তি হন, সে বছরেই যেহেতু হযরত নানুতবী রহ. ইনতেকাল করেছিলেন, তাই তার থেকে খুব বেশি উপকৃত হতে পারেননি। অবশ্য হযরত শায়খুল হিন্দ রহ., মাওলানা আবদুল আলী রহ., মাওলানা সাইয়েদ আহমদ রহ. এবং মোল্লা মাহমুদ দেওবন্দী রহ. প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিদের থেকে বিভিন্ন কিতাব পড়েছেন এবং ভরপুর উপকৃত হয়েছেন। তাজবিদ ও কেরাতের মশক করেছেন সাওলাতিয়্যাহ মাদরাসা, মক্কা মুকাররমার শিক্ষক কারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. থেকে।

প্রাথমিক জীবন ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কস্থাপন

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে কানপুরের 'ফয়যে আম' মাদরাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন। তারপর কানপুরের জামিউল উলূমেও প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। কানপুরে হযরতের দরসে হাদীসের প্রসিদ্ধির কথা শুনে দূর-দরাজ থেকে তালিবানে ইলম ছুটে আসত। দরস-তাদরীসের পাশাপাশি তিনি ওয়াজ-নসীহতও করতেন। যার ফলে তার সঙ্গে জনসাধারণের একটা নিকট সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদিও কানপুরে বিদআত ও আহলে বিদআতের ছড়াছড়ি ছিল, তারপরও হযরতের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা ও সম্পর্ক-সম্প্রীতি স্থান করে নিয়েছিল সবার মনে। অথচ সে সময় খুব বেশি বয়স ছিল না তার।

ইতিপূর্বে ১২৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মাধ্যমে পত্রমারফত হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। তারপর ১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে হজে গিয়ে সরাসরি হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর খেদমতে হাজির হন এবং তার ফয়েয লাভে কৃতার্থ হন।

এরপর ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার হজে গমন করেন। এবারও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাজী সাহেব রহ.-এর সান্নিধ্যে থাকেন এবং আধ্যাত্মিক মেহনত-মোজাহাদা করে খেলাফত লাভে ধন্য হন।

থানাভবনে স্থায়ী বসবাস এবং ইলমী ও দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম

১৩১৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর পরামর্শে আল্লাহ-নির্ভরতার পুঁজি নিয়ে কানপুর ছেড়ে থানাভবনে চলে আসেন এবং খানকাহে ইমদাদিয়াতে অবস্থান শুরু করেন। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাতচল্লিশ বছরে তিনি তাবলীগ, তাযকিয়া ও তাসনীফের এমন মহান ও অমূল্য কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দেন, সেই যুগের দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মাঝে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আল্লাহ তাআলা তার বয়ানে বিরাট প্রভাব ও আকর্ষণ রেখেছিলেন। বড় বড় জলসায় বিরুদ্ধবাদীরা বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত থাকত। কিন্তু এমন ভাষা ও ভঙ্গিতে ওয়াজ-নসীহত করতেন যে, উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী প্রভাবিত না হয়ে পারত না।

কানপুরে দরস-তাদরিসের ধারা বন্ধ করে দেয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত ওয়াজ-নসীহতের ধারা অব্যাহত ছিল। থানাভবনে খানকাহে ইমদাদিয়াতে সবসময় সত্যান্বেষী ও আল্লাহপ্রেমী লোকদের ভিড় লেগেই থাকত। হযরত থেকে আধ্যাত্মিকতার সবক নিতে বড় বড় উলামায়ে কেরামের আসা-যাওয়াও চলতে থাকত। এভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে খেদমত হযরত থানভী রহ. আঞ্জাম দিয়েছেন, খুব কমসংখ্যক মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব।

তার মাধ্যমে শতসহস্র বিদআত, কুসংস্কার ও কুপ্রথার দুয়ার বন্ধ হয়েছে। তার মাওয়ায়েয, মালফুযাত ও রচনাবলির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্যিকারের মানুষ বনেছে, হাজার হাজার মানুষ প্রকৃত মুসলমান হয়েছে এবং শত শত মানুষ কামেল মুত্তাকী-পরহেযগার হয়ে গড়ে উঠেছে। আর অসংখ্য-অগণিত মানুষ লাভ করেছে ইলমী ও আমলী তোহফা। সাধারণ-বিশিষ্ট নির্বিশেষে বিরাট-সংখ্যক মানুষ যেভাবে তার বাইয়াত ও ইরশাদ দ্বারা মালামাল হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল ও দুষ্প্রাপ্য।

হযরত থানভী রহ.-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আন্দাজ এ থেকেই করা যায় যে, অবিভক্ত ভারতের বড় বড় আলেম ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তার হাতে বাইয়াত ছিলেন। ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন তার প্রসিদ্ধ খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নাম হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ., পাকিস্তানের মুফতী আযম ও দারুল উলূম করাচির প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী শফী দেওবন্দী রহ., *ইলাউস সুনানের* লেখক হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ., হযরত মাওলানা আবদুল বারী নদবী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ., হযরত মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী রহ., হযরত মাওলানা ইসা ইলাহাবাদী রহ., হযরত মাওলানা ওসিউল্লাহ ইলাহাবাদী রহ., হযরত মাওলানা মাসিহুল্লাহ জালালাবাদী রহ., হযরত মাওলানা আবদুল গনী ফুলপুরী রহ., হযরত মাওলানা আবরারুল হক হারদুয়ী রহ. প্রমুখ।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার এমনই প্রবহমান ঝরনাধারা ছিলেন যে, অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ তা থেকে 'জলসিঞ্চন' করে তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হয়েছে। এখনো পরোক্ষভাবে সেই ধারা অব্যাহত আছে। দ্বীনের এমন কোনো শাখা নেই, এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি সুবৃহৎ কীর্তি ও অবদানের উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত রেখে যাননি, হোক তা বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে, কিংবা রচনা ও গ্রন্থনার মাধ্যমে।

রচনাসম্ভার

হযরত ছিলেন ব্যাপক-বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী। যার প্রমাণ বহন করে তার রচনাবলির একেকটি পৃষ্ঠা। দ্বীনের প্রতিটি বিভাগে, প্রতিটি অঙ্গনে রচনা রেখে গেছেন। সংখ্যা ও উপকারিতার বিচারে ভারতীয় লেখকদের মাঝে তার জুড়ি মেলা ভার। তার ছোট-বড় কিতাবের সংখ্যা তিনশোর কাছাকাছি। আর প্রকাশিত মাওয়ায়েযের পরিমাণ তো তার চেয়েও বেশি। সবমিলিয়ে হযরত থানভী রহ.-এর কিতাব ও রিসালার সংখ্যা প্রায় আটশোর ঘরে। যার মধ্যে 'তাফসীরে বয়ানুল কুরআন', 'শরহে মসনবিয়ে রুমী', 'ইমদাদুল ফাতাওয়া', 'আত-তাআররুফ ইলাত তাসাউফ' ইত্যাদি কিতাব কয়েক খণ্ডে লিখিত। এই উপমহাদেশের শিক্ষিত মুসলমানের কম সংখ্যক ঘরই এমন পাওয়া যাবে, যেখানে থানভী রহ.-এর কোনো পুস্তক বা পুস্তিকা নেই। তার এই রচনাবলির মধ্যে *বেহেশতী যেওর* এতটাই পাঠকপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, প্রতি বছর বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে কিতাবটির হাজার হাজার কপি বের হয় এবং মানুষের মধ্যে বিতরণ হয়ে যায়।

হযরতের রচিত সকল কিতাব ও রিসালাহ রুহানী ভেদরহস্যে ও ইলমী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। তাতে কঠিন ও জটিল আয়াতের তাফসীর, হাদীস ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা, ফিকহী জটিলতাপূর্ণ মাসআলার সমাধান, সুলুক ও মারেফতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যভেদ, উত্তম চরিত্র ও মন্দ চরিত্রের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং তা অর্জন ও বর্জন করার পদ্ধতি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আধুনিক যুগের বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ ও প্রশ্নেরও জবাব। পাশাপাশি তাতে বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন মাসআলা এত অধিক পরিমাণে রয়েছে যে, প্রত্যেক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা যদি পৃথক করা হয়, তাহলে প্রত্যেক বিষয়ের ওপর স্বতন্ত্র কিতাব তৈরি হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে এ ধারার বহু সংকলন তৈরিও হয়েছে এবং তার ধারাও অব্যাহত আছে। আর সেসব চিঠিপত্র ও তার জবাবের কথা তো বাদই রয়ে গেল, যা তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লিখতেন এবং প্রতিদিনের চিঠির উত্তর প্রতিদিনই লেখার চেষ্টা করতেন। এসব চিঠিপত্র যদি একত্র করা হয়, তবে তাও পরিণত হবে বিরাট এক দফতরে।

হযরত থানভী রহ.-এর রচনাবলির, বরং প্রতিটি লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাঠকের মনে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল তথ্য-উপাত্ত ও মাসআলা-মাসায়েল লেখকের নখদর্পণে, যা স্ব স্ব স্থানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি উপস্থাপন করে চলেছেন। সাধারণত এমন হয়ে থাকে যে, লেখক যখন কোনো বিষয়ের ওপর কলম ধরেন তখন অনেক সময় বাড়াবাড়ির শিকার হন এবং প্রয়োজনীয় বহু দিক এড়িয়ে যান। কিন্তু হযরতের রচনাসম্ভারের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির উর্ধ্বে উঠে পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে তার কলম এমন গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে যে, ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মুগ্ধ ও অভিভূত না হয়ে পারে না। তিনি কুরআনের যে অনুবাদ করেছেন তা প্রভাব, সহজবোধ্যতা ও উদ্দেশ্য বর্ণনায় এককথায় অতুলনীয়। বস্তুত 'বয়ানুল কুরআন' তার অমূল্য ও অতুলনীয় এক অবদান। একইভাবে ফিকহে হানাফীর দলিল হতে পারে এমন হাদীসের যে বিশাল সম্ভার সংকলিত হয়েছে, যার নাম 'ইলাউস সুনান', সেটাও তারই চেষ্টা-মেহনতের ফসল।

ঈর্ষণীয় কিছু গুণ

হযরত থানভী রহ.-এর জীবনধারা ছিল খুবই সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি। সকল কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকত এবং প্রতিটি কাজ যথাসময়েই পুরো করা হতো। ভক্ত ও মুরিদদের পক্ষ থেকে নিয়মিত অসংখ্য চিঠিপত্র আসত, সময়সাপেক্ষে প্রতিটি পত্রের উত্তর নিজেই লিখতেন। হযরতের সময় ও জীবনের বরকত-প্রাচুর্য এবং লেখালেখি ও ইলমী খেদমতের ফলপ্রসূতা ও আধিক্যের মূল রহস্য এই সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ও সময়ের সদ্ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত। নতুবা মাত্র ৪৭ বছরের জীবনে সুলুক, তাসাউফ, মুরিদগণের ইসলাহ ও খানকাহের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দ্বীনের প্রায় সকল বিভাগে এবং সকল বিষয়ে প্রায় আটশো জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণাধর্মী মূল্যবান গ্রন্থের সম্ভার রেখে যাওয়া, যা হাজার হাজার পৃষ্ঠায় ব্যাপ্ত, কোনো সাধারণ বিষয় নয়, জীবন্ত কারামতই বটে।

আল্লাহ তাআলা হযরতকে ইসতেগনা তথা স্ব-নির্ভরশীলতা ও নির্মুখাপেক্ষিতার পাশাপাশি উদারতা ও বদান্যতার গুণেও গুণান্বিত করেছিলেন। তার একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, আপন রচনাবলি থেকে তিনি কখনো এক পয়সার উপকারও লাভ করেননি। সকল কিতাবের স্বত্বাধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে যে-কেউ যেকোনো কিতাব ছাপতে

পারত ইচ্ছামতো। তার ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত ও উদারচিত্ততার এটিই উৎকৃষ্ট প্রমাণ যে, রচনাবলির অস্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠকপ্রিয়তাসত্ত্বেও কখনো কোনো কিতাবের স্বত্বাধিকার নিজের জন্য সংরক্ষণ করেননি। অথচ ইচ্ছা করলে সন্দেহাতীতভাবে লক্ষ লক্ষ রুপি লাভ করতে পারতেন সেগুলোর মাধ্যমে।

দারুল উলূম দেওবন্দের অভিভাবকত্ব

১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-কে দারুল উলূম দেওবন্দের শুরা-সদস্য নির্বাচন করা হয় এবং ১৩৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে অভিভাবক নির্বাচন করা হয়। দায়িত্ব লাভের পর দারুল উলূমের ওপর যেসব ঝড়-তুফান ধেয়ে এসেছিল, তিনি তার সফল মোকাবিলা করেছেন স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি ও উচ্চ মনোবলের মাধ্যমে এবং হেফাজত করেছেন দারুল উলূমের কিশতিকে। দশ বছর অভিভাবকের পদ অলংকৃত করে রাখার পর ১৩৫৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে একের পর এক কর্মব্যস্ততার কারণে এই পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। এরপর দারুল উলূমের অভিভাবক নামে আর কাউকে নির্বাচন করা হয়নি।

পরলোকগমন

১৫-১৬ রজব ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯-২০ জুলাই ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী রাতে জন্মভূমি থানাভবনে তিনি ইনতেকাল করেন এবং থানাভবনেই হাফেজ জামিন শহীদের কবরের কাছাকাছি নিজস্ব বাগানে সমাহিত হন, যা খানকাহে ইমদাদিয়ার নামে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ. হযরতের মৃত্যুর পর লেখেন :

> হযরত থানভী রহ.- এর ইনতেকালে ওই যুগের পুরোপুরি সমাপ্তি ঘটল, যা ছিল হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ., মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ., মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. ও মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ থানভী রহ.-এর স্মৃতি-জাগরণকারী। হযরত থানভী রহ. ছিলেন সেই মহান ব্যক্তি যার মধ্যে চিশতী বুযুর্গানে দ্বীন, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. ও হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর নিসবত

একত্র হয়েছিল এবং যার সিনা চিশতী ধারার ইশক ও ঐশী আকর্ষণের এবং মুজাদ্দেদী ধারার মৌনব্রত ও ভালোবাসার সংগমস্থল ছিল। যার জবান শরীয়ত ও তরীকতের একাত্মতা ও অভিন্নতার প্রবক্তা ছিল এবং যার কলম দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর ফিকহ ও তাসাউফের মাঝে মেলবন্ধন তৈরি করেছিল। বস্তুত থানভী রহ. ছিলেন সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যিনি আল্লাহর তাওফীকে আপন ফয়েযে অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত শিক্ষা, দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও রাহনুমায়ির মাধ্যমে পুরো এক জগৎকে উপকৃত করেছেন, যিনি লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ঈমানের হাকীকত, ফিককের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, তাযকিয়ার রহস্যপূর্ণ ও ঐশী প্রজ্ঞার সুপ্ত-গুপ্ত বিষয়সমূহ জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এজন্যই পুরো দুনিয়া তাকে 'হাকীমুল উম্মত' নামে অভিহিত করেছে, যা ছিল যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্য পুরোপুরি প্রযুক্ত ও বাস্তবসম্মত।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.

(জন্ম : ১২৯২ হি./১৮৭৫ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৫২ হি./১৯৩৩ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. এমন এক বরকতপূর্ণ সত্তার নাম, যার না কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন আছে, আর না কোনো প্রশংসা-মন্তব্যের দরকার আছে। তার প্রকৃত ইতিহাস তো তার সুযোগ্য শাগরিদ ও ইলমী অবদানের মধ্য দিয়েই ভাস্বর হয়ে আছে আমাদের মাঝে। উম্মতে মুহাম্মদির মাঝে লক্ষ লক্ষ আলেম আবির্ভূত হয়েছেন এবং দুনিয়ার জন্য আলোকিত কর্ম ও কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা একেবারেই হাতে-গোনা, যাদের কল্যাণপ্রবাহ বিশ্বব্যাপী, যাদের প্রিয়তা সর্বজনব্যাপী এবং যাদের ইলম-আমল উভয়ের মাধ্যমেই উম্মাহ উপকার লাভকারী।

ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. হাতে-গোনা সেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন, যার মতো ব্যক্তিত্ব গোটা শতাব্দীতে কেবল একবারই আসে এবং গোটা শতাব্দীকে আলোকিত করে যায়। তার জ্ঞানসমুদ্র যেমন পূর্বসূরিদের পুণ্যস্মৃতি জাগ্রত করে দিত, তেমনই তার আমল ও ইবাদত জীবন্ত করে তুলত সালফে সালেহীনের পুণ্যময় জীবন। ইলম, তাকওয়া, পবিত্রতা, দুনিয়াবিমুখতা, স্মৃতিশক্তি, অল্পেতুষ্টি ইত্যাকার একেকটি গুণ ছিল আদর্শ ও দৃষ্টান্তমূলক। ইলমের ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে ছাত্ররা তাকে বলত 'চলন্ত ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি'।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত শাহ সাহেব রহ. 'ভূস্বর্গ' খ্যাত কাশ্মীরের বাসিন্দা ছিলেন। ২৭ শাওয়াল ১২৯২ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৫ সালের নভেম্বরে সেখানকার

সাইয়েদ বংশের এক অভিজাত ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যাকে পুরো কাশ্মীরে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বে অদ্বিতীয় পরিবার বলে মনে করা হতো। সাড়ে চার বছর বয়সে তিনি পিতা মাওলানা সাইয়েদ মুয়াজ্জম শাহের কাছে কুরআন মাজিদ শিখতে শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ বোধ, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল তার মাঝে। ফলে মাত্র দেড় বছরে কুরআন শরীফের পাশাপাশি ফারসির প্রাথমিক কিছু কিতাবও পড়ে শেষ করেন এবং প্রচলিত অন্যান্য বিষয়ের ইলমও শিখতে শুরু করেন।

হযরতের বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখন ইলম অন্বেষণের অদম্য পিপাসা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে উদ্বুদ্ধ হন। ইলমের পিপাসা নিয়ে তিনি 'হাজারা' গমন করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন মাদরাসায় বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের জগৎজোড়া সুখ্যাতি তাকে উদ্‌গ্রীব করে তোলে সেখানে গিয়ে 'তাকমীল' পড়ার জন্য। তাই ১৩১১ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। তখন দারুল উলূমে সদরুল মুদাররিসীনের পদে ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.। প্রথম সাক্ষাতেই প্রকৃত পরিচয় লাভে সক্ষম হন উস্তাদ-শাগরিদ পরস্পরের।

কাশ্মীরি রহ. প্রয়োজনীয় কিতাবাদি পড়া শেষ করে হাদীস ও তাফসীরের কিতাবাদি শুরু করেন এবং কয়েক বছরের ব্যবধানেই দারুল উলূমের মধ্যে প্রিয়তা, সুখ্যাতি ও মর্যাদামণ্ডিত অবস্থান লাভ করেন। তারপর ১৩১৪ হিজরীতে হাদীস, তাফসীর ও অন্যান্য শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গের কিতাবাদি সমাপ্ত করে হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর খেদমতে হাজির হন এবং হাদীসের সনদ হাসিল করেন। সেইসাথে রুহানি ফয়েয ও আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রবাহ দ্বারাও মালামাল হন এবং ধন্য হন খেলাফত লাভে।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে দিল্লির মাদরাসায়ে আমিনিয়্যায় কিছুদিন দরস-তাদরিসের খেদমত আঞ্জাম দেন। তারপর ১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরে এসে নিজ এলাকায় 'ফয়যে আম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে হজব্রত পালন করতে যান এবং কিছুদিন হিজাযে থেকে সেখানকার বিভিন্ন কুতুবখানা থেকে ইসতেফাদা করেন।

দারুল উলূমের সাথে দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক স্থাপন

১৩২৭ হিজরী মোতাবেক ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরি রহ. দেওবন্দ তাশরীফ আনেন। তখন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তাকে দেওবন্দে রেখে দেন। তারপর ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন শায়খুল হিন্দ রহ. হজের সফরে যান তখন তাকে নিজের স্থলবর্তী করে যান। প্রায় বারো বছর পর্যন্ত দারুল উলূমে সদর মুদাররিসের পদে সমাসীন থাকেন। ১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে দারুল উলূমের ইহতেমাম-কেন্দ্রিক কিছু মতানৈক্যের কারণে দারুল উলূম থেকে অব্যাহতি নিয়ে গুজরাট চলে যান এবং ঢাবেল মাদরাসায় গিয়ে দরস-তাদরিসের সিলসিলা শুরু করেন। দরসে হাদীসের এ ধারা অব্যাহত ছিল ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

বহুগুণের আধার অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব

একদিকে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের সুনাম-সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। আরেকদিকে হযরত শাহ সাহেব রহ. দরসের মসনদে বসে ইসলামী বিশ্বকে ইলমে দ্বীন দ্বারা আলোকিত করেছেন। হাদীসের অঙ্গনে তিনি অতুলনীয় মুহাদ্দিস ছিলেন, ফিকহের অঙ্গনে সুমহান ফকীহ ছিলেন, শরীয়তের অনুসরণে সালফে সালেহীনের উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন এবং আল্লাহর মারেফতে যুগের জুনাইদ ও শিবলি ছিলেন। তার পুণ্যময় অস্তিত্বই ছিল ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তের প্রাণশক্তির উৎস। ইসলামী বিশ্ব এমন জ্ঞানসমুদ্র ও আমলের সাজে সজ্জিত ব্যক্তি খুব কমই উপহার দিয়েছে। শাহ সাহেব রহ. সমকালীনদের মাঝে জ্ঞানের গভীরতায় যেমন অতুল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তেমনই খোদাভীরুতা ও দুনিয়াবিমুখতায়ও ছিলেন নজিরহীন ব্যক্তিত্ব। হাদীস, তাফসীর, দর্শন সকল শাস্ত্রেই ছিলেন সুপণ্ডিত ও বিদগ্ধ। একজন মানুষের পক্ষে একটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করাও যেখানে অনেক বড় বিষয় সেখানে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন বহু বিষয়ে ও বহু শাস্ত্রে।

হযরত শাহ সাহেব রহ. ইলমী অঙ্গনে অন্যরকম এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে ইলমের পিপাসা নিয়ে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী তার কাছে আসে সেই সময় তার তুলনা ছিল বিরল। মধ্য-এশিয়া থেকে নিয়ে চীন

পর্যন্ত পুরো অঞ্চলে তার জ্ঞানের উচ্ছল ধারা প্রবাহিত হয় এবং হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরের হাজার হাজার জ্ঞানপিপাসু ছাত্র তার থেকে জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করে। অবিভক্ত হিন্দুস্তান, আরব, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, চীন, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় তার বিপুল পরিমাণ ছাত্র ছড়িয়ে পড়ে। দারুল উলূম দেওবন্দে থাকাকালে যে-সকল তালিবে ইলম হযরত থেকে হাদীস পড়ে দাওরা সমাপন করে তাদের সংখ্যা ৮০৯ জন, তখনকার সময় বিবেচনায় যা অনেক।

আল্লাহ তাআলা হযরত শাহ সাহেব রহ.-কে অতুলনীয় মেধা ও স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। যার ফলে কোনো কিতাব একবার মুতাআলা করলে শুধু অর্থ ও মর্মই নয়; পৃষ্ঠা ও লাইনসহ মূলপাঠও স্মৃতিবদ্ধ হয়ে যেত। যেকোনো কথা দৃষ্টিপথে কিংবা কর্ণপথে মস্তিষ্কে পৌঁছত, সারাজীবনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যেত। দরসের মসনদে বসে যখন তাকরীর পেশ করতেন তখন হাওলার পর হাওলার সিলসিলা জারি হয়ে যেত। এরপরও মুতাআলা ও অধ্যয়নের এমন জযবা ছিল যে, সকল ইলমের ধনভান্ডারও তার অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানপিপাসাকে নিবারণ করতে পারত না। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও অসামান্য অধ্যয়নের কল্যাণেই তিনি ছিলেন এক চলন্ত ও জীবন্ত লাইব্রেরি। সিহাহ সিত্তাহসহ প্রায় অধিকাংশ কিতাবই ছিল তার মুখস্থ ও ঠোঁটস্থ।

বিশ্লেষণাত্মক ও গবেষণাধর্মী মাসআলা-মাসায়েল, যার তত্ত্বতালাশ ও চিন্তা-গবেষণায় পুরো একজীবন ব্যয় হয়ে যায়, প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার জবাবে অল্প সময়ের মধ্যে তার এমন সর্বদিকস্পর্শী উত্তর দিতেন যে, প্রশ্নকারীর কোনো সংশয়-সন্দেহই বাকি থাকত না এবং কিতাব দেখারও প্রয়োজন বোধ হতো না। আরও দারুণ ব্যাপার হলো, তিনি শুধু কিতাবের নাম বলেই ক্ষান্ত হতেন না, পৃষ্ঠা ও লাইন-নম্বর পর্যন্ত বলে দিতেন।

যেকোনো বিষয়ে এমন স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে বক্তৃতা পেশ করতেন যে, মনে হতো, গোটা জ্ঞানভান্ডারই তার নখদর্পণে। বক্তৃতার মাঝে অসংখ্য কিতাবের সূত্র উল্লেখ করতেন একেবারে দ্বিধাহীনচিত্তে। কোনো কিতাবের পাঁচ-পাঁচ, দশ-দশ হাশিয়া থাকলে তারও ইবারত বলে দিতে পারতেন পৃষ্ঠা ও লাইন-নম্বরসহ। হাদীসে নববীর গোটা খাজানা, হাদীসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা, হাদীস বর্ণনাকারীদের স্তরভিত্তিক পর্যালোচনা

যেমন তার আত্মস্থ ছিল, তেমনই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ অধিকাংশ কুতুবখানার অধিকাংশ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত তার মুতাআলায় এসে গিয়েছিল। আর সবকিছু এমনভাবে মুখস্থ ছিল যে, মনে হতো, এইমাত্র মুতাআলা করে এসেছেন।

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর স্মৃতিশক্তি কেমন প্রখর ছিল তা এ থেকেই অনুভব করা যায় যে, মুহাক্কিক ইবনে হুমাম-কৃত আট খণ্ডের 'ফাতহুল কাদির' মাত্র ২০ দিনে মুতাআলা করে শেষ করেছেন। সেইসাথে এই সময়ের মধ্যে 'কিতাবুল হজের' সারসংক্ষেপও লিখেছেন এবং ইবনে হুমাম রহ. 'হিদায়াহ' গ্রন্থকারের ওপর যেসব অভিযোগ-আপত্তি করেছেন তারও জবাব দিয়েছেন। একবার দরসে বলেন, 'আজ থেকে ২৬ বছর আগে *ফাতহুল কাদির* মুতাআলা করেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজন পড়েনি। আজও যে বিষয়ের আলোচনা করব, যদি তোমরা কিতাব দেখো তাহলে খুব কমই ব্যবধান লক্ষ করবে।' এটি একটিমাত্র ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা রয়েছে তার জীবনে অসংখ্য।

হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর সঙ্গে প্রাচ্যের কবি আল্লামা ড. ইকবাল রহ.-এর বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। অধিকাংশ ইলমী বিষয়ে তিনি শাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতেন। মনে করতেন, ইসলামী মাসআলা-মাসায়েলের আধুনিক সংকলনের জন্য শাহ সাহেব থেকে অধিক যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ নেই। জীবনের শেষদিকে এসে আল্লামা ইকবাল মরহুমের অন্তরে ইসলামের প্রতি যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল, তাতে বড় ভূমিকা ছিল হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর সোহবত ও সান্নিধ্যের। তিনি ইসলাম-সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে শাহ সাহেব রহ. থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাই আল্লামা মরহুম তাকে খুবই ইজ্জত-সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং তার মতামত অবনত মস্তকে মেনে নিতেন।

কুরআন-সুন্নাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইলমের পাশাপাশি ইলমে তাসাউফেও কাশ্মীরি রহ.-এর ছিল গভীর দৃষ্টি। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ. 'মাআরিফ'-এ হযরতের মৃত্যু সম্পর্কে লেখেন :

> আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. ছিলেন সেই সমুদ্রের মতো যার ওপরের স্তর থাকে শান্ত ও নিস্তরঙ্গ, কিন্তু ভেতরের স্তর থাকে অমূল্য মণিমুক্তায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ। দৃষ্টির প্রশস্ততা, স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ও

মুখস্থের অসামান্যতায় তিনি ছিলেন বর্তমান যুগের অতুল ব্যক্তিত্ব। হাদীসশাস্ত্রে বিদগ্ধ, ভাষাসাহিত্যে সুদক্ষ, যুক্তি-দর্শনে অভিজ্ঞ, কবিতা ও কাব্যিকতায় সিদ্ধহস্ত এবং যুহদ ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ। ইলমের জন্য উৎসর্গিত এই মহান ব্যক্তি আমরণ উচ্চকিত করেছেন 'কলাল্লাহু' ও 'কলার রাসুল'-এর ধ্বনি।

মিশরের বিখ্যাত প্রথিতযশা আলেম সাইয়েদ রশীদ রেযা রহ. যখন দেওবন্দ আগমন করেন এবং হযরত কাশ্মীরি রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন বারবার বলতে থাকেন,

ما رأيت مثل هذا الأستاذ الجليل!

এমন মহান উস্তাদের ন্যায় কোনো আলেমকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি!

মোটকথা, দারুল উলূম দেওবন্দের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, হযরত শায়খুল হিন্দের পর সদরুল মুদাররিসীনের পদ হযরত শাহ সাহেব রহ.-কে অর্পণ করা হয়েছিল। হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি রহ.-এর ভাষ্য অনুসারে, 'তার যুগে ছাত্রদের যোগ্যতায় বড় ইনকিলাব তৈরি হয়েছিল এবং ভালো ভালো মেধাবী ছাত্র তার দরস থেকে উপকৃত হয়েছিল।'

জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হযরত শাহ সাহেব রহ. আপন উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর চিন্তা ও আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনের রূহ ফুঁকে দেয়া উলামায়ে কেরামের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। পেশাওয়ারে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অষ্টম বাৎসরিক অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্বের যে দূরদর্শিতাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

হযরত থানভী রহ. *নাফহাতুল আম্বর* গ্রন্থের প্রশংসা-মন্তব্যে লিখেছেন, 'আমার কাছে ইসলামের হক্কানিয়্যাত ও সত্যতার বহু প্রমাণ আছে। সেগুলোর অন্যতম দলিল হচ্ছে, হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর অস্তিত্ব। যদি ইসলামধর্মে কোনো বক্রতা ও অসংলগ্নতা থাকত তাহলে কাশ্মীরি রহ. নিশ্চিতভাবে ইসলামধর্ম বর্জন করতেন।'

হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর মৃত্যুর পর তার শোকপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. বলেন, 'আমাকে

যদি মিশর বা শামের কেউ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আপনি কি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, শায়েখ তকি উদ্দীন ইবনে দাকিকুল ইদ ও সুলতানুল উলামা শায়েখ ইযযদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম রহিমাহুমুল্লাহকে দেখেছেন? তাহলে রূপক অর্থে বলতে পারব, হ্যাঁ, দেখেছি। কেননা শুধু আগে-পরেরই তো ব্যবধান। শাহ সাহেব যদি ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর হতেন তাহলে আপন গুণ, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি তাদের সমস্তরেরই একজন হতেন।'

প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. হাজারেরও অধিক তালিবে ইলমকে হাদীসের দরস দিয়েছেন। তার সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী, মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব, মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবী, মাওলানা সাইয়েদ বদরে আলম মিরাঠি, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি, মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি, আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরি, মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরি, মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরি, মাওলানা মুফতী আতিকুর রহমান উসমানী, মাওলানা হামিদ আনসারি গাযি, মাওলানা সাইদ আহমদ আকবরাবাদী, মাওলানা হামিদুদ দ্বীন ফয়েযাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা দেওবন্দী, মুফতী মুহাম্মদ নাইম লুধিয়ানবি, মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানবি, মাওলানা মনযুর আহমদ নুমানী রহিমাহুমুল্লাহ।

রচনা ও গ্রন্থসমূহ

হযরত শাহ সাহেব রহ. কঠিন ও জটিল মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলের ওপর বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। হযরতের দরসে হাদীসের আলোচনা কেমন সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হতো তার কিছুটা আন্দায করা যায় চার খণ্ডে প্রকাশিত 'ফয়যুল বারি' গ্রন্থের মাধ্যমে, যা *সহীহ বুখারী*কেন্দ্রিক হযরতের তাকরীর ও আলোচনাসমগ্র এবং যা *সহীহ বুখারী*র বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের অন্যতম। *সুনানে তিরমিযী*র শরাহ 'আরফুশ শাযি'-ও হযরতের দরসি তাকরীরের সংকলিত গ্রন্থ। 'মুশকিলাতুল কুরআন'-কে মনে করা হয় আপন বিষয়ের ওপর অনন্য ও দৃষ্টান্তশূন্য গ্রন্থ।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ফেতনা উসকে দেয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধে হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. ও তার সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দের ইলমী ও আমলি প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ শতবার প্রশংসা করার মতো। খতমে নবুয়ত, তাকফির ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে তারা মূল্যবান তথ্যসম্ভার একত্র করেছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কাদিয়ানিদেরকে লা-জবাব করে দিয়েছেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে তাদের এক ডজনেরও অধিক গ্রন্থাবলি আত্মপ্রকাশ করেছে, যাতে আলোচিত হয়েছে মতবিরোধপূর্ণ কঠিন ও জটিল মাসআলাসমূহ।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত শাহ সাহেব রহ.-এর আরও কিছু কিতাবের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

- نيل الفرقدين في رفع اليدين (নাইলুল ফারকাদাইনি ফি রফয়িল ইয়াদাইন)
- بسط اليدين في مسئلة رفع اليدين (বাসতুল ইয়াদাইনি ফি রফয়িল ইয়াদাইন)
- فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب (ফসলুল খিতাবি ফি মাসআলাতি উম্মিল কিতাব)
- ضرب الخاتم على حدوث العالم (যরবুল খাতামি আলা হুদুসিল আলাম)
- خزائن الأسرار (খাযায়িনুল আসরার)
- إكفار الملحدين في ضروريات الدين (ইকফারুল মুলহিদিন)
- التصريح بما تواتر في نزول المسيح (আত-তাসরিহু বিমা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মাসিহ)
- تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام (তাহিয়্যাতুল ইসলামী ফি হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম)
- عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام (আকিদুস সালাম ফি হায়াতি ঈসা আলাইহিস সালাম)
- خاتم النبيين(খাতামুন নাবিয়্যিন)
- كشف الستر عن صلاة الوتر (কাশফুস সিতরি আন সালাতিল বিতর) প্রমুখ।

ইহধামত্যাগ

হযরত কাশ্মীরি রহ. ঢাবেলে কয়েক বছর অবস্থান করেন। তারপর রোগশোকের উপর্যুপরি আক্রমণের শিকার হয়ে দেওবন্দে ফিরে আসেন। দেওবন্দকেই তিনি আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর দেওবন্দের মাটিতেই ৩ সফর ১৩৫২ হিজরী মোতাবেক ২৮ মে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ষাট বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। হযরতের কবর দেওবন্দের ঈদগাহের সন্নিকটে অবস্থিত।

হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরি রহ. 'নাফহাতুল আম্বার' গ্রন্থে হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর বিস্তারিত জীবনী লিখেছেন। গ্রন্থটি আরবিতে। 'হায়াতে আনওয়ার' নামে উর্দুতে আরেকটি কিতাব আছে। 'হায়াতে আনওয়ার' কিতাবটি বিভিন্ন ব্যক্তিদের মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন। 'আল-আনওয়ার' ও 'নকশে দাওয়াম' কিতাবদুটিও হযরতের জীবনী ও ঘটনাবলি নিয়ে রচিত।

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.

(জন্ম : ১২৯৬ হি./১৮৭৯ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৭৭ হি./১৯৫৭ খ্রি.)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ছিলেন একাধারে দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি এবং তাসাউফ ও রাজনীতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। বস্তুত, সর্বব্যাপী গুণ, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার বিবেচনায় তিনি إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً (নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন একটি জাতি)-এর জীবন্ত ব্যাখ্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন ইলম ও মারেফতের ইমাম, সুলুক ও তাসাউফের শায়েখ, অটলতা ও অবিচলতার পাহাড়, দারিদ্র্য ও বিনয়ের নিদর্শন, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রস্রবণ, নির্মোহতা ও অল্পেতুষ্টির প্রতিবিম্ব, ইখলাস ও ইসারের প্রতিচ্ছবি, উদারতা ও বদান্যতার আধার, ধৈর্য ও আত্মনিবেদনের ভান্ডার, বীরত্ব ও সাহসিকতার ঘোড়সওয়ার, কর্ম ও শ্রমসাধনার রাজাধিরাজ এবং মহান পূর্বসূরিদের পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত স্মৃতির ধারক।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাদানী রহ.-এর বাড়ি ছিল উত্তরপ্রদেশের 'ফয়যাবাদ' জেলার 'টানডা' উপশহরের 'ইলাহদাদপুরে'। ১৯ শাওয়াল ১২৯৬ হিজরী মোতাবেক ৬ অক্টোবর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 'উন্নাও' জেলার 'বাঙ্গিরমৌ' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যেখানে হযরতের পিতা সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ সাহেব হেড মাস্টার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইলম ও তাকওয়া-পরহেযগারির কারণে এই সাইয়েদ পরিবারটি সবসময়ই ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী ছিলেন এবং মুসলিম শাসনামলে বিরাট জায়গীরের মালিক ছিলেন।

মাদানী রহ. প্রাথমিক শিক্ষা প্রাইমারি স্কুলে সমাপ্ত করার পর ১৪ বছর বয়সে দেওবন্দে আসেন এবং দারুল উলূমে মিযান জামাতে ভর্তি হন। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বিশেষ স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা

করেন। সাত বছর দারুল উলূমের ইলমী পরিবেশে কাটিয়ে দারুল উলূমের শিক্ষাসিলেবাস সমাপ্ত করার পর তিনি বাড়ি ফেরেন। তখন পিতা সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ সাহেব হিজরতের নিয়তে মদীনা মুনাওয়ারা সফরের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। পিতামাতার সঙ্গে মাদানী রহ.-ও রওনা হয়ে যান।

হিজায সফরের আগে মাদানী রহ. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন এবং তারই নির্দেশে মক্কা মুকাররমায় পৌছে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. থেকেও ফয়েয হাসিল করেন। এরপর পিতার সঙ্গেই মদীনাতে বসবাস করা আরম্ভ করেন এবং পিতার জীবদ্দশা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। কেননা হিজরতের নিয়তে হিজাযের সফর না করলেও পিতার জীবদ্দশায় পিতার স্নেহছায়া ছেড়ে হিন্দুস্তানে ফিরে আসা তিনি পছন্দ করেননি।

মসজিদে নববীতে দরসের মজলিসে

হযরত মাদানী রহ. মদীনা মুনাওয়ারায় থাকাকালে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতাকে জয় করে সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর ভরসা করে প্রায় বারো-তেরো বছর মসজিদে নববীতে হাদীসের দরস দেন। প্রতিদিন প্রায় বারো ঘণ্টা দরস-তাদরিসের সিলসিলা জারি থাকত। একের পর এক বিভিন্ন জামাত আসত এবং তার থেকে ইলমের সুধাপানে তৃপ্ত হতো। মসজিদে নববীতে হযরতের দরসে হাদীস ছিল সেখানকার অন্য সকল শায়েখ থেকে ভিন্ন ও সমাদৃত। ফলে ইসলামী বিশ্বের বিপুলসংখ্যক ছাত্র এসে সমবেত হয়েছিল তার চারপাশে। হিজাযের পাক যমিনে, মসজিদে নববীর নুরানি পরিবেশে একজন ইন্দুস্তানি আলেমের প্রতি এই সমাদর ও আকর্ষণের মূল কারণ ছিল তার দরসদানের অনন্য পদ্ধতি, যা তিনি দারুল উলূমের আসাতেযায়ে কেরামের সান্নিধ্য ও সন্নিধান থেকে লাভ করেছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে হযরত মাদানী রহ. কয়েকবার হিন্দুস্তাতে এসেছেন। এ সময় হযরত গাঙ্গুহী রহ. থেকে খেলাফতও লাভ করেছেন। ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় একবছর দেওবন্দে অবস্থান করে দরস-তাদরিসের দায়িত্বও পালন করেছেন। ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. যখন হিজাযে গমন করেন তখন হযরত মাদানী রহ.-এর কাছেই অবস্থান করেন। তারই মাধ্যমে তুর্কি যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশা ও কামাল পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের সামনে

স্বীয় বৈপ্লবিক স্কিম তুলে ধরেন। যখন আরবরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে আর শরীফ হুসাইন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয় তখনো মাদানী রহ. শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন। ফলে তাকেও মাল্টায় যুদ্ধবন্দি হিসাবে থাকতে হয় সোয়া তিন বছর পর্যন্ত।

১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে যখন মাল্টার যিন্দানখানা থেকে নিষ্কৃতি মেলে তখন হযরত মাদানী রহ. হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সঙ্গে হিন্দুস্তানে গমন করেন। মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়টি ছিল খেলাফত আন্দোলনের সূচনালগ্ন। হিন্দুস্তানের মাটি স্পর্শ করার পর তিনি হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নেতৃত্বে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন এবং এমন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানি পেশ করেন যে, তার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে যায় মুসলিম জনসাধারণের অন্তর। ফলে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইনতেকালের পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তার স্থলবর্তী করা হয় হযরত মাদানী রহ.-কে।

বস্তুত মাদানী রহ. ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইলমী ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের সবচেয়ে বড় আমানতদার। শায়খুল হিন্দ রহ.-এর এত দীর্ঘ সোহবত ও সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন যে, সাথি-সঙ্গী ও সমকালীন কোনো ব্যক্তিই এ বিষয়ে তার সমকক্ষ ও সমপর্যায়ের হতে পারে না। এই সঙ্গ, সান্নিধ্য ও একাত্মতা হযরত মাদানী রহ.-এর পবিত্র সত্তাকে এমন এক উজ্জ্বল দর্পণে পরিণত করেছিল, যাতে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর আপাদমস্তক প্রতিবিম্বিত হতো অতিসুস্পষ্টভাবে।

স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে হযরত মাদানী রহ.-কে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। প্রায় আটবছর তাকে ইংরেজদের জেলখানায় থাকতে হয়েছে। বলাবাহুল্য, স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য জেল-জুলুমের অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্ল্যাটফর্ম থেকে দেশ ও জাতির সেবা করেছেন এবং আমরণ নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন ভারতীয় বিপুলসংখ্যক মুসলমানদের।

দারুল উলূমের সদর মুদাররিসের পদে

১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. দারুল উলূম থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তখন দারুল উলূমের ইলমী কাফেলায় হযরত মাদানী রহ. ব্যতীত এমন কোনো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যিনি দারুল উলূমের ওই শূন্যস্থানকে যথাযোগ্যভাবে পূরণ করতে পারেন। এজন্য আকাবিরে দারুল উলূমের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় হযরত মাদানী রহ.-এর প্রতি। ফলে তাকেই সদর মুদাররিস হিসাবে মনোনীত করা হয়। তার সময়ে ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়, এমনকি দাওরা হাদীসের ছাত্র তিনগুণ ছাড়িয়ে যায়। ১৩৪৬ হিজরী থেকে ১৩৭৭ হিজরী পর্যন্ত বত্রিশ বছর সদরুল মুদাররিসীন থাকাকালে দাওরা হাদীস সমাপনকারী তালিবানে ইলমের সংখ্যা হয় ৪৪৮৩ জন।

বিষয়বৈচিত্র্যে ও সমৃদ্ধি-প্রাচুর্যে হযরত মাদানী রহ.-এর দরসে হাদীসকে মনে করা হতো ইসলামী বিশ্বের অনন্য ও অদ্বিতীয়। তার দরসের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রসিদ্ধি ও আকর্ষণে প্রতি বছরই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে চলেছিল। যে-সকল তালিবে ইলম তার দরস থেকে উপকৃত হয়েছে তাদের পরিসর অনেক বিস্তৃত। উপমহাদেশের এমন কোনো অঞ্চল, এমন কোনো এলাকা নেই, যেখানে তার ছাত্রের উপস্থিতি নেই। একইভাবে এমন কোনো মাদরাসা নেই, যেখানে মুহাদ্দিসদের অধিকাংশের মধ্যে তার ছাত্র নেই। ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমবিশ্বে আজ যেমন দারুল উলূমের অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনই হযরত মাদানী রহ.-এরও অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ইলমী ফয়েয ও জ্ঞানপ্রবাহ ছড়ানোর ক্ষেত্রে।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃত্বদান

হযরত মাদানী রহ. ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সত্যিকারের উত্তরসূরি। হযরত নানুতবী রহ. ও শায়খুল হিন্দ রহ.-সহ অন্যান্য আকাবিরে দ্বীনের স্বপ্ন পূরণে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভরপুর অংশগ্রহণ করেছেন এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্ল্যাটফর্ম থেকে মুসলিম জনসাধারণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন।

দেশকে ইংরেজশাসনের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে গিয়ে

তিনি যে কুরবানি পেশ করেছেন, যে জেল-জুলুম বরদাশত করেছেন এবং আন্তরিকতা ও অবিচলতার যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার বদৌলতেই আজ উম্মতে মুসলিমাহ এই ভূখণ্ডে গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে মাথা উঁচিয়ে মিথ্যা দাবিদারদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে এবং পারে দ্বীন, শরীয়ত, ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর শেষরাতের দুআ-প্রার্থনা, হযরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর অন্তরের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা এবং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা যে কর্মসূচী তৈরি করে দিয়েছিল, সেটারই বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য হযরত মাদানী রহ. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে স্বাধীনতার চেতনা ফুঁকে দেন এবং নিঃস্বার্থ ও বিশ্বস্ত সংগ্রামী হিসাবে দেশ ও ধর্মের অক্ষয় কীর্তি রচনা করেন। তার মাঝে যে বৈপ্লবিক চিন্তা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল তা প্রতিপক্ষরা পর্যন্ত স্বীকার করত নির্দ্বিধায়। দেশবিভাগ সম্পর্কে যেসব অশুভ ও অকল্যাণকর প্রভাবের কথা তিনি আপন বয়ান-বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলেন, তা আজ সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

সর্বব্যাপী এক ব্যক্তিত্ব

শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ. এমনই গুণাধার ব্যক্তি ছিলেন যে, যুগপৎ তার মাঝে সমাবেশ ঘটেছিল আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা, মুজাহিদের বীরত্ব ও অবিচলতা এবং মুরশিদের আকর্ষণ ও সর্বজনপ্রিয়তার ন্যায় সকল স্তুতিযোগ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা, দীক্ষা, রচনা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে হযরতের কর্মচঞ্চল তৎপরতা অর্ধ শতাব্দীব্যাপী। মদীনা মুনাওয়ারা, কলকাতা আলিয়া মাদরাসা, সিলেট ও আসামের মাদরাসা বাদে কেবল দারুল উলূম দেওবন্দেই চার হাজারের অধিক তালিবে ইলম তার জ্ঞানপ্রদীপ থেকে আলো গ্রহণ করেছে। আকীদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, আখলাক-চরিত্রের পবিত্রতা এবং নফস ও আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য লক্ষাধিক সত্যান্বেষী তার থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছে, যাদের মধ্যে দেড়শোরও অধিক রয়েছেন এমন ব্যক্তি, যারা ইহসান ও সুলুকের মানযিল অতিক্রম করে ইজাযত ও খেলাফত লাভেরও সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

সমাজের শোধন-সংস্কার ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য এই বিরাট-বিস্তৃত দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে বেড়ানো, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর হাজার হাজার বয়ান-বক্তৃতা পেশ করা এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মক্তব-মাদরাসার তত্ত্বাবধান করা হযরতের অমর কীর্তি ও অবদানের উজ্জ্বল সব শিরোনাম।

বিজয়, স্বাধীনতা ও জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তদানীন্তন সময়ের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। রাজনীতির তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরে আপন জাহাজ ভাসিয়েছেন, কিন্তু এমন বিচক্ষণতার সাথে যে, তার ছিটাফোঁটাও নিজ কাপড়ে লাগতে দেননি। ধর্ম ও রাজনীতিকে একসাথে নিয়ে চলেছেন, কিন্তু এমন দূরদর্শিতার সঙ্গে যে, উভয়ের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে একমুহূর্তের জন্যও বেখবর হননি। অনেক সময় পুরো দিন কেটে যেত ট্রেন, তাঙ্গা ও গরুর গাড়িতেই এবং রাতের সিংহভাগ সময় পার হয়ে যেত জলসা, ওয়াজ-নসীহত কিংবা পাঠদানেই। কিন্তু শেষরাতে রবের দরবারে আহাযারি-রোনাযারি ও আকুতিমিনতি পেশ করার প্রিয় আমলে কখনো ছেদ পড়তে দিতেন না তিনি।

এসব বিচিত্র কর্মব্যস্ততার মাঝেও হযরত মাদানী রহ. ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মূল্যবান পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠিপত্র লিখেছেন, যাতে আয়াতের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, ঈমান-আকীদার বিশ্লেষণ, মাসআলা-মাসায়েলের বিবরণ এবং আত্মশুদ্ধি, রাজনীতি ও ইতিহাসবিষয়ক অমূল্য তথ্যভান্ডারের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যার সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতার সঙ্গে বলা যায়, 'মাকতুবাত' ও 'মালফুযাতের' দীর্ঘ ফিরিস্তিতে মাখদুম শায়েখ শরফুদ্দিন মুনাইরি রহ. (মৃ. ৭৮২ হি.), মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ সারহিন্দি রহ. (মৃ. ১০৩৪ হি.) ও শায়েখ হুসামুদ্দিন মাংকপুরি রহ. (মৃ. ৮৫৩ হি.)-এর মাকতুবাতসমগ্রের পর শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ.-এর মাকতুবাত প্রভাব, ফলপ্রসূতা, তথ্যপ্রাচুর্য ও সর্বব্যাপিতায় অন্যসকলকে ছাড়িয়ে গেছে। অথচ তার এই মাকতুবাত ও চিঠিপত্র তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত এবং বেশিরভাগই সফরে কিংবা জেলে থাকা অবস্থায় লিখিত। এ থেকেই কিছুটা অনুমান করা যায় তার উপস্থিত ইলম ও বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পর্কে। হযরতের স্বহস্তে লেখা আত্মজীবনী 'নকশে হায়াত' তো ভারতের স্বাধীনতা-ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণপুষ্ট দস্তাবেজ।

হযরত মাওলানা মাদানী রহ.-এর জীবনসত্তা ছিল অনিন্দ্য-সুন্দর বহু গুণ, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবচরিত্রের সংগমস্থল। তার ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিনয়নম্রতা ছিল উপমেয় ও দৃষ্টান্তযোগ্য। তার খাবারের দস্তরখান ছিল আগত লোকদের জন্য প্রশস্ত ও অবারিত। কমপক্ষে দশ-পনেরোজন মেহমান তো উপস্থিত থাকতই তার দস্তরখানে।

রচনাবলি

শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ.-এর রচনাবলির সংখ্যা তুলনামূলক কম। কেননা দরস-তাদরিস ও তাবলীগ-ইসলাহসহ রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার কারণে তিনি এদিকে খুব একটা মনোযোগ দিতে পারেননি। তবে পরিমাণে স্বল্প হলেও মানে অমূল্য রচনাবলি তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন, যা নিম্নরূপ :

- مکتوبات شیخ الاسلام (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম)
- نقش حیات (নকশে হায়াত)
- الشہاب الثاقب (আশ-শিহাবুস সাকিব)
- سلاسل طیبہ (সালাসিলে তইয়িবাহ)
- اسیر مالٹا (আসিরে মাল্টা)
- متحدہ قومیت اور اسلام (মুত্তাহিদাহ কওমিয়্যাত আওর ইসলাম)
- مودودی دستور کی حقیقت (মওদুদি দুস্তুর কি হাকিকত)
- ایمان و عمل (ঈমান ও আমল)
- خطبات صدارت (খুতুবাতে সদারত)
- الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحۃ (আল-খলীফাতুল মাহদী ফিল আহাদিসিস সহীহ)
- الحالۃ التعلیمیۃ فی الہند (আল-হালাতুল তালিমিয়্যাহ ফিল হিন্দ)
- بحوث فی الدعوۃ والفکر الاسلامی (বুহুস ফিত-দাওয়াত ওয়াল ফিকরিল ইসলামী)
- درس بخاری (দরসে বুখারী), সংকলক, মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহ আজমি।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

হযরত মাদানী রহ. মুহাররম ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাজের এক সফরে হার্টঅ্যাটাক বা হৃদাঘাতের শিকার হন। দেওবন্দে আনার পর ডাক্তারগণ রোগ শনাক্ত করেন। তারপর স্থানীয় ও বাইরের বিভিন্ন ডাক্তারের চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ডাক্তারি চিকিৎসার পরিবর্তে শুরু করা হয় ইউনানি চিকিৎসা। এতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ১০, ১১ জুমাদাল উলা ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ৩, ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত যথেষ্ট শান্ত ও স্বাভাবিক থাকেন। পরদিন সকালে হযরতকে বেশ প্রফুল্ল ও ফুরফুরে মেজাযে দেখা যায়। এর কিছুদিন পরের কথা। দুপুরবেলা আহার সেরে হযরত নিদ্রা যান। তিনটার দিকে যোহরের নামাযের জন্য জাগ্রত করতে গেলে দেখা যায়, তিনি ইহধান ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

রাত নয়টার দিকে হযরতের মরদেহ দারুল হাদীসে এনে রাখা হয় এবং মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরের শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ.-এর ইমামতিতে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ১২, ১৩ জুমাদাল উলা ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ৫, ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি রাতে ইলম ও মারেফতের এই খাজানাকে দাফন করা হয়। মাকবারায়ে কাসেমীয়াতে হযরতের কবর।

মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.

(জন্ম : ১৩০৫ হি./১৮৮৭ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৬৯ হি./১৯৪৯ খ্রি.)

হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের গর্বিত সন্তান এবং শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ.-এর আস্থাভাজন শাগরিদ। সুদীর্ঘকাল তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। কয়েক বছর সদর মুহতামিমের দায়িত্বও পালন করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন এবং 'শায়খুল ইসলাম' নামে বিখ্যাত ছিলেন। সেইসাথে ছিলেন পাকিস্তানের আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও শরয়ি আইনকমিটির সম্মানিত সভাপতিও।

হযরত উসমানী রহ. ছিলেন প্রখর মেধা, প্রতিভা ও মননশীলতার অধিকারী। হেকমতে কাসেমিয়্যা তথা কাসেমী প্রজ্ঞার সর্বোত্তম প্রতিনিধিত্বকারী। সেইসাথে বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় তথা মানতিক, ফালসাফা ও ইলমে কালামে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহে গভীর পাণ্ডিত্যেরও অধিকারী। ইলমী বিষয়সমূহ ছিল তার খুবই আত্মস্থ ও পরিচ্ছন্ন, যেন সবকিছুই তার নখদর্পণে। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর তরজমায়ে কুরআনের ওপর তাফসীরকেন্দ্রিক হাশিয়া ও *সহীহ মুসলিমের* আরবি শরাহ *ফাতহুল মুলহিম* হযরতের ইলমী গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের স্বচ্ছ দর্পণ।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. ১০ মুহাররম ১৩০৫ হিজরী মোতাবেক ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বিজনুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান উসমানী রহ.-এর সুযোগ্য সন্তান এবং দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ. ও দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম হযরত মুফতী আযিযুর রহমান

দেওবন্দী রহ.-এর ভাই।

সাত বছর বয়সে হাফেজ মুহাম্মদ আযিম দেওবন্দী সাহেবের কাছে পড়ালেখার বিসমিল্লাহ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন দেওবন্দী রহ.-এর কাছে ফারসি ভাষার কিতাবাদি পড়েন। ১০ রবিউস সানী ১৩১৯ হিজরী মোতাবেক ২৭ জুলাই ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে আরবি তালিমের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে দাখিলা নেন। হযরতের আরবিস্তরের উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ., হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল হাযরাবি রহ., হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ হাসান দেওবন্দী রহ., হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন শেরকোটি রহ. প্রমুখ।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা-সমাপন করেন ১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে।

ফারেগ হওয়ার পর প্রথমে মাদরাসা ফাতেহপুরি দিল্লিতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দে তাদরিসি খেদমত আঞ্জাম দেন। এরপর ১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে জামিয়া ইসলামীয়া ঢাবেলে গমন করেন এবং ১৩৫২ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর ইনতেকালের পর সেখানে শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন।

দারুল উলূমে শিক্ষকতা ও সদর ইহতেমামের দায়িত্ব

হযরত উসমানী রহ. ১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক নিয়োগ হন এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত উচ্চস্তরের বিভিন্ন কিতাবের দরস দেন। দারুল উলূমে হযরতের *সহীহ মুসলিমের* পাঠদান ছিল খুবই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। দেওবন্দে শিক্ষকজীবনের দীর্ঘ একটা সময় পার করার পর ব্যবস্থাপনাগত কিছু মতবিরোধের কারণে সেখান থেকে অব্যাহতি নেন এবং আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. ও হযরত মুফতী আযিযুর রহমান রহ. প্রমুখের সঙ্গে গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত সুরত জেলার জামিয়া ইসলামীয়া ঢাবেলে গমন করেন।

১৩৫৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. ও অন্যান্য আকাবির হযরতের নির্দেশে পুনরায় দারুল

উলূমে ফিরে আসেন এবং ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সদর মুহতামিম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় জামিয়া ইসলামীয়া ঢাবেলের সাথেও সম্পর্ক অটুট রাখেন।

গুণ ও বৈশিষ্ট্য

ইলম, অনুধাবন, দূরদর্শিতা, চিন্তা-গবেষণা ও সুবুদ্ধিমত্তায় আল্লামা উসমানী রহ. ছিলেন হিন্দুস্তানের স্বল্পসংখ্যক বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের অন্যতম। তিনি ছিলেন আহলে ইলমের গুণগ্রাহী, ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের প্রতিচ্ছবি, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী। তাওয়াজু, বিনয়নম্রতা ও বড়দের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা ছিল হযরতের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। গরিব-মিসকিনদের ভালোবাসতেন এবং তাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ও উদার আচরণ করতেন। যাহির-বাতিন ও ভেতর-বাহির ছিল তার এক ও অভিন্ন। হৃদয়ের আবেগ-উত্তাপ লুকিয়ে রাখা বা তার বিপরীত প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না তার। তাই কারও প্রতি খুশি হলে বাহ্যিকভাবে যেমন খুশি হতেন, আন্তরিকভাবেও খুশি হতেন। আর অসন্তুষ্ট হলে চেহারার রেখাচিত্রে সেটাও প্রকাশ করে দিতেন।

হযরত উসমানী রহ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান অবস্থা ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি রাখতেন। এজন্য সাধারণ-বিশিষ্ট সর্বমহলেই সমাদর পেত তার বক্তব্য ও রচনা। বড় বড় জলসায় উচ্চ রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের পর্যন্ত মনোযোগ ও আকর্ষণ ধরে রাখত তার আলেমসুলভ সাহিত্যপূর্ণ বয়ান-বক্তৃতা।

হযরতের স্বভাবপ্রকৃতিতে ছিল কানাআত ও অল্পেতুষ্টি এবং যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতার মাত্রা অত্যধিক। হায়দারাবাদ দাকানের পক্ষ থেকে পাঁচশ রুপি মাশোয়ারায় নিযামিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসাবে তলব করা হয়। কিন্তু তিনি যেতে প্রস্তুত হননি। পাকিস্তানেও সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেননি। স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে হিজরত করার পরও তিনি নিজস্ব কোনো বাড়ি বানাননি এবং ছেড়ে যাওয়া কারও ব্যক্তিগত বাড়িও আয়ত্তে নেননি। বরং সম্পদশালী এক ভক্তের বাড়িতেই বসবাস করেছেন এবং এই গরিবানা হালাতেই জীবনের তরি পার করেছেন।

রাজনৈতিক অবদান

হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. শায়খুল হিন্দের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কর্মী ও সহযোগী ছিলেন। রাজনীতিতে প্রথমে তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে ছিলেন। বেশ কয়েক বছর তার ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবেও ছিলেন। তাকে গণ্য করা হতো জমিয়তের প্রথম সারির নেতাবৃন্দের মধ্যে। অবশ্য ইতিপূর্বে খেলাফত কমিটিরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বলকান যুদ্ধের সময় তুর্কিদের জন্য চাঁদা কালেকশনেও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে অভিন্ন জাতীয়তা প্রশ্নে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সঙ্গে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি জমিয়ত থেকে বের হয়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং পরের বছর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। যার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি নিজেই। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সদস্যবৃন্দ সরাসরি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সীমান্ত ও সিলেট রেফারেন্ডাম। ১৯৪৬ সালে যখন ভারতের আইনপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন বঙ্গদেশ থেকে মুসলিম লীগের পক্ষে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। একইভাবে ভারতবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে পাকিস্তানের জাতীয় আইনপরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন।

দেশবিভাগ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ৬ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান-উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য দেওবন্দ থেকে করাচির উদ্দেশে রওনা হন। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে করাচিতে স্বাধীনতা-উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বাসিন্দা হয়ে যান।

হযরত মাওলানা পাকিস্তান আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ার পাশাপাশি শরয়ি আইনকমিটিরও সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তানের আইনকে যারা ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চাচ্ছিলেন তিনি তাদেরও প্রাণপুরুষ ছিলেন। ইসলামীকরণের এই পথে হযরতের প্রাথমিক প্রচেষ্টাসমূহের কামিয়াবি ও সফলতার সুফল এই ছিল যে, সেই প্রচেষ্টাসমূহকে পাকিস্তানের আইনি পরিভাষায় 'করারদাদে মাকাসিদ' বা মৌলিক প্রস্তাবনা বলা হয়।

পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার ওপর হযরতের ইলমী ও রাজনৈতিক অবদানসমূহের বিশেষ প্রভাব ছিল। বিশেষ করে আলেম ও চিন্তক

হিসাবে জনমনে ছিল তার অন্যরকম ভক্তি-শ্রদ্ধা। ধর্মীয় দিগ্‌নির্দেশনার পাশাপাশি তার রাজনৈতিক দিগ্‌নির্দেশনাও ছিল সর্বজনমান্য। ধর্মীয় বিষয়ে গভর্নমেন্টের কাছে তিনি ছিলেন বিশেষ উপদেষ্টার মর্যাদায়। এজন্য সকলেই তাকে 'শায়খুল ইসলাম' বলে ডাকত, যা ছিল ইসলামী সালতানাতে সাধারণত 'কাযিউল কুযাত' বা প্রধান বিচারপতির উপাধি।

ইলমী অবদান

আল্লামা উসমানী রহ. যুগপৎ যবান ও কলম উভয় অঙ্গনেই সমান পারদর্শী ছিলেন। যেমন উর্দু ভাষার উচ্চমার্গীয় সাহিত্যিক ছিলেন, তেমনই ছিলেন আকর্ষণীয় ও সম্মোহনী বক্তৃতার ঘোড়সওয়ার। বাগ্মিতা, বিশুদ্ধতা, সর্ববোধ্য দলিল উপস্থাপন, চিত্তাকর্ষক উপমার উল্লেখ, বয়ান ও বক্তৃতার শৈলী এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়াবলির দিক থেকে হযরতের রচনা ও বক্তৃতার আন্দায ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি অধিক পরিমাণে কাসেমী উলূম তুলে ধরেছেন। জীবনের শেষদিকে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. 'জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামীয়ার' প্রতিষ্ঠালগ্নে যে বক্তৃতা পেশ করেছিলেন, তা লেখার এবং মজলিসে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন হযরত উসমানী রহ.-ই।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর 'তরজমায়ে কুরআন'-এর ওপর লিখিত হযরত উসমানী রহ.-এর তাফসীরমূলক হাশিয়া ইলমী মহলে খুবই প্রসিদ্ধ। যা তার কুরআনের বিজ্ঞতা, তাফসীরের গভীরতা ও হৃদয়ছোঁয়া বর্ণনাধারার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই হাশিয়ার ব্যাপক উপকারিতা ও উপযোগিতার কারণেই ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে আফগানি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় প্রকাশনাবিভাগ থেকে আফগান সরকার প্রকাশ করে তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ এবং তাফসীরি হাশিয়ার ফারসি অনুবাদ। খোদ সউদি সরকারও 'বাদশাহ ফাহাদ একাডেমি, মদীনা মুনাওয়ারা' থেকে হাজার হাজার কপি প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এ ছাড়াও পশতু, বাংলা, হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে 'তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ' ও 'তাফসীরে উসমানী'।

হাদীসশাস্ত্রে হযরত উসমানী রহ.-এর অমূল্য রচনা 'ফাতহুল মুলহিম', যা হানাফী দৃষ্টিকোণ থেকে *সহীহ মুসলিমের* প্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ। কিতাবটি তিনি যুবক বয়সেই লিখতে চেয়েছিলেন। কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন, হাফেজ বদরুদ্দিন আইনি রহ. *সহীহ বুখারী*র ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখে হানাফীদের

পক্ষ থেকে তার হক আদায় করলেও হানাফী দৃষ্টিকোণ থেকে *সহীহ মুসলিমের* কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ তখন পর্যন্ত কেউ লেখেননি। তাই পরিশেষে তিনিই এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং 'ফাতহুল মুলহিম' নামে *সহীহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা শুরু করেন। মৃত্যু পর্যন্ত যার ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, গ্রন্থটির শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছার আগেই ঝরে পড়ে জীবনবৃক্ষের শেষ পাতাটি। তাই আর সম্ভব হয়নি এই অমূল্য কিতাবটির গ্রন্থনা পূর্ণ করা।[১] তারপরও সেই অসম্পূর্ণ গ্রন্থটিই হযরতের এমন অক্ষয় ও অমর কীর্তি হয়ে আছে, যা গোটা ইসলামী বিশ্বকে তার ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে পরিচিত করেছে এবং করে চলেছে।

'ইলমুল কালাম', 'আল-আকলু ওয়ান-নাকলু', 'ইজাযুল কুরআন', 'হিজাবে শরয়ি', 'আল-ইসলাম', 'আশ-শিহাব লি-রজমিল খাতিবিল মুরতাব' প্রভৃতি হযরতের অধিক আলোচিত গ্রন্থ। এ ছাড়া 'মাকালাতে উসমানী' নামে তার বিভিন্ন পুস্তিকার সংকলনও আত্মপ্রকাশ করেছে।

হযরত আল্লামা উসমানী রহ. ঔরসজাত কোনো সন্তান রেখে যাননি ঠিক, কিন্তু সুযোগ্য ছাত্রদের বিরাট এক কাফেলা রেখে গেছেন। যাদের অধিকাংশ দেওবন্দে আর কিছু অংশ ঢাবেলে হযরতের ছাত্রত্বের গৌরব অর্জন করেছেন। এ সকল ছাত্রের মধ্যে সমধিক পরিচিত ও আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলেন মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি রহ., মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী রহ., আবুল মাআসির মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমী রহ., মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলবী রহ. ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরি রহ.।

পরকালযাত্রা

হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ. শিক্ষামন্ত্রীর আবেদনে ভাওলপুর তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন জামিয়া আব্বাসিয়ার সংস্কার ও উন্নয়নবিষয়ক পরমর্শসভায় অংশগ্রহণের জন্য। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা, এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টা অসুস্থ থাকার পর ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। তারিখটি ছিল ২১ সফর ১৩৬৯ হিজরী মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ। ভাওলপুর থেকে হযরতের শবদেহ করাচিতে আনা হয় এবং ওয়াকি মুহাম্মদ আলী রোডের পাশেই সমাহিত করা হয়।

---

১. অবশ্য পরে এই মূল্যবান ব্যাখ্যাগ্রন্থটির বাকি অংশ সম্পন্ন হয়েছে আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা.-এর কলমে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে 'তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম' নামে।

হযরত মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী রহ.

(জন্ম : ১২৭৫ হি./১৮৫৮ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৪৭ হি./১৯২৮ খ্রি.)

হযরত মুফতী আযিযুর রহমান দেওবন্দী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ও প্রধান মুফতী, নায়েবে মুহতামিম, সুযোগ্য আলেমে দ্বীন ও সাহিবে নিসবত বুযুর্গ। দরস-তাদরিসের পাশাপাশি তিনি ফাতাওয়া-নাবিসির গুরুভার দায়িত্বও পালন করেছেন এবং দ্বীনী ও ইলমী মহলে দেওবন্দের দারুল ইফতাকে এনে দিয়েছেন বিপুল গ্রহণযোগ্যতা। 'ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে প্রকাশিত দলিলসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি হযরতেরই ফাতাওয়াসমূহের মূল্যবান সংকলন, তাকরার ও পুনরুক্তি বাদ দেয়ার পর যা ১৮ খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছে। বস্তুত তিনি ছিলেন ইলম, আমল, ফিকহ, মারিফাত, আখলাক-চরিত্র, দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও স্বভাবযোগ্যতার ক্ষেত্রে অতুল ব্যক্তিদের অন্যতম, যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতার শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর জন্ম ১২৭৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক নাম যফরুদ্দিন। পিতা মাওলানা ফযলুর রহমান উসমানী রহ., যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। ১২৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন দারুল উলূমে হিফয বিভাগ চালু করা হয় তখন তাকে এই বিভাগে ভর্তি করা হয়। ১২৮৫ হিজরীর শাবানে তিনি ১৫ পারার হিফয পরীক্ষা দেন এবং ১২৮৭ হিজরীতে পুরো কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেন। ওই সময় হিফয বিভাগের উস্তাদ ছিলেন হাফেজ নামদার খান সাহেব রহ.।

হিফয শেষ করার পর জামাত বিভাগে ভর্তি হন এবং ১২৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে *সহীহ বুখারী*, *সহীহ মুসলিম* ও *শরহে*

আকায়িদের পরীক্ষা দিয়ে দারুল উলূম থেকে ফারেগ হন। এ সময় দারুল উলূমে সুপ্রসিদ্ধ যে-সকল আসাতিযায়ে কেরাম ছিলেন তারা হলেন, হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী, হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী এবং হযরত মাওলানা আবদুল আলী রহিমাহুমুল্লাহ।

১২৯৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে 'দস্তারে ফযিলতের' জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে তিনি সনদ ও পাগড়ি গ্রহণ করেন হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর হস্ত মোবারক থেকে।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষাসমাপনের পর দারুল উলূমেই মুইনে মুদাররিস হিসাবে শিক্ষক-জীবন শুরু করেন। সেইসাথে ফাতাওয়া লেখার গুরুদায়িত্বও আঞ্জাম দিতে থাকেন। এরপর তাকে মিরাঠে পাঠানো হয়। এখানে মাদরাসায়ে ইসলামীয়া আন্দারকোটে বেশ কবছর দরস-তাদরিসে নিরত থাকেন। এরপর ১৩০৯ হিজরীতে আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ তাকে দারুল উলূমের ভাইস প্রিন্সিপালের পদে মনোনীত করেন এবং এক বছর পর মুফতী ও মুদাররিস হিসাবে নিয়োগ দেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের ১৩৩৩ হিজরীর কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে :

> মাওলানা আযিযুর রহমান সাহেব শিক্ষা সমাপনের পর মুইনে মুদাররিস হিসাবে দারুল উলূমে পাঠদান করেন এবং হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে ফাতাওয়া লেখার দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় আধ্যাত্মিক সাধনার প্রেরণা জাগ্রত হলে নকশেবন্দিয়া তরীকায় হযরত মাওলানা রফী উদ্দীন রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন এবং কয়েক বছর রিয়াযত-সাধনার পর ইজাযত লাভ করেন। দেওবন্দে 'মুইনে মুদাররিস' হিসাবে দায়িত্ব পালন করার পর মিরাঠস্থ আন্দারকোটের মাদরাসায়ে ইসলামীয়ায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি দ্বিতীয়বার হজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হন এবং আল্লাহর তাওফীকে তা সম্পাদনও করেন।
>
> হজের সফরে হজ করার পাশাপাশি তার বাসনা ছিল শায়খুল মাশায়েখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর খেদমতে থাকার। এই সফরে তিনি দেড় বছর ব্যয় করেন এবং হাজী সাহেব রহ.-এর ইজাযতও লাভ

করেন। হজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন ১৩০৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে, আর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৩০৭ হিজরীর সফর মাসে। পরিশেষে ১৩০৯ হিজরী মোতাবেক ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তাকে মিরাঠ থেকে দেওবন্দে আনা হয়। তখন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দারুল উলূম দেওবন্দেই তিনি খেদমতে নিরত আছেন।

মুফতীর ভাবগম্ভীর আসনে

বাহির থেকে দ্বীনী-ইলমী প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা একের পর এক লাগাতার আসার কারণে ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে দারুল ইফতার উদ্বোধন করা হয় এবং ফাতাওয়া লেখালেখির দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা হয় মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী রহ.-কে। যা তিনি অত্যন্ত নিখুঁত ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। সহজ ও সাধারণ জিজ্ঞাসা তো বটেই, মতানৈক্যপূর্ণ বিভিন্ন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার জবাবও তিনি লিখে দিতেন স্বচ্ছন্দে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এজন্য কিতাব দেখারও প্রয়োজন পড়ত না তার।

হযরত প্রায় চল্লিশ বছর দারুল ইফতার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময় তিনি এমন এমন কঠিন ও জটিল ফাতাওয়াও লিখেছেন, যা নিছক ফাতাওয়াই নয়; বিতর্কিত জটিল বিষয়ে বিচারিক ফয়সালারও মান রাখে। অথচ এমন কঠিন ও জটিল ফাতাওয়াও তিনি লিখে দিতেন অল্প কয়েক শব্দেই। সফরে থাকা অবস্থায়ও হযরতের সঙ্গে দারুল ইফতার জিজ্ঞাসামূলক চিঠিপত্র থাকত। ফিকহী নুসুসও ছিল প্রায় মুখস্থ। তাই সফরের হালতেও কিতাবপত্রের প্রতি রুজু করা ছাড়াই স্বচ্ছন্দে ফাতাওয়া লিখতেন এবং এ ক্ষেত্রে বড় দক্ষতা ও যোগ্যতারও স্বাক্ষর রাখতেন। হযরত রহ.-এর ফাতাওয়ার বড় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত হওয়ার সাথে সাথে তার ভাষা হতো খুবই সহজ-সরল ও সর্বসাধারণের বোধগম্য। যা তদানীন্তন সময়ে অন্য কারও ফাতাওয়ার মাঝে দেখা যেত না।

মুফতী সাহেব রহ. যুগ-জিজ্ঞাসা ও সময়ের চাহিদার প্রতি কখনো নির্লিপ্ত থাকতেন না। বরং এই বিষয়ে ছিল গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী দুটি মত থাকলে তিনি সহজ মতটি গ্রহণ করতেন এবং সেই অনুসারেই ফাতাওয়া দিতেন। সুযোগ থাকলে কখনো এমন কোনো মত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না যা জনসাধারণের জন্য সমস্যা ও জটিলতার কারণ

হতে পারে। তার লিখিত ফাতাওয়া সম্ভারের মধ্যে এর বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। হিন্দুস্তানে এবং হিন্দুস্তানের বাইরে এই ফাতাওয়াসমূহকে মনে করা হয় মুসলমানদের আকীদা, ইবাদত ও মুআমালার ক্ষেত্রে শেষকথা ও চূড়ান্ত মীমাংসা।

ইসলামী শরীয়তে ফাতাওয়া লেখালেখির দায়িত্ব বড় নাযুক ও সংবেদনশীল। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে তাতে যে জটিলতা সৃষ্টি হয় তা কেবল হযরত উলামায়ে কেরামই বুঝতে পারেন। এই গুরুভার দায়িত্ব ইসলামের সর্বযুগেই পালিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা পালনে হযরত মুফতী সাহেব রহ. যে কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা খুব কমই পরিলক্ষিত হয় অন্যদের মাঝে। ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যেসব ফাতাওয়া লিখেছেন দুঃখজনকভাবে তার রেকর্ড সংরক্ষিত নেই, তাই তার সংখ্যাও জানা নেই। তবে ১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যে পরিমাণ ফাতাওয়া লিখেছেন তার সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজারেরও অধিক। এ সংখ্যাও কেবল সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসারে। সুতরাং বলাই বাহুল্য, রেকর্ডের বাইরেও তিনি যেসব ফাতাওয়া লিখেছেন সেগুলো গণনায় ধরলে প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়াবে আরও অধিক।

দারুল উলূম দেওবন্দের দীর্ঘকালীন মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর একটি সাধারণ পরিসংখ্যান অনুসারে, 'হযরত মুফতী আযিযুর রহমান সাহেব রহ. যেসব ফাতাওয়া লিখেছেন তার সংখ্যা প্রায় এক লাখ আঠারো হাজার।' তার এই অমূল্য অবদান নিঃসন্দেহে দ্বীনের বিরাট খেদমত। ১৩৩৩ হিজরী থেকে ১৩৪৬ হিজরী পর্যন্ত তার লিখিত ফাতাওয়াসম্ভারকে ফিকহী বিন্যাসে সাজিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ থেকে 'ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে আঠারো খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।

আখলাক-চরিত্র ও গুণ-বৈশিষ্ট্য

হযরত মুফতী সাহেব রহ. শুধু আলেম ও মুফতীই ছিলেন না, সেইসাথে ছিলেন আরিফ বিল্লাহ ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গও। বাইয়াত ও ইরশাদের পুণ্যধারাও চালু রেখেছিলেন স্বতন্ত্রভাবে। ফলে তার থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় ভারতবর্ষের

বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ। জ্ঞানগরিমার পাশাপাশি তাওয়াজু ও বিনয়নম্রতা ছিল হযরতের বিশেষ গুণ, যা সাধারণ থেকে সাধারণ বিষয়েও ফুটে উঠত খুবই ভাস্বর হয়ে।

হযরতের দৈনন্দিনের আমল এই ছিল যে, আসরের নামায পড়ে তিনি মহল্লার আশপাশের বাড়িতে যেতেন এবং দুয়ারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, বাজার থেকে আজ কারও কোনো সওদা আনার আছে কি? এরপর যারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা বলত তাদের পয়সা নিয়ে তিনি বাজারে যেতেন এবং একে একে সকলের ফরমায়েশি সওদা খরিদ করে আনতেন; কারও লবণ, কারও মরিচ, কারও ধনিয়া ইত্যাদি। এসব সামানা রুমালের প্রান্তে বেঁধে নিজেই নিয়ে আসতেন। অন্য কাউকে দিয়ে নিয়ে আসা পছন্দ করতেন না। অনেক সময় বোঝার ভারে তিনি ন্যুজ হয়ে যেতেন। কিন্তু তবুও অন্যের কাঁধে কিছু তুলে দিয়ে বোঝা হালকা করতে চাইতেন না। এরপর সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ফরমায়েশি সওদা পৌঁছে দিতেন।

মানবসেবা ও বিনয়নম্রতার এই মহৎ কর্ম সম্পাদনের সময় কখনো তার মাঝে এ চিন্তার উদয় হতো না যে, আমি জনসেবামূলক কোনো কার্য সম্পাদন করছি, স্ব-উদ্যোগে বড় কোনো কীর্তি আঞ্জাম দিচ্ছি, কিংবা বিরাট কোনো অবদান রেখে যাচ্ছি আত্মসংযম ও আত্মদমনের।

এই আমলি মুজাহাদা ও কর্মতৎপরতার সাথে ছিল তার মাঝে ইলম ও সূক্ষ্মদর্শিতা। ফাতাওয়া লেখালেখির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে দরস-তাদরিসের খেদমতও আঞ্জাম দিতেন। ফিকহ, হাদীস ও তাফসীর-বিষয়ক উচ্চাঙ্গের কিতাবের পাঠদান করতেন। বিরাট বিরাট গবেষণাকর্ম যা তারই চিন্তা-গবেষণার ফসল, কিন্তু কখনো সেগুলোকে নিজের বলে দাবি করতেন না এবং বলতেন না যে, এই মাসআলার ক্ষেত্রে আমার মত বা গবেষণা এই। বরং সম্ভাবনাজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করে আলোচনার মধ্যে বলতেন, মাসআলার একটি সুরত এটাও হতে পারে। অথচ সেটাই হতো তার গবেষণালব্ধ মত।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, পূর্বে তার ইলমী খেদমত ও বিনয়-বিনম্রতার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার এই অবস্থান অনেক উঁচু, অনেক বুলন্দ। কেননা এই অবস্থানে পৌঁছা সকলের সাধ্য হয় না যে, নিজেই নিজের জ্ঞানগর্ভ গবেষণা পেশ করবে,

আবার নিজেকে আড়ালও করে রাখবে। চূড়ান্ত পর্যায়ের এই আত্মদমন ও আত্মবিলোপের অবস্থানে কেবল সেই পৌছতে পারে যার অস্থিমজ্জায় ও শিরা-উপশিরায় বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে তাওয়াজু, বিনয় ও স্বভাবনম্রতা।

১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে অব্যাহতি নিয়ে জামিয়া ইসলামীয়া ঢাবেলে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দরস-তাদরিসের ধারা শুরু করেছিলেন। তখন হযরত মুফতী সাহেব রহ.-ও দারুল উলূম থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। পরের বছর ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব রহ. যখন অসুস্থ হয়ে দেওবন্দে তাশরীফ আনেন, তখন জামিয়া ইসলামীয়া ঢাবেলে *বুখারী শরীফ* খতম করতে বাকি ছিল চৌদ্দ পারা। কর্তৃপক্ষের উপর্যুপরি অনুরোধে হযরত মুফতী সাহেব রহ. ১৩৪৭ হিজরীর রবিউস সানিতে ঢাবেলে তাশরীফ নিয়ে যান এবং মাত্র দেড় মাসে *বুখারী শরীফের* অবশিষ্ট চৌদ্দ পারা খতম করেন।

আখেরাতের সফর

বুখারী শরীফের দরস সমাপ্ত করার পর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪৭ হিজরীর জুমাদাস সানীতে দেওবন্দের উদ্দেশে রওনা হন এবং পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। দেওবন্দে পৌছার পর চিকিৎসা শুরু হলেও সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে অসুস্থতাই বাড়তে থাকে। পরিশেষে ১৭ জুমাদাস সানী ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের রাতে প্রতিশ্রুত সময় এসে উপস্থিত হয়। হযরত মুফতী সাহেব রহ. মৃত্যুর ডাকে লাব্বাইক বলে পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পরেরদিন হযরতের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাকবারায়ে কাসেমীতে কবরস্থ করা হয়।

হযরত মাওলানা ইজায আলী আমরুহি রহ.

(জন্ম : ১৩০০ হি./১৮৮২ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৭৪ হি./১৯৫৫ খ্রি.)

হযরত মাওলানা ইজায আলী আমরুহি রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের অতিসুযোগ্য একজন ছাত্র। যিনি পরবর্তী সময়ে 'শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন এবং আরবি ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ ও পাদটীকা রচনা করেছেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তার বিশেষ রুচি ও স্বভাব-আকর্ষণ। দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি হাদীসের উস্তাদ, প্রধান মুফতী ও সহকারী শিক্ষাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আপন জ্ঞানগত ও প্রশাসনিক যোগ্যতাবলে দারুল উলূমের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

প্রাথমিক অবস্থা

পহেলা মুহাররম ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ১০ নভেম্বর ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। হযরতের পিতা জনাব মুহাম্মদ মিজায আলী সাহেব আমরুহার অধিবাসী ছিলেন আর চাকরিসূত্রে বাদায়ুনে বসবাসকারী ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন শাহজাহানপুরে, যেখানে তার পিতা বদলি হয়েছিলেন এবং এখানেই হিফয সমাপ্ত করেন। এরপর সিতাপুর জেলার 'গুলশানে ফয়েয' মাদরাসার সদর মুদাররিস মাওলানা মাকসুদ আলী খানের কাছে *শরহে জামি* পর্যন্ত পড়েন এবং শাহজাহানপুরের 'আইনুল ইলম' মাদরাসায় মাওলানা বশির আহমদ সাহেব ও মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের কাছে আরও কিছুদূর পর্যন্ত পড়েন। তারপর মিরাঠের কওমি মাদরাসায় মাওলানা আবদুল মুমিন দেওবন্দী ও মাওলানা আশেক ইলাহি মিরাঠির কাছে কিছু কিতাবের তালিম হাসিল করেন।

সর্বশেষ উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন দারুল উলূম দেওবন্দে। এখানে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কাছে *হেদায়া*, *আবু দাউদ*, *তিরমিযী* ও *বুখারী*র দরস গ্রহণ করেন, হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল হাজরাবি

ও হযরত মুফতী আযিযুর রহমান সাহেবের কাছে ফুনুনের সকল কিতাব পড়েন এবং মাওলানা সাইয়েদ মুইয্‌যুদ্দিন সাহেবের কাছে গ্রহণ করেন আরবি আদবের সকল কিতাবের পাঠ।

১৩২১ হিজরী মোতাবেক ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নির্দেশে বিহারের ভাগালপুর জেলার পুরিনিতে 'মাদরাসায়ে নুমানী'-তে তাশরীফ নিয়ে যান। প্রায় সাত বছর পর্যন্ত এখানে দরস-তাদরিসের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর শাহজাহানপুর গমন করেন এবং একটি মসজিদে 'আফযলুল মাদারিস' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসায়ও প্রায় তিন বছর পর্যন্ত সফলতার সাথে শিক্ষার আলো ছড়াতে থাকেন।

দারুল উলূমে পদার্পণ

১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন। প্রথম বছর আরবি শ্রেণির প্রাথমিক কিতাব তথা *ইলমুস সিগা*, *নুরুল ইযাহ* ইত্যাদির পাঠ দান করেন।

দারুল উলূমের কার্যবিবরণীতে হযরত সম্পর্কে লেখা আছে :

> মধ্যবর্তী ও শেষ স্তরের মাঝামাঝি সময়ে যারা দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন, মাওলানা ইজায আলী সাহেব তাদের অন্যতম। দেওবন্দে পদার্পণের আগে তিনি বেশ কিছু জায়গায় শিক্ষকতা করেছেন। তিনি নেককার, পরহেজগার ও যোগ্যতাসম্পন্ন একজন তরুণ আলেম। সুরত ও সিরাত উভয় দিক থেকে আকাবির-আসলাফের স্মৃতিচিহ্ন। বিভিন্ন শাস্ত্রে যোগ্যতা রাখার পাশাপাশি আরবি সাহিত্যে রাখেন সবিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য। সম্প্রতিই তিনি 'দেয়ানে হামাসার' পাদটীকা রচনা করেছেন। 'কানযুদ দাকায়িক'-এর পাদটীকা লিখে চলেছেন। ইতিপূর্বে 'দেয়ানে মুতানাব্বির' পাদটীকা সমাপ্ত করেছেন। তিনি দারুল উলূমে মাধ্যমিক শ্রেণিগুলোতে দরস দেন। সাহিত্য-সম্পর্কিত অধিকাংশ দরস তারই যিম্মাদারিতে। সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী হওয়ায় ছাত্রদের আরবি লেখার মশকও করান এবং ছাত্রদের সঙ্গে অমায়িক আচরণ করেন। ফলে ছাত্ররা তার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ।

১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে যখন হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ. হায়দারাবাদের 'মুফতী আযম' পদে নির্বাচিত হন, তখন বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে তিনি হযরত মাওলানা ইজায আলী সাহেব রহ.-কে সঙ্গে নিয়ে যান। মাওলানা ইজায আলী সাহেব রহ. হায়দারাবাদে একবছর অবস্থান করেন। তারপর আবার হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর সঙ্গেই দেওবন্দে চলে আসেন।

১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান সাহেব রহ.-এর পর তিনি দারুল উলূমের ইফতা বিভাগে প্রধান মুফতীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং একবছর পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। তারপর ১৩৬৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার উক্ত পদে আসীন হন এবং দুবছর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান মুফতী হিসাবে তিনি যে দুই সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন সেই সময়ে লিখিত ফাতাওয়ার সংখ্যা চব্বিশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন।

ফিকহ ও আদব ছিল হযরতের বিশেষ শাস্ত্র। যাতে তার দক্ষতা, পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনবিদিত। শুরুতে যখন দারুল উলূম দেওবন্দে আসেন, তখন তাকে আরবি শ্রেণির প্রাথমিক কিতাব, যেমন *নুরুল ইযাহ, ইলমুস সিগাহ* প্রভৃতি কিতাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার দরস-তাদরিস এমনই গ্রহণযোগ্যতা ও সর্বজনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, তিনি 'শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ' উপাধিতে বিখ্যাত হন। জীবনের শেষদিকে কয়েক বছর *সুনানে তিরমিযী*র দরস দিয়েছেন এবং তাফসীরের উঁচুস্তরের কিতাবাদিও পড়িয়েছেন। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর অনুপস্থিতিতে কয়েকবার *সহীহ বুখারী*রও দরস দিয়েছেন। তালিম ও শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের তরবিয়ত ও দীক্ষার প্রতিও ছিল তার বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ। এতে ছাত্ররা বিপুল পরিমাণ উপকৃত হয়েছে। এজন্যই হযরতের শাগরিদগণ আজও হযরতের কথা বলেন এবং হযরতের গুণকীর্তন করেন।

সময়ানুবর্তিতা ও ক্লাসের সময় মেনে চলার ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা ইজায আলী সাহেব রহ. ছিলেন তুলনারহিত প্রবাদপুরুষ। দারুল উলূমের বহু উস্তাদ পর্যন্ত সময়ানুবর্তিতা ও ক্লাসের টাইম মেইনটেইন করার সবক গ্রহণ করেছেন শায়খুল আদব রহ. থেকে। শিক্ষকজীবনের শুরু থেকে নিয়ে জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তিনি মিনিট ও সেকেন্ড পর্যন্তও হিসাব করে চলেছেন।

তাওয়াজু, বিনম্রতা ও আত্মবিলোপের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য ও অতুলনীয়। বড় বড় কিতাবের দরস দেয়ার পাশাপাশি ছোট ছোট কিতাবের দরস দিতেও কখনো সংকোচবোধ করতেন না। তাই তো একদিকে যেমন *সহীহ বুখারী* ও *সুনানে তিরমিযীর* মতো বৃহৎ কিতাব পড়াতেন, তেমনই অপরদিকে *মিজানুস সরফ, ইলমুস সিগাহ* ও *নুরুল ইযাহর* মতো তুলনামূলক ছোট ছোট কিতাবও পড়াতেন, নির্মল ও প্রসন্নচিত্তে। হযরতের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র বলে বিবেচিত হতো সেই ছাত্র, যে একনিষ্ঠ মনে পড়ালেখায় মশগুল থাকত এবং সবচেয়ে অপ্রিয় ছাত্র হিসাবে বিবেচিত হতো সেই ছাত্র, যে পড়াশোনার বাইরে মন দিয়ে পড়াশোনায় উদাসীন থাকত। চাই সে তারই সন্তান হোক না কেন।

প্রশাসন ও পরিচালনাগত বিষয়েও হযরত শায়খুল আদব সাহেব রহ.-এর যোগ্যতা ছিল স্বীকৃত। তাই মাঝেমধ্যে তাকে ইহতেমামের দায়িত্ব অর্পণ করে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার সুফল গ্রহণ করা হতো। এককথায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় শিক্ষক, জ্ঞানগভীর আলেম ও গুণাধার ব্যক্তিত্ব। দারুল উলূমে যার ইলমী খেদমতের পরিধি ৪৪ বছরে বিস্তৃত।

রচনাবলি

শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইজায আলী রহ. আরবি গদ্য ও পদ্যসাহিত্যে যেমন সুযোগ্য ছিলেন, তেমনই উর্দু গদ্য ও পদ্যসাহিত্যেও ছিলেন সুবিজ্ঞ। উর্দু গদ্যে তার স্বতন্ত্র ধারা ছিল এবং চমৎকার কাব্যরুচি ছিল। হযরতের বিভিন্ন আরবি কাসিদা দারুল উলূমের মুখপত্র মাসিক *আল-কাসিমে* প্রকাশিত হয়েছে এবং বিচিত্র আরবি-ফারসি কিতাব ও হাশিয়াও আত্মপ্রকাশ করেছে। তা ছাড়া বেশ কিছু কিতাবের উর্দু অনুবাদও বের হয়েছে। বিস্তারিত তালিকা নিম্নরূপ :

- 'নাফহাতুল আরব' যা 'নাফহাতুল ইয়ামান'-এর মান অনুসারে রচিত এবং গল্পকাহিনি ও চারিত্রিক বিষয়াবলি সন্নিবেশিত। কিতাবটি বিভিন্ন মাদরাসায় নিসাবভুক্ত।
- মোল্লা আলী কারি কৃত 'শরহুন নিকায়া'-এর পাদটীকা 'মাহমুদুর রিওয়াহ'।
- মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী রহ. কৃত 'কাসিদায়ে লামিয়াহ'-এর অনুবাদ।

- আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ. কৃত 'কিতাবুয যাওয়াজির'-এর অনুবাদ।
- *দেয়ানে হামাসার* ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
- *দেয়ানে মুতানাব্বির* পাদটীকা।
- *কানযুদ দাকায়িকের* পাদটীকা।
- *নুরুল ইযাহর* ফারসি পাদটীকা।
- *নুরুল ইযাহর* আরবি পাদটীকা।
- *কুদুরির* আরবি পাদটীকা।
- *শামায়েলে তিরমিযীর* পাদটীকা।
- *তালখিসুল মিফতাহ*-এর পাদটীকা।
- *উরুযুল মিফতাহ*-এর পাদটীকা।
- *মুফিদুত তালিবিন* ইত্যাদি।

অনন্তের পথে

হযরত মাওলানা ইজায আলী রহ. ১৪ রজব ১৩৭৪ হিজরী মোতাবেক ৮ মার্চ ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এই নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নেন এবং মাকবারায়ে কাসেমীতে সমাহিত হন।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী রহ.

(জন্ম : ১৩১৪ হি./১৮৯৬ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের বিশিষ্ট মুফতী ও আলেমে দ্বীন। তীক্ষ্ণ মেধা ও উপস্থিত বুদ্ধির পাশাপাশি ফিকহ ও আদবেও রাখতেন বিশেষত্ব। হিন্দুস্তানে থাকা অবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগে বেশ কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় তখন পাকিস্তানের আইনপ্রণয়ন-সভার ইসলামী শিক্ষাবোর্ডের সদস্য হিসাবে ইসলামী আইনবিন্যাসে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের মুফতী আযম উপাধিতে ভূষিত হন। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ইসলামী বিদ্যাপীঠ 'দারুল উলূম করাচি' হযরতের গলদঘর্ম চেষ্টা-মেহনতেরই সবুজ ফসল।

হযরত মুফতী শফী রহ. ১৩১৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখেন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.। দারুল উলূম দেওবন্দেই পুরো পড়াশোনা করেন এবং সেখান থেকেই ১৩৩৬ হিজরী মোতাবেক ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বাইশ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপন করেন। তার পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন দেওবন্দী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের ফারসি বিভাগের স্বীকৃত উস্তাদ এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর অন্যতম মুরিদ। বংশীয়ভাবেই তিনি দেওবন্দের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা সমাপনের পর ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূমের আসাতিযায়ে কেরাম ও দায়িত্বশীলগণ তাকে তার ইলম ও ইসতিদাদের ভিত্তিতে দারুল উলূমের ইবতেদায়ি শ্রেণির শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন। কিন্তু আপন প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে অতি অল্পসময়ের ব্যবধানে তিনি শিক্ষকতার একেকটি ধাপ অতিক্রম করে উচ্চস্তরের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৩৫০ হিজরী মোতাবেক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে মুফতীর পদে আসীন করা হয় এবং তার সুযোগ্যতার ভিত্তিতে তাকে দারুল উলূমের প্রধান মুফতী নির্বাচন করা হয়। এ সবই ছিল তার যোগ্যতা, পারদর্শিতা ও ইলমী পরিপক্বতার সুফল। উপরিউক্ত পদে তিনি দুবার আসীন হয়েছেন। প্রথমবার ১৩৫০ হিজরী মোতাবেক ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার ১৩৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৬১ হিজরী মোতাবেক ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তার সময়ে প্রায় ছাব্বিশ হাজার ফাতাওয়া লেখা হয়েছে। ফাতাওয়া লেখালেখির পাশাপাশি দারুল উলূমের উচ্চশ্রেণিতেও তিনি বিভিন্ন কিতাবের দরস দিতেন।

হযরত মুফতী শফী রহ. প্রথমে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন। শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইনতেকালের পর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী রহ.-এর কাছে রুজু করেন। হযরতের ইলম ও ফযল, জ্ঞান ও গুণের ওপর হযরত থানভী রহ. খুবই আস্থাশীল ছিলেন। তাই ইজাযত ও খেলাফত দ্বারাও কৃতার্থ করেন তাকে। হযরত মুফতী শফী রহ. যাহেরি ইলমের পাশাপাশি বাতেনী ইলমেও পূর্ণতা ও পরিপক্বতা অর্জন করেছিলেন। ফলে তার ভক্ত-অনুরক্তদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। যারা মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত থেকেছেন। হযরত মুফতী সাহেব রহ. তার গোটা জীবন কাটিয়েছেন পঠনপাঠন, গ্রন্থরচনা ও আধ্যাত্মিকতার কল্যাণপ্রবাহে।

পাকিস্তানের ভূমিতে

দেশভাগের পর হযরত মুফতী শফী রহ. পাকিস্তানের জাতীয়তা গ্রহণ করেন এবং ১৩৬৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে দেওবন্দ থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশে হিজরত করেন। এরপর আমৃত্যু পাকিস্তান ভূখণ্ডের ইসলামী পরিচয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। পাকিস্তানের আইনসভার ইসলাম শিক্ষা বোর্ডের সদস্য হিসাবে ইসলামী সংবিধান বিন্যস্ত করার কাজেও সহায়তা করেন। ১৯৫১ সালে দারুল উলূম নামে করাচিতে একটি দ্বীনী মাদরাসা কায়েম করেন, যা বর্তমান করাচিতে ইসলামী শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। এইসবের পাশাপাশি ফিকহ ও ফাতাওয়ার ওপরও তিনি এত বিরাট ও ব্যাপক কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দেন, যা সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন একদল মানুষের। এই ইলমী অবদানের কারণেই হযরতকে পাকিস্তানে 'মুফতী

আযম পাকিস্তান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে, সত্যিকারার্থেই যা ছিল তার শায়ানে শান।

বস্তুত হযরত মুফতী সাহেব রহ. পাকিস্তানে দেওবন্দী মাসলাকের বড় একজন ভাষ্যকার ও মুখপাত্র ছিলেন। দারুল উলূমের অমূল্য রত্ন ও সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। অধিকন্তু সহজাত গুণ-বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার কারণে সকলের কাছেই ছিলেন বিশ্বস্ত ও আস্থাযোগ্য।

হযরত মুফতী সাহেবের ইলমী ফয়েয

হযরত মুফতী সাহেব রহ. অসংখ্য ছাত্র রেখে গেছেন, যারা উপমহাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। হযরতের ইলম ও জ্ঞানের পরিধি ছিল খুবই গভীর ও বিস্তৃত। ইলমে দ্বীনের প্রচলিত ও প্রথাগত প্রায় সকল বিষয়েই দক্ষতা রাখতেন।

তিনি বহু গ্রন্থ-প্রণেতাও। লেখালেখির আগ্রহ ছিল সেই শুরু থেকেই। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও মোনাযারার ওপর বহু মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন, যা সাধারণ-বিশিষ্ট সকলের জন্যই অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। কাব্য ও কবিতারও অভিরুচি ছিল ছাত্রজীবন থেকে। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় অত্যন্ত চমৎকার সব কাসিদা, শোকগাথা ও ঘটনা-আশ্রিত কবিতা রচনা করেছেন, যার সংকলনও আত্মপ্রকাশ করেছে। শেষজীবনে 'তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন' রচনা করে তাফসীরশাস্ত্রে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। এই একটিমাত্র অবদানই যদি তিনি উপহার দিতেন তবুও সেটা যথেষ্ট ছিল তার গৌরব ও মর্যাদা এবং আল্লাহর কাছে মাকবুল হওয়ার জন্য।

রচনাবলি

হযরত মুফতী আযম রহ.-এর ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা দেড়শোরও অধিক। যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের নাম নিম্নরূপ :

- تفسیر معارف القرآن (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন) {৮ খণ্ডে}
- امداد المفتیین (ইমদাদুল মুফতিয়িন) {৮ খণ্ডে}
- جواہر الفقہ (জাওয়াহিরুল ফিকহ) {১০ খণ্ডে}

- احکام القرآن (আহকামুল কুরআন) {আংশিক}
- آلات جدیدہ کے شرعی احکام (আলাতে জাদিদাহ কে শরয়ি আহকাম)
- اسلام کا نظام اراضی (ইসলাম কা নিযামে আরাযি)
- قرآن میں نظام زکوۃ (কুরআন মে নিযামে যাকাত)
- احکام حج (আহকামে হজ)
- مسائل سود (মাসআলায়ে সুদ)
- تنقیح المقال فی تسہیل الاستقبال (তানহিকুল মাকাল ফি তাসহিহিল ইসতিকবাল)
- الارشاد فی بعض احکام الالحاد (আল-ইরশাদ ফি বাযি আহকামিল ইলহাদ)
- مقادیر شرعیہ دراوزان ہندیہ (মাকাদিরে শরইয়্যাহ দর আওযানে হিন্দিয়্যাহ)
- عائلی قانون پر مختصر تبصرہ (আয়েলি কানুন পর মুখতাসার তাবসিরাহ)
- ختم النبوۃ فی القرآن (খতমুন নবুওয়াহ ফিল কুরআন)
- ختم النبوۃ فی الحدیث (খতমুন নবুওয়াহ ফিল হাদীস)
- ہدایۃ المہدیین فی آیت خاتم النبیین (হিদায়াতুল মাহদিয়্যিন ফি আয়াতি খাতামুন নাবিয়্যিন)
- سیرت خاتم الانبیاء (সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া)
- آداب المساجد (আদাবুল মাসাজিদ)
- آداب النبی (আদাবুন নাবী)
- نجات المسلمین (নাজাতুল মুসলিমিন)
- مقام صحابہ (মাকামে সাহাবা)
- دستور قرآنی (দুস্তুরে কুরআনি)
- چند عظیم شخصیات (চান্দ আযিম শখসিয়্যাত)
- فتوح الہند (ফুতুহুল হিন্দ) প্রভৃতি।

দারুল উলূম করাচি

হযরতের সবচেয়ে বড় ইলমী স্মারক হচ্ছে দারুল উলূম করাচি। যা খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলামী বিশ্বে দ্বীনের সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত হয়েছে এবং পরিণত হয়েছে ইলমের তালিব ও দ্বীনের দায়িদের প্রাণকেন্দ্রে। বিরাট সীমানা, বিভিন্ন শ্রেণি ও ব্যাপক কর্মযজ্ঞের বিবেচনায় দারুল উলূম করাচি সত্যিকারার্থে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে রূপ নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত হাজার হাজার আলেম, ফাযেল, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, আদিব ও ইসলামের মুবাল্লিগ উপহার দিয়েছে।

সুযোগ্য সন্তানবর্গের পিতৃত্ব

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ.-এর বড় একটি সৌভাগ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সুযোগ্য ও সুবিজ্ঞ আলেম সন্তানের পিতা বানিয়েছেন, যারা কেবল তার ইলমী উত্তরাধিকারই বাকি রাখেননি; বরং তার দীপ্তি ও সৌন্দর্যও বর্ধন করেছেন আরও বহুগুণ। হযরত মাওলানা মুফতী রফী উসমানী রহ. দারুল উলূম করাচির আমৃত্যু মুহতামিম ও বহু গ্রন্থের লেখক। হযরত মাওলানা মুফতী তকি উসমানী দা. বা. ইসলামী বিশ্বের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানের সুপণ্ডিত, ইসলামী অর্থনীতির স্বীকৃত ও আস্থাযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং বহুগ্রন্থের সফল লেখক। অন্য সন্তানরাও শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ আলেমের স্বাক্ষর রেখেছেন।

আল-বিদা

মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ১১ শাওয়াল ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ৬ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের রজনীতে ইনতেকাল করেন।

একনজরে তৃতীয় যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ

ক্র.	নাম	মৃত্যুসন	পদ
১	হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ.	১৪০৩ হি./ ১৯৮৩ খ্রি.	মুহতামিম
২	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম বালিয়াবী রহ.	১৩৮৭ হি./ ১৯৬৭ খ্রি.	সদরুল মুদাররিসীন
৩	হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী রহ.	১৩৯২ হি./ ১৯৭২ খ্রি.	শায়খুল হাদীস
৪	হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী রহ.	১৩৯৬ হি./ ১৯৭৬ খ্রি.	প্রধান মুফতী
৫	হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ.	১৪০১ হি./ ১৯৮১ খ্রি.	সদরুল মুদাররিসীন
৬	হযরত মাওলানা শরীফুল হাসান দেওবন্দী রহ.	১৩৯৭ হি./ ১৯৭৭ খ্রি.	শায়খুল হাদীস

হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব কাসেমী রহ.

(জন্ম : ১৩১৫ হি./১৮৯৭ খ্রি., মৃত্যু : ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.)

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ. ছিলেন আলেমে রব্বানী, অসাধারণ খতিব এবং দারুল উলূমের গৌরবান্বিত মুহতামিম। তিনি দারুল উলূমের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ.-এর পুত্র এবং দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর পৌত্র। একদিকে পিতামহ হযরত নানুতবী রহ.-এর জ্ঞানের সুবিশ্বস্ত ভাষ্যকার ছিলেন, অপরদিকে সুযোগ্য লেখকও ছিলেন। তদুপরি ছিলেন বহু গুণ-বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী।

হযরতের নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা-মেহনতের ফলে দারুল উলূম দেওবন্দ সুখ্যাতির শীর্ষচূড়া স্পর্শ করে এবং গোটা ইসলামী বিশ্বে 'আযহারুল হিন্দ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনিই মূলত দারুল উলূম ও তার কীর্তি-অবদানের সঙ্গে পরিচিত করেন এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা তথা গোটা বিশ্বকে। তার ইহতেমামের দায়িত্বপালনের সময়কাল হচ্ছে ৫৫ বছর, যা এ যাবৎকালের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়।

প্রাথমিক অবস্থা

১৩১৫ হিজরীর মুহাররম মোতাবেক ১৮৯৭ সালের জুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক নাম মুজাফফরুদ্দিন। সাত বছর বয়সে দারুল উলূমে ভর্তি হন। তার পাঠ-উদ্বোধনের জলসা অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট বুযুর্গানে দ্বীনের উপস্থিতিতে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে কিরাত ও তাজবিদসহ পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেন। পাঁচ বছর ফারসি, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ের পড়াশোনা সমাপ্ত করে আরবি শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারেগ হয়ে ফযিলতের সনদ লাভ করেন।

এই পুরো শিক্ষাজীবনে পিতা ও পিতামহের উচ্চ সম্পর্ক-বন্ধনের কারণে হযরত আসাতিযায়ে কেরাম থেকে বিশেষভাবে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। সেইসাথে যুগশ্রেষ্ঠ ও বিশ্ববিখ্যাত উলামায়ে কেরাম থেকে হাদীসের সনদ হাসিল করতেও সক্ষম হন।

হযরত কারী তৈয়্যব সাহেব রহ. ১৩৩৯ হিজরীতে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন এবং তাযকিয়া ও ইহসানের একেকটি ধাপ অতিক্রম করতে থাকেন। কিন্তু এরইমধ্যে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ইনতেকাল হলে ১৩৪৩ হিজরীতে তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর দিকে রুজু করেন এবং তারই তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করেন। ১৩৫০ হিজরীতে হযরত থানভী রহ. তাকে খেলাফত ও ইজাযত দ্বারা ধন্য করেন।

দারুল উলূমের সাথে দায়িত্বশীলতার সম্পর্ক

দারুল উলূম থেকে ফারেগ হওয়ার পর দারুল উলূমেই তিনি দরস-তাদরিসের পুণ্যধারা শুরু করেন। আপন জ্ঞানগরিমা, মেধা ও প্রতিভা এবং বংশীয় সম্পর্কের সুবাদে অতি অল্পসময়ের ব্যবধানেই তিনি ছাত্রদের প্রিয়পাত্র হয়ে যান। ১৩৪৪ হিজরী মোতাবেক ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে নায়েবে মুহতামিমের পদ অলংকৃত করেন, যাতে ১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল থাকেন। এ সময়ে পিতা হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব রহ. ও হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান রহ.-এর তত্ত্বাবধানে দারুল ইহতেমামের প্রশাসন ও পরিচালনাগত বিভিন্ন কার্যাবলিতেও অংশগ্রহণ করেন।

১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব রহ.-এর ইনতেকাল হলে তাকে পূর্ণাঙ্গ মুহতামিমের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পূর্ব-অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও উচ্চবংশীয় সম্পর্ক পূর্ব থেকেই এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, দারুল উলূমের মুহতামিম হওয়ার যোগ্যতা তার মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। মুহতামিম হওয়ার পর জ্ঞান, গুণ ও বংশীয় আভিজাত্যের কল্যাণে পুরো দেশের মধ্যে খুবই দ্রুত একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এতে দারুল উলূমের শ্রেষ্ঠত্বও ফুটে ওঠে এবং দারুল উলূম ব্যাপক প্রসিদ্ধিও লাভ করে।

হযরতের ইহতেমামের জামানায় দারুল উলূমের উল্লেখ করার মতো বিরাট উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮

খ্রিষ্টাব্দে যখন তিনি ইহতেমামের বাগডোর হাতে নেন তখন দারুল উলূমের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল আটটি, যার সংখ্যা তিনি পৌঁছে দেন বাইশের ঘরে। ওই সময় দারুল উলূমের বাৎসরিক আমদানি ছিল ৫০২৬২ রুপি, যাকে তিনি পৌঁছে দেন ২৬ লাখে। ১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূমের কর্মচারীর সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ, যাকে বর্ধিত করে নিয়ে যান দুইশোর ঘরে। ওই সময় শিক্ষকের সংখ্যা ছিল আঠারো, যা পর্যায়ক্রমে বেড়ে পৌঁছে যায় উনষাটের ঘরে। আর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৮০, যা উত্তরোত্তর বেড়ে পৌঁছে যায় দুই হাজারের ঘরে।

একইভাবে তার সময়ে বিল্ডিং ও ভবনের সংখ্যাও বাড়ে চোখে পড়ার মতো। দারুত তাফসীর, দারুল ইফতা, দারুল কুরআন, নতুন মাতবাখ, ফাওকানি দারুল হাদীস, মসজিদের ওপরতলা, বাবুয যাহের, নতুন জামিয়া তিব্বিয়া, দ্বিতলবিশিষ্ট দারুল ইকামা, মেহমানখানার পুরাতন ভবন, কুতুবখানার সুপ্রশস্ত কক্ষ, নতুন দারুল ইকামা, আফ্রিকি মানযিল ও বাড়তি তিনটি দরসগাহ—এ সবই হযরত রহ.-এর মুহতামিম থাকাকালে নির্মিত।

মোটকথা তার সময়ে দারুল উলূমের প্রতিটি শাখা ও বিভাগেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। তাই তো দারুল উলূমের মজলিসে শুরা ও ইনতেজামিয়া কমিটি বিভিন্ন সময় তার অসাধারণ কীর্তি ও অবদানের স্বীকৃতিপ্রদান ও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের আয়োজন করেছে। দারুল উলূমের প্রজ্বলিত প্রদীপকে দেদীপ্যমান করে রাখতে বার্ধক্যেও তিনি তারুণ্যের উদ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য দারুল উলূম কী কী খেদমত পেশ করেছে, তা জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এরই ফলে ইলমে দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা ছুটে আসতে থাকে এবং ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

কীর্তি ও অবদানসমূহ

দরস-তাদরিসের পাশাপাশি বয়ান-বক্তৃতার ক্ষেত্রেও হযরত কারী তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর মাঝে ছিল আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ যোগ্যতা এবং অসাধারণ বাকপটুতা। তাই সেই ছাত্রজামানা থেকেই উন্মুক্ত জলসায় শ্রোতাগণ অসীম আগ্রহ ও আকর্ষণ নিয়ে তার বয়ান-বক্তৃতা শুনত। জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দুই, তিন তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করে যাওয়া তার পক্ষে এতটুকু কষ্টের

ছিল না। শরয়ি বিধিবিধানের সুপ্ত রহস্য ও অজানা তথ্য তুলে ধরা এবং নতুন নতুন বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করার ক্ষেত্রেও ছিল অসাধারণ পারদর্শিতা। যার ফলে শ্রোতাবৃন্দ, বিশেষকরে আধুনিক শিক্ষিতসমাজ তার জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তৃতা শুনত মুগ্ধ ও অভিভূতচিত্ত নিয়ে।

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতেও ছিল তার বয়ান-বক্তৃতার বিপুল সমাদর ও গ্রহণযোগ্যতা। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে তার কিছু আলোচিত বক্তৃতা প্রকাশের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। দেশের এমন কোনো অঞ্চল নেই, এমনা কোনো এলাকা নেই যেখানো তার বক্তৃতার প্রতিধ্বনি পৌঁছেনি। হযরতের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া অগ্নিঝরা বয়ান ও বক্তৃতা যখন জ্ঞানের গভীর সমুদ্র অতিক্রম করত তখন তরঙ্গলহরীর নীরবতা হতো দেখার মতো। বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন সেমিনারে তিনি সেসব বক্তৃতা করেছেন তা থেকে নির্বাচিত ইলমী খুতবাসমূহ দশখণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছে।

হযরতের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বক্তৃতার ফলে ভক্ত ও অনুরক্তের একটি জামাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুস্তানের বাইরেও ইলমী মহলে তার বক্তৃতার সুপ্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৩৫৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হিজায সফরে গেলে সেখানে হিন্দুস্তানের একটি সম্মানিত প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসাবে বাদশাহ ইবনে সাউদের রাজদরবারে তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা বাদশাহকে চরমভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তো বাদশাহ খুশি হয়ে তাকে শাহি পোশাক ও বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ উপঢৌকনস্বরূপ দিয়েছিলেন।

১৩৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে হযরত কারী তৈয়্যব সাহেব রহ. আফগান সফর করেন, যা তার ইলমী সফরের স্বতন্ত্র ইতিহাস। দারুল উলূমের প্রতিনিধি হিসাবে দারুল উলূম ও আফগান সরকারের মাঝে ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই মূলত তিনি এ সফর করেছিলেন। আফগানিস্তানের ইলমী, আদবি, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সোসাইটি হযরতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। হযরত তাদের দাওয়াত কবুল করে সেখানে উপস্থিত হন এবং আলেমসুলভ বিভিন্ন বক্তৃতা পেশ করেন। এতে জ্ঞানী-গুণী ও সাহিত্যিকসমাজ চরম মুগ্ধ-অভিভূত হয়। একইভাবে তিনি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, বার্মা, আরববিশ্ব,

ইথুপিয়া, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিনজাবার, রোডিশিয়া, রিইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ক্যানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও সফর করেছেন।

হযরত কারী সাহেব রহ. হিন্দুস্তানের একটি অভিজাত প্রতিষ্ঠান 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনাল ল বোর্ড'-এরও প্রতিষ্ঠা ছিলেন। ভারত সরকার কর্তৃক মুসলমানদের শরয়ি আইনে হস্তক্ষেপ করা হলে ১৯৭২ সালে মুম্বাই শহরে একটি উন্মুক্ত কনভেশন আহ্বান করা হয়। এতে ভারতের সকল মুসলিম দল-উপদল ঐক্যবদ্ধ প্লাঁফর্মে বসে এবং আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনাল ল বোর্ড' নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। সর্বসম্মতিক্রমে হযরত কারী সাহেব রহ.-ই এই বোর্ডের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু তাতে বহাল থাকেন।

হযরতের আকর্ষণীয় ব্যক্তিসত্তার মাঝে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল শারাফাত, ইনসানিয়্যাত, বিনয়নম্রতা, আত্মিক পরিশুদ্ধতা, জ্ঞানগরিমা, বয়ান-বক্তৃতা, ওয়াজ-নসীহত, সাদামাঁটা জীবনযাপন, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা, বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতার ন্যায় অসংখ্য ও অগণিত গুণ-বৈশিষ্ট্যেরও। মোটকথা তিনি ছিলেন বিচিত্র ও বহুমুখী সব কীর্তি-অবদান এবং দীপ্তি ও সৌন্দর্যের আধার ও মিলনমোহনা।

ইলমের স্মারক নিদর্শনসমূহ

দারুল উলূমের পরিচালনা ও ব্যবস্থপনা ছাড়াও লেখালেখির প্রতি ছিল হযরতের স্বভাবপ্রবণতা ও সহজাত আকর্ষণ। দারুল উলূমের পরিচালনা ও পাঠদানের বাইরে তিনি সবসময় লেখালেখির মাঝে ব্যস্ত থাকতেন। বিশেষকরে সফরে থাকা অবস্থায় অবসর সময় তিনি এতেই ব্যয় করতেন। উর্দু কাব্য ও কবিতার সাথেও ছিল বেশ সখ্য ও অন্তরঙ্গতা। 'ইরফানে আরিফ' নামে তার একটি কাব্যসংলনও প্রকাশিত হয়েছে। হযরতের ক্ষুরধার ও শক্তিশালী লেখনী ছোট-বড় বহু গ্রন্থ উপহার দিয়েছে উম্মাহকে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ নিম্নরূপ :

- التشبه في الاسلام (আত-তাশাব্বুহ ফিল ইসলাম)
- مشاہیر امت (মাশাহিরে উম্মত)

- کلمات طیبات (কালিমাতে তায়্যিবাত)
- مقامات مقدسہ (মাকামাতে মুকাদ্দাসাহ)
- الطیب الثمر فی مسئلۃ القضاء والقدر (আতইয়াবুস সামার ফি মাসআলাতিল কাযা ওয়াল কদর)
- سائنس اور اسلام (সাইন্স আওর ইসলাম)
- اسلام اور مسیحی اقوام (ইসলাম আওর মাসিহি আকওয়াম)
- مسئلہ زبان اردو ہندوستان میں (মাসআলায়ে যবানে উর্দু হিন্দুস্তান মে)
- دین و سیاست (দ্বীন ও সিয়াসাত)
- اسباب عروج و زوال اقوام (আসবাবে উরূজ ও যাওয়ালে আকওয়াম)
- اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام (ইসলামী আযাদি কা মুকাম্মল প্রোগ্রাম)
- الاجتہاد والتقلید (আল-ইজতিহাদ ওয়াত তাকলিদ)
- اصول دعوت اسلام (উসূলে দাওয়াতে ইসলাম)
- اسلامی مساوات (ইসলামী মুসাওয়াত)
- تفسیر سورہ فیل (তাফসীরে সূরা ফিল)
- فطری حکومت (ফিতরি হুকুমত)
- فلسفہ نماز (ফালসাফায়ে নামায)
- نظریۂ دو قرآن کا تحقیقی جائزہ (নযরিয়ায়ে দো কুরআন কা তাহকীকি জায়েযাহ)
- اسلام میں اخلاق کا نظام (ইসলাম মে আখলাক কা নেযাম)
- خاتم النبیین (খাতামুন নাবিয়্যিন)
- حدیث کا قرآنی معیار (হাদীস কা কুরআনি মি'য়ার)
- علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج (উলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনী রুখ আওর মাসলাকি মিজায) ইত্যাদি।

শতবর্ষী জলসা

হযরত কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ. ১৯৮০ সালে তার ইহতেমামের জামানায় দারুল উলূমের শতবর্ষী উনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যার উচ্ছ্বাস-আনন্দ শুধু তখনই নয়; পরবর্তী সময়েও মানুষের মনে জীবন্ত হয়ে ছিল। ইতিহাস গড়া এই অনুষ্ঠানের বদৌলতে সেদিন পুরো বিশ্ব দেখেছিল, দারুল উলূমের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণধারার পরিধি কত ব্যাপক, কত বিস্তৃত। বার্ধক্যজনিত চরম দুর্বলতা নিয়েই সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও সুদৃঢ় কর্মদক্ষতার সাথে হযরত কারী সাহেব রহ. এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে 'দেওবন্দীয়্যাত'-এর চিন্তা-চেতনা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেইসাথে পুরো বিশ্বের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ-বিশিষ্টের জনসমুদ্রের মাধ্যমে এ কথাও প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দ নিছক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; বরং পুরো উম্মতে মুসলিমার আশা-আকাঙ্খারও কেন্দ্রবিন্দু।

১৯৮০ সালের পর বয়োবৃদ্ধির কারণে যখন একার পক্ষে ইহতেমামের দায়িত্বপালন করাা অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন হযরত রহ. মজলিসে শুরায় একজন সহকারীর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সেই প্রেক্ষিতে মজলিসে শুরা কর্তৃক সহকারী মনোনীত হন হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী রহ.। কিন্তু এর পরপরই দারুল উলূমে ইহতেমাম ও মজলিসে শুরার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তাই হযরত মাওলানা কারী সাহেব রহ. ইহতেমামের পদ থেকে অব্যাহতি নেয়াকে সমীচীন মনে করেন। পরিশেষে ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে দারুল উলূমের প্রতি হৃদ্যতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করে ইহতেমামের পদ থেকে অব্যাহতির দরখস্ত পেশ করেন। হযরতের বার্ধক্য ও দুর্বলতার প্রতি তাকিয়ে মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দ অব্যাহতিপত্র গ্রহণ করে নেয়।

ইনতেকাল

১৯৮২ সালের শুরুতেই হযরত কারী সাহেব রহ.-এর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং দিনদিন তা প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। পরিশেষে দারুল উলূম দেওবন্দ ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনল ল বোর্ডের প্ল্যাটফর্ম থেকে জাতি ও ধর্মের আযিমুশ শান খেদমত আঞ্জাম দেয়া মহান ব্যক্তিটি ৬ শাওয়াল

১৪০৩ হিজরী মোতাবেক ১৭ জুলাই ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। ইহাতায়ে মুলসুরিতে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং কাসেমী কবরস্থানে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর পার্শ্বদেশে তাকে দাফন করা হয়।

৭ সফর ১৪০৪ হিজরী মোতাবেক ১৩ নভেম্বর ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মজলিসে শুরায় শোক-অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাতে হযরতের অবদানসমূহের সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়ে তার আত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বিভিন্নজনের মতামতের একটি অংশ হচ্ছে এই–

'আল্লাহ তাআলা মরহুম কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব রহ.-কে প্রশংসাযোগ্য অসংখ্য গুণ, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব-চরিত্র দ্বারা ধন্য করেছিলেন। ইলমে যাহেরির ক্ষেত্রে তিনি ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর গৌরবের ধন, সুযোগ্য শাগরিদ ছিলেন এবং ইলমে বাতেনির ক্ষেত্রে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর ন্যায় সুমহান শায়েখের খলীফা ছিলেন। দরস-তাদরিস, ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত-ইরশাদ ও সান্নিধ্যের কল্যাণধারা দিয়ে তিনি তার সুদীর্ঘ জীবনে শুধু হিন্দুস্তান নয়; গোটা আলমে ইসলামকে সিঞ্চিত করেছেন।'

হযরতুল আল্লাম মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ.

(জন্ম : ১৩০৪ হি./১৮৮৭ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.)

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন এবং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর বিশেষ শাগরিদ। মা'কুলাত তথা বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্রসমূহে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সাধারণভাবে হযরতকে সর্বজনস্বীকৃত সুযোগ্য উস্তাদ মনে করা হতো। দারুল উলূমের অনেক উস্তাদ এবং অন্যান্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের বড় বড় উস্তাদ তার শাগরিদ ছিলেন। মা'কুলাত ছাড়াও হাদীসশাস্ত্রে ছিলেন তিনি আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. ১৩০৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বইউপির বালিয়া শহরের এক ইলমী ঘরানায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরতের খান্দান পাঞ্জাবের ঝঙ্গ জেলা থেকে প্রথমে জোনপুরে, তারপর বালইয়া শহরে এসে বসবাস শুরু করে। আল্লামা রহ.-এর পিতা মাওলানা হাফেজ আবদুর রহীম সাহেব দারুল উলূম জোনপুরে লেখাপড়া করেন, যা ছিল সে সময়ের বিখ্যাত দ্বীনী মারকায এবং যেখানে উস্তাদ হিসাবে ছিলেন 'শামসে বাযেগা' গ্রন্থকার মোল্লা মাহমুদ জোনপুরি রহ.-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

হযরত বালিয়াবী রহ. জোনপুর মাদরাসায় ফারসি ও আরবির প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন মাওলানা হাকিম জামিলুদ্দিন নাগিনাবি সাহেবের কাছে, যিনি সুপ্রসিদ্ধ ইউনানি চিকিৎসক ছিলেন। মা'কুলাতের কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন মাওলানা শিবলি নুমানী রহ.-এর উস্তাদ মাওলানা ফারুক আহমদ চিরইয়াকুটি

ও মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদি রহ.-এর শাগরিদ মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ খানের কাছে। আর দ্বীনীয়াতের তালিম হাসিল করেন মাওলানা আবদুল গফ্ফার সাহেবের কাছে, যিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর অন্যতম শাগরিদ ছিলেন।

১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে উম্মুল মাদারিস দারুল উলূম দেওবন্দে দাখেলা নেন। সেখানে হিদায়া, জালালাইন প্রভৃতি কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন এবং ১৩২৭ হিজরী মোতাবেক ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূমের পাঠ সমাপন করেন। দাওরা হাদীসের বছরে তহাবি, নাসায়ি, আবু দাউদ ও মুআত্তাইন পড়েন হযরত মাওলানা আযিযুর রহমান রহ.-এর কাছে। মুসলিম ও ইবনে মাজাহ পড়েন শায়খুল হিন্দ-ভ্রাতা হযরত মাওলানা হাকিম আহমদ হাসান রহ.-এর কাছে। আর বুখারী ও তিরমিযী পড়েন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কাছে। হযরতের কাছে হাদীসের দরস গ্রহণের পাশাপাশি হযরতের সাথে বাইয়াতের সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন।

ফারেগ হওয়ার অব্যবহিত পরের বছর দিল্লির ফতেহপুরি আলিয়া মাদরাসায় দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষক নিয়োগ হয়ে শিক্ষকজীবনের যাত্রা শুরু করেন। এরপর মুরাদাবাদ জেলার একটি মাদরাসায়ও কিছুকাল দরস-তাদরিসে ব্যাপৃত থাকেন।

দারুল উলূমের পুণ্যভূমিতে

তারপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে কৃতকর্তব্য হন। দারুল উলূমের ১৩৩১ হিজরীর কার্যবিবরণীতে হযরতের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে–

'মৌলবি মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব সকল বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। যুক্তি-দর্শনের সকল কিতাব তিনি অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে পড়ান। তার যিম্মাদারিতে রয়েছে মানতিক, ফালসাফা ও ইলমুল কালাম-বিষয়ক উচ্চাঙ্গের কিতাবসমূহ, যথা–শামসে বাযেগা, কাযি মুবারক, হামদুল্লাহ, শরহে মাতালি', শরহে ইশারাত ইত্যাদি। তালিবে ইলমদের আগ্রহ ও আকর্ষণও খুব বেশি তার প্রতি। তিনি অত্যন্ত সুবক্তা ও সুমিষ্টভাষীও। মোটকথা তিনি সুযোগ্য, সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রভাব বিস্তারকারী একজন উস্তাদ।'

দারুল উলূমের পর ১৩৪০ হিজরী থেকে ১৩৪৪ হিজরী পর্যন্ত মাদরাসা দারুল

ও মাওলানা ফযলে হক খয়রাবাদি রহ.-এর শাগরিদ মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ খানের কাছে। আর দ্বীনীয়াতের তালিম হাসিল করেন মাওলানা আবদুল গফ্‌ফার সাহেবের কাছে, যিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর অন্যতম শাগরিদ ছিলেন।

১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে উম্মুল মাদারিস দারুল উলূম দেওবন্দে দাখেলা নেন। সেখানে হিদায়া, জালালাইন প্রভৃতি কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন এবং ১৩২৭ হিজরী মোতাবেক ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূমের পাঠ সমাপন করেন। দাওরা হাদীসের বছরে তহাবি, নাসায়ি, আবু দাউদ ও মুআত্তাইন পড়েন হযরত মাওলানা আযিযুর রহমান রহ.-এর কাছে। মুসলিম ও ইবনে মাজাহ পড়েন শায়খুল হিন্দ-ভ্রাতা হযরত মাওলানা হাকিম আহমদ হাসান রহ.-এর কাছে। আর বুখারী ও তিরমিযী পড়েন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কাছে। হযরতের কাছে হাদীসের দরস গ্রহণের পাশাপাশি হযরতের সাথে বাইয়াতের সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন।

ফারেগ হওয়ার অব্যবহিত পরের বছর দিল্লির ফতেহপুরি আলিয়া মাদরাসায় দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষক নিয়োগ হয়ে শিক্ষকজীবনের যাত্রা শুরু করেন। এরপর মুরাদাবাদ জেলার একটি মাদরাসায়ও কিছুকাল দরস-তাদরিসে ব্যাপৃত থাকেন।

দারুল উলূমের পুণ্যভূমিতে

তারপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে কৃতকর্তব্য হন। দারুল উলূমের ১৩৩১ হিজরীর কার্যবিবরণীতে হযরতের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে–

'মৌলবি মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব সকল বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। যুক্তি-দর্শনের সকল কিতাব তিনি অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে পড়ান। তার যিম্মাদারিতে রয়েছে মানতিক, ফালসাফা ও ইলমুল কালাম-বিষয়ক উচ্চাঙ্গের কিতাবসমূহ, যথা–শামসে বাযেগা, কাযি মুবারক, হামদুল্লাহ, শরহে মাতালি', শরহে ইশারাত ইত্যাদি। তালিবে ইলমদের আগ্রহ ও আকর্ষণও খুব বেশি তার প্রতি। তিনি অত্যন্ত সুবক্তা ও সুমিষ্টভাষীও। মোটকথা তিনি সুযোগ্য, সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রভাব বিস্তারকারী একজন উস্তাদ।'

দারুল উলূমের পর ১৩৪০ হিজরী থেকে ১৩৪৪ হিজরী পর্যন্ত মাদরাসা দারুল

উলূম মৌ ও মাদরাসা ইমদাদিয়া দরভাঙ্গায় সদর মুদাররিসের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ১৩৪৪ হিজরীতে পুনরায় দারুল উলূমে আহুত হন। কিন্তু ১৩৬২ হিজরীতে দারুল উলূম থেকে আবার আলাদা হয়ে যান। প্রথমে জামিয়া ইসলামীয়া ঢাবেলে সদর মুদাররিসের আসন অলংকৃত করেন। কিছুকাল ফতেহপুরি আলিয়া মাদরাসায় সদর মুদাররিসের খেদমত আঞ্জাম দেন। এরপর বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হাঁহাজারি মাদরাসায়ও সদর মুদাররিসের দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ ১৩৬৬ হিজরীতে পুনরায় দারুল উলূম দেওবন্দে ফিরে আসেন। তারপর ১৩৭৭ হিজরীতে হযরত মাদানী রহ.-এর ইনতেকালের পর সদরুল মুদাররিসীনের আসন অলংকৃত করেন এবং ইনতেকালের আগ পর্যন্ত তাতে বহাল থাকেন।

সুমহান ইলমী ব্যক্তিত্ব

হযরত আল্লামা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ.-এর ছাত্র-সংখ্যা হাজারেরও উর্ধ্বে। যারা ভারত উপমহাদেশ ছাড়াও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। হযরত সকল শাস্ত্রে, বিশেষকরে কালাম, আকায়িদ, মানতিক ও দর্শনশাস্ত্রে ছিলেন সময়ের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি এসকল শাস্ত্রের পাশাপাশি হাদীস, তাফসীর ও অন্যান্য ইলমের ময়দানেও উল্লেখযোগ্য কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৩২৭ হিজরী থেকে নিয়ে ১৩৮৭ হিজরী পর্যন্ত সুদীর্ঘ ষাট বছর দরস-তাদরিসে নিয়োজিত থেকেছেন। ছাত্ররা খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তার দরসে শরিক হতো এবং তার উচ্চাঙ্গের পাঠদান থেকে উপকৃত হতো।

দরসে হযরতের তাকরীর হতো পরিমিত ও সংক্ষিপ্ত, সেইসাথে তা হতো খুবই সারগর্ভ ও মর্মসমৃদ্ধ। দরসের আন্দাযও হতো অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। কিন্তু খুবই বিচক্ষণতা ও পারঙ্গমতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সব মাসআলা বুঝিয়ে দিতেন কৌতুক ও রসিকতার ছলে। মাসআলার সাথে বিভিন্ন ঘটনা এমনভাবে মিলিয়ে দিতেন যে, তাতে মাসআলার সকল দিক হয়ে উঠত সুস্পষ্ট ও স্বমূর্ত। হযরতের দরসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, শাস্ত্রের সঙ্গে ছাত্রদের গভীর পরিচয়-বন্ধন গড়ে উঠত এবং তাদের সামনে ইলম ও জ্ঞানের পথসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যেত। তিনি হাদীসের বর্ণনার চেয়ে হাদীসের অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্যের প্রতি বেশি মনোযোগী হতেন। হযরত নানুতবী রহ.-এর উলূম ও মাআরিফের প্রতিও রাখতেন অতলস্পর্শী ও গভীর দৃষ্টি।

হযরত বালিয়াবী রহ. গায়রে মুকাল্লিদিনের জবাবে উর্দুভাষায় 'মুসাফাহা' ও 'তারাবিহ' নামে দু'টি পুস্তিকা লিখেছেন। একইভাবে ফারসিভাষায় দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের ওপর 'আনওয়ারুল হিকমাহ' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন; যার অধ্যায়গুলোর শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে ইবনে সিনা-কৃত 'আশ-শিফা'-এর ধারা অনুসারে 'নুর' শব্দ দিয়ে। এ ছাড়াও 'যিয়াউন নুজুম' নামে 'সুল্লামুল উলূম'-এর একটি আরবি পাদটীকা আছে, যা তার ঈর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য আরেকটি অবদান। এই চারটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর বাইরেও তিনি 'মায়বুযি' ও 'খায়ালি' গ্রন্থদুটির পাদটীকাও লিখেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সে পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে গেছে। জীবনের সায়াহ্নে জামে তিরমিযীর ওপরও হাশিয়া লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু জীবন ফুরসত দেয়নি। ফলে সম্ভব হয়নি হাশিয়াটি পূর্ণ করে যাওয়া।

শেষ জীবনে নিজেরই বিশিষ্ট শাগরিদ আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা অসিউল্লাহ ফতেহপুরি সুম্মা ইলাহাবাদি রহ.-এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন এবং অযিফাপাঠের মনোযোগ অত্যাধিক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাওলানা অসিউল্লাহ সাহেবের পক্ষ থেকে হযরতের বাইয়াতের ইজাযতও লাভ হয়েছিল।

মৃত্যুবরণ

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. ২৪ রমজান ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে চুরাশি বছর বয়সে ইনতেকাল করেন এবং দারুল উলূমের মাকবারায়ে কাসেমীয়্যাতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেব রহ.

(জন্ম : ১৩০৭ হি./১৮৮৯ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৯২ হি./১৯৭২ খ্রি.)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ সাহেব মুরাদাবাদী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর পর তিনিই শায়খুল হাদীসের মসনদকে অলংকৃত করেছিলেন। তিনি একাধারে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক ও গবেষক আলেম এবং আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। সেইসঙ্গে ছিলেন শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সর্বশেষ শাগরিদ, যার মাধ্যমে দারুল উলূমের হাদীসের মসনদ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল আপন প্রভাব, প্রতাপ ও ভাবগাম্ভীর্য।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মুরাদাবাদী রহ.-এর বসবাস ছিল মিরাঠ জেলার হাপুড়ে। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে হযরতের পূর্বপুরুষের মধ্যে সাইয়েদ কুতুব ও সাইয়েদ আলেম তাদের অন্য দুইভাইকে সঙ্গে নিয়ে হিরাত থেকে দিল্লি আগমন করেছিলেন। সাইয়েদ কুতুব রহ ও সাইয়েদ আলেম রহ. ছিলেন নিজ সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত। বাদশাহ শাহজাহান তাদের পঠনপাঠনের জন্য হাপুড়ে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাইয়েদ আলেমের বংশধারার ছেষট্টি সিঁড়িতে আছেন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

১৩০৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আজমিরে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে হযরতের দাদা সাইয়েদ আবদুল কারিম ছিলেন থানার সাব-ইনস্পেক্টার। চারবছর বয়সে লেখাপড়ার হাতেখড়ি। কুরআন মাজিদ শেখেন মায়ের কাছে। ফারসিভাষার তালিম গ্রহণ করেন বংশের বুযুর্গ

ব্যক্তিদের থেকে। ১২ বছর হলে খান্দানের বুযুর্গ আলেম মাওলানা খালিদ সাহেবের কাছে নাহু-সরফের পাঠ শুরু করেন। এ সময় হযরতের মায়ের অন্তরে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার কথা মনে পড়ে, যা ১৮৫৭ সালে বরবাদির শিকার হয়েছিল। হযরত কিছুকাল ওই মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। এরপর গিলাউঠির 'মাম্বাউল উলূম' মাদরাসায় মাওলানা মাজেদ আলী সাহেবের কাছে বিভিন্ন কিতাব পড়েন। তারপর মাওলানা মাজেদ আলী সাহেবের সঙ্গে দিল্লি এসে মা'কুলাতের কিতাবদি পড়েন।

১৩২৬ হিজরী মোতাবেক ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তার ভর্তিপরীক্ষা গ্রহণ করেন। উচ্চ নাম্বার পেয়ে মিশকাত জামাতে ভর্তি হন এবং শেষ পর্যন্ত দারুল উলূমেই শিক্ষা লাভ করেন। ১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কাছে দাওরা হাদীস পড়ে সনদ হাসিল করেন। শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নির্দেশনা মোতাবেক পরের বছরেও দাওরা হাদীস পড়েন। হযরত ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.-এর অন্যান্য উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য–আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, মাওলানা মুরতাজা হাসান চাঁদপুরি, মাওলানা গোলাম রাসুল হাজরাবি রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

দারুল উলূম দেওবন্দে ছাত্রজামানা থেকেই হযরত মুরাদাবাদী রহ. মাকুলাতের বিভিন্ন কিতাব পড়িয়েছিলেন। ফারেগ হওয়ার পর শাহি মুরাদাবাদ মাদরাসার মুহতামিমের আবেদনে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ও মাওলানা হাফেজ আহমদ রহ. তাকে মুরাদাবাদে পাঠিয়ে দেন। শাহি মুরাদাবাদ মাদরাসায় তিনি ৪৮ বছর দরস-তাদরিসের খেদমত আঞ্জাম দেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীর এই দীর্ঘ সময়ে হাদীসের অসংখ্য তালিবে ইলম তার ফয়েয হাসিল করেছে।

দারুল উলূমের পুণ্যভূমিতে

১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ইনতেকাল করেন। তখন দারুল উলূমের মজলিসে শুরা দারুল উলূমের শায়খুল হাদীস হিসাবে হযরত ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.-কে নির্বাচন করে, অপরদিকে সদরুল মুদাররিসীন হিসাবে নির্বাচন করে হযরত মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ.-কে। হযরত মাদানী রহ. মৃত্যুপূর্ববর্তী অসুস্থতার মাঝে বারবার মুরাদাবাদী রহ.-কে নিজের

স্থলবর্তী হয়ে *সহীহ বুখারীর* দরস দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া পূর্বে মাদানী রহ.-এর অনুপস্থিতিতে দারুল উলূমে দুইবার *সহীহ বুখারীর* দরস প্রদানেরও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. ইনতেকাল করলে সদরুল মুদাররিসীনের পদও অর্পণ করা হয় তাকে। এভাবে পনেরো বছর পর্যন্ত তিনি দারুল উলূমে শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত পালন করেন সদরুল মুদাররিসীনের দায়িত্ব। হযরতের সময়ে দারুল উলূমে দাওরা হাদীসের ছাত্রসংখ্যা আড়াইশো থেকে তিনশোর মাঝামাঝি থাকত। প্রায় ৬০ বছর ধরে দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দই *সহীহ বুখারীর* দরস প্রদান করে আসছিলেন, হযরত ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ. এসে সেই ধারাবাহিকতাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

হযরত মুরাদাবাদী রহ. যেহেতু হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ও আল্লামা কাশ্মীরি রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন, তাই তার হাদীসের দরসে পাওয়া যেত উভয় উস্তাদের রং ও রূপের সংমিশ্রণ। হযরতের দরসে বুখারী হতো অত্যন্ত বিশদ ও বিস্তারিত, যাতে হাদীসের প্রতিটি দিক ও বিষয় নিয়ে তিনি সন্তোষজনক আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। ফুকাহায়ে কেরামের মতামত উল্লেখপূর্বক ফিকহে হানাফীর সমর্থনে ও অগ্রাধিকারপ্রদানে এমন শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ পেশ করতেন যে, শ্রোতার মনে এতটুকু সংশয়ও আর বাকি থাকত না। দরসের মাঝে *সহীহ বুখারীর* বিভিন্ন শরাহ-শুরুহাতের পাশাপাশি আপন উস্তাদগণের উলূম ও মাআরিফও পেশ করতেন স্থানে স্থানে।

হযরতের আলোচনা সবিস্তার হওয়ার সাথে সাথে তা হতো খুবই সহজ ও সহজবোধ্য। ফলে দুর্বল মেধার ছাত্ররাও তা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারত। আলোচনার ধরনও হতো পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল, যাতে হযরতের বাহ্যিক সৌন্দর্যের সকল বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে ফুটে উঠত। এসব গুণের ও বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত আল্লামার দরসে বুখারী ছিল খুবই প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্য। বস্তুত তিনি ছিলেন আপন সময়ের অনন্যসাধারণ এক আলেম এবং দরসে হাদীসের অতুলনীয় এক উস্তাদ। যার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারা ছিল ছাত্রদের জন্য বিরাট গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

ইলমী ও জাতীয় অবদানসমূহ

নানা কর্মব্যস্ততার মাঝেও হযরত মুরাদাবাদী রহ. খেলাফত আন্দোলনের সময় থেকেই জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। যার ফলে জেল-জুলুমেরও শিকার হয়েছেন অনেকবার। শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ. যখন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদর ছিলেন তখন তিনি দুই-দুইবার নায়েবে সদর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তী সময়ে সদরের মসনদকেও অলংকৃত করেছেন এবং আমৃত্যু এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

হযরতের অন্যতম গ্রন্থ হলো, القول الفصيح فيما يتعلق بنقد أبواب الصحيح (আল-কাওলুল ফাসিহ ফি মা ইয়াতাআল্লাকু বি-নাকদি আবওয়াবিস সহীহ)। এতে *সহীহ বুখারী*র অধ্যায়সমূহের পারস্পরিক বন্ধন ও যোগসূত্র আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরি রহ. কিতাবটি সম্পর্কে বলেন, 'এটি তীক্ষ্ণ ও উদ্দীপ্ত মেধার উজ্জ্বল নমুনা।' হযরতের আরও দুটি রচনা হচ্ছে, 'কিতাবুত তারাজিম' ও 'আরবায়িন'। তা ছাড়া 'ইযাহুত তারাজিম' নামেও তাকরীরে বুখারীর একটি সংকলন রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদে হাদীস মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনুরী রহ.-এর তারতিব ও বিন্যাসে যা ইতিমধ্যে ১০ খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পরলোকগমন

হযরত মুরাদাবাদী রহ. শেষজীবনে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মুরাদাবাদ গমন করেন। সেখানে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর অবশেষে ২০ সফর ১৩৯২ হিজরী মোতাবেক ৫ এপ্রিল ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের রাতে ইনতেকাল করেন। হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যব সাহেব রহ. তার নামাযে জানাযা পড়ান এবং মুরাদাবাদের মাটিতেই তিনি সমাহিত হন।

আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ. হযরতের ইনতেকালের পর লেখেন :

> আফসোস! ভারতীয় মুসলমান ও উলামায়ে কেরামের উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে গেল আজ। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিস, গবেষক আলেম ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আকাবির মাশায়েখ ও সদরুল মুদাররিসীনের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাদের পুণ্যধারা শুরু হয়েছিল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ. থেকে, বাহ্যিকভাবে তার যেন সমাপ্তি

ঘটল হযরত মাওলানা ফকরুদ্দিন আহমদ রহ. পর্যন্ত এসে। পুরো এক শতাব্দীজুড়ে উলূমে নবুয়তের চন্দ্র-সূর্য, যাদের দ্বারা শুধু দারুল উলুমের মধ্যেই নয়; সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে, হযরত মুরাদাবাদী রহ. ছিলেন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব।

এ পর্যন্ত সাধারণভাবে যারা দেওবন্দের আকাবির ছিলেন এবং বিশেষভাবে যারা দরসে হাদীসের আসাতিযা ছিলেন, ইলম ও মারেফত তথা জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান উভয় ঝরনাধারা থেকে যারা জলসিঞ্চন করেছিলেন এবং যাহির ও বাতিন উভয় নিসবতের ধারক ছিলেন, হযরত মুরাদাবাদী রহ. ছিলেন এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ সদস্য। আমাদের দৃষ্টিতে হযরতের ইনতেকালের পর তার আলোশূন্য মসনদকে আলোকিত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

তিনি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. ও ইমামুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. উভয় থেকে ফয়েয হাসিল করেছেন এবং উভয়ের ঝরনাধারা থেকে ইলমের সুধা পান করেছেন। আকাবির মুহাদ্দিস ও সুযোগ্য উস্তাদগণের নমুনা ছিলেন তিনি, যার জীবনের পুরো বাষট্টি বছর কেটেছে দরস-তাদরিসের মাশগালায়। দরসে হাদীসের তাকরীরে তিনি হাফেজ বদরুদ্দিন আইনি রহ. ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর ইলমের সারনির্যাস তুলে আনতেন এবং হযরত শায়খুল হিন্দ দেওবন্দী রহ. ও হযরত আল্লামা কাশ্মীরি রহ.-এর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ঝলক মেলে ধরতেন। আল্লাহ তাআলা তার নেককার বান্দাদের যেরূপ রহমত ও মাগফিরাত দান করেন তাকেও অনুরূপ রহমত ও মাগফিরাত দান করুন এবং রব্বানী উলামায়ে কেরামের জামাতের সাথে হাশর করুন।

হযরত মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী রহ.

(জন্ম : ১৩০১ হি./১৮৮৪ খ্রি., মৃত্যু : ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ মাহদী হাসান শাহজানপুরী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী। তিনি ছিলেন মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্র এবং একজন উচ্চমার্গীয় আলেমে দ্বীন ও দূরদর্শী ফকীহ ও মুফতী। সেইসঙ্গে ছিলেন গবেষণাধর্মী ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক ও ভাষ্যকারও। কাছাকাছি পনেরো বছর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ফিকহ ও ফাতাওয়ার গুরুভার দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর পিতামহ শায়েখ আবু ইসহাক ইবরাহীম রহ. বাগদাদের বাসিন্দা ছিলেন। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে সেখান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তান এসে অধিবাস গ্রহণ করেন। হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর জন্মভূমি শাহজাহানপুর। এখানেই ১৩০১ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সাইয়েদ কাযেম হাসান সাহেবের কাছে কুরআন শরীফ পড়েন এবং হিফয সম্পন্ন করেন এগারো-বারো বছর বয়সে। ফারসির প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন পিতা ও ভাইয়ের কাছে। এরপর 'আইনুল ইসলাম' মাদরাসায় ভর্তি হয়ে নাহু-সরফের কিতাবাদি পড়েন। তার উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মুজায ও খলীফা মাওলানা আবদুল হক রহ.। ফিকহ ও নাহুর কিছু কিতাব পড়েন মুফতী কেফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী রহ.-এর কাছে।

যখন মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ. মাদরাসা আমিনিয়া দিল্লি চলে আসেন, তখন মুফতী মাহদী হাসান সাহেবের পিতা তাকেও সেখানে পাঠিয়ে দেন। এখানে মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ. ও অন্যান্য আসাতিযা কেরামের কাছে ফারসি সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, যুক্তিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও ইলমে

হাদীস ইত্যাদি সকল বিষয়ের পাঠ গ্রহণ করেন। ১৩২৬ হিজরী মোতাবেক ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা সমাপ্ত করে সনদ হাসিল করেন। *সহীহ বুখারী* ও *সুনানে তিরমিযীর* আতরাফ শুনিয়ে শায়খুল হিন্দ রহ. থেকে হাদীসের ইজাযত লাভ করেন এবং ১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের দস্তারবন্দি-অনুষ্ঠান থেকে দস্তারে ফযিলত লাভ করেন।

শিক্ষা-সমাপনের পর হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. তাকে সুরত জেলার রান্দিরে আশরাফিয়া মাদরাসায় প্রেরণ করেন। এখানে তিনি সাত বছর সিহাহ সিত্তাহর দরস দেন এবং ফিকহ ও ফাতাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর চার বছর রান্দিরেই মুহাম্মদিয়া মাদরাসায় সদর মুদাররিস হিসাবে সিহাহ সিত্তাহর দরস দেন। গুজরাটবাসীর ওপর ছিল হযরতের জ্ঞানগরিমার অসাধারণ প্রভাব। বস্তুত তিনি ফিকহে হানাফীর ক্ষেত্রে যেমন অতুলনীয় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, ঠিক তদ্রূপ হাদীস ও আসমাউর রিজালের ক্ষেত্রেও ছিলেন গভীর দৃষ্টির অধিকারী। মুম্বাইয়েও তিনি ফিকহ ও ফাতাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন সুদীর্ঘ সময়, যা ছিল ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

দারুল উলূমে আগমন

মুফতী সাইয়েদ মাহদী হাসান রহ. ১৩৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে দারুল ইফতার প্রধান মুফতী হিসাবে মনোনীত হন এবং সুদীর্ঘ বিশ বছর ফিকহ ও ফাতাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দীর্ঘ অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম থেকে ইস্তফা নিয়ে জন্মভূমি শাহজাহানপুরে চলে যান। হযরতের সময়ে দারুল উলূমের দারুল ইফতা থেকে জারি হয়েছে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশো চব্বিশটি ফাতাওয়া। দারুল উলূমে কয়েক বছর তিনি *তহাবি শরীফের* দরসও দিয়েছেন। হযরতের দরস ছিল আলেম ও মুহাক্কিকসুলভ।

হযরত মুফতী সাহেব রহ. ছিলেন আসলে একজন সুযোগ্য আলেম ও দূরদর্শী মুফতী। সেইসাথে ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে ছিলেন গভীর দৃষ্টির অধিকারী। ফিকহ ও ফাতাওয়ার প্রতি ছিল সহজাত আকর্ষণ। ফাতাওয়াবিষয়ক কিতাবাদি সম্পর্কে ছিল ব্যাপক-বিস্তৃত অধ্যয়ন। এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন বে-নজির ব্যক্তিত্ব। তার বড় একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি যেকোনো

বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়হীন চূড়ান্ত অভিমত পেশ করতেন। তিনি যে মত পোষণ করতেন দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতেন এবং লিখতেন।

একজন মুফতীর জন্য যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা চাই তার সবই ছিল হযরতের মাঝে পূর্ণমাত্রায়। জটিল জটিল মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি আহলে ইলমের সাথে পরামর্শ করতেন। দলিল-প্রমাণের আলোকে যেটি অগ্রগণ্য হতো তার ওপরই আমল করতেন। দুরূহ ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও শরয়ি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কখনো তিনি গোঁ ধরে বসতেন না। ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কারও অন্যায় হস্তক্ষেপ মেনে নিতেন না এবং যুক্তি ও উপযোগিতার নামে কখনো তোষামোদ করা পছন্দ করতেন না।

ফিকহ ও ফাতাওয়া ছাড়াও হাদীসশাস্ত্রের প্রতি ছিল হযরতের প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণ। তিনি ছিলেন সিহাহ সিত্তাহসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবের বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ আলেম। হাদীস-অধ্যয়নের পরিধি ছিল সুবিস্তৃত এবং মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার ওপর ছিল সুগভীর দৃষ্টি। হানাফী উলামায়ে কেরামের প্রতি তিনি গভীর অনুরাগ-আকর্ষণ অনুভব করতেন এবং তাবাকাত ও তারাজিমের কিতাব থেকে তাদের মূল্যবান উক্তি চয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। জীবনের প্রারম্ভে গায়রে মুকাল্লিদিনের সঙ্গে অনেক বাহাস করেছেন। সাথে সাথে তাদের জবাবে বিভিন্ন রিসালাও লিখেছেন। তাই মাসআলা-মাসায়েল ছিল তার মুখস্থ।

গুণগরিমা ও চারিত্রিক পূর্ণতা

হযরত মুফতী মাহদী হাসান সাহেব রহ. ছিলেন খোদাভীরু, বিনয়ী, দুনিয়াবিমুখ ও উদারচিত্ত। সেইসাথে হক কথা বলার ক্ষেত্রে ছিলেন নির্ভীক ও সুস্পষ্টভাষী। কাব্য ও কবিতারও রুচি রাখতেন। অনেক সাহিত্যপূর্ণ উর্দু কবিতা বলতেন। আযাদ ছিল তার ছদ্মনাম। ক্লান্তি ও অবসাদ তার কাছেও ভিড়তে পারত না। আরবিভাষার রচনাশৈলীও ছিল তার অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল। তিনি উদার, বদান্য, মুক্তহস্ত, অধ্যয়নমনস্ক, রাত্রি জাগরণকারী ও অসাধারণ মেহমাননেওয়াজ ছিলেন। দ্বীন ও ঈমানের প্রশ্নে তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠত চরম পর্যায়ে। ফলে তিনি কারও পরোয়া করতেন না তখন।

হযরত মুফতী সাহেব রহ. ফকিহুন নফস মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী

রহ.-এর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। কিন্তু খেলাফত ও ইজাযত লাভ করেছিলেন গাঙ্গুহী রহ.-এর খলীফা হযরত মাওলানা শফী উদ্দীন মক্কী রহ. থেকে।

রচনাসম্ভার

হযরত মুফতী মাহদী হাসান রহ. উম্মতে মুসলিমাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা উপহার দিয়েছেন। যার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ :

- قلائد الأزهار على شرح معاني الآثار (কালায়িদুল আযহার আলা শরহি মাআনিল আসার) আরবি ভাষায় লিখিত কিতাবটি ছয় খণ্ডে বিস্তৃত। যার দুই খণ্ড ছেপেছে।
- চার খণ্ডে লিখিত ফিকহে হানাফীর অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ كتاب الحجة لأهل المدينة (কিতাবুল হুজ্জাহ লি-আহলিল মাদিনা)-এর তাসহীহ ও তালিক তথা ভুল-সংশোধন ও টীকা-সংযোজন। দায়েরাতুল মাআরিফ হায়দারাবাদ থেকে যার প্রথম দুই খণ্ড ছেপে এসেছে। হযরত মুফতী সাহেব রহ. এই কিতাবের পেছনে সবচেয়ে বেশি মেহনত করেছেন এবং সুদীর্ঘ বিশ বছর ব্যয় করেছেন। কিতাবটি ছিল খুবই দুষ্প্রাপ্য। কেবল ইস্তাম্বুলেই তার একটি নুসখা ছিল।
- ইমাম মুহাম্মদ রহ. কৃত كتاب الآثار (কিতাবুল আসার)-এর ওপর জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান টীকাসমূহ, যা তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

এ ছাড়াও আরবি ও উর্দু ভাষায় রয়েছে :

- الدر الثمين (আদ-দুররুস সামিন)
- رجال كتاب الآثار (রিজালু কিতাবিল আসার)
- شرح بلاغات محمد في كتاب الآثار (শরহু বালাগাতি মুহাম্মদ ফি কিতাবিল আসার)
- الاهتداء في رد البدعة (আল-ইহতিদা ফি রদ্দিল বিদআহ)
- شرح نخبة الفكر (শরহু নুখবাতুল ফিকর)
- إلقاء اللمعة على حديث لا جمعة (ইলকাউল লামআহ আলা হাদিসি লা জুমআহ)
- إقامة البرهان (ইকামাতুল বুরহান)

- قطع الوتین (কতউল ওয়াতিন)
- بئس القرین (বিসুল করিন)
- الاختلاف المبین (আল-ইখতিলাফুল মুবিন)
- مفید القاری والسامع (মুফিদুল কারী ওয়াস-সামি)
- التوضیحات (আত-তাওযিহাত)
- کشف الغمۃ عن سراج الائمۃ (কাশফুল গুম্মাহ আন সিরাজিল আয়িম্মাহ)
- فراسۃ العریف (ফিরাসাতুল আরিফ)
- التحقیق التام فی اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام (আত-তাহকীকুত তাম ফি ইযা খরাজাল ইমাম ফালা সলাতা ওলা কালাম)
- رفع الارتیاب (রফউল ইরতিয়াব)
- شمیم حیدری (শামিমে হায়দারি)
- ضربۃ الصمصام (যরবাতুস সমসম)
- اظہار دجل المرید (ইযহারু দাজলিল মুরিদ)
- اظہار الصواب (ইযহারুস সওয়াব)
- اظہار اسرار المتحدثین (ইযহারু আসরাসুল মুতাহাদ্দিসিন)
- الاسعاف (আল-ইসআফ)
- التنویر فی حکم الجہر بالتکبیر (আত-তানবির ফি হুকমিল জাহরি বিত-তাকবির)
- القول الصواب (আল-কওলুস সওয়াব)
- طلوع بدر الرشاد (তুলুউ বাদরির রশাদ) ইত্যাদি।

ইহধামত্যাগ

হযরত মুফতী সাহেব রহ. অসুস্থতা ও দুর্বলতা নিয়ে ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে দেওবন্দ ছেড়ে জন্মভূমি শাহজাহানপুরে চলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর সেখানেই ২৭ রবিউস সানী ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ২৮ এপ্রিল ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইনতেকাল করেন। মৃত্যুর সময় হযরতের বয়স হয়েছিল চুরানব্বই বছর।

হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ.

(জন্ম : ১৩২৩ হি./১৯০৫ খ্রি., মৃত্যু : ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী রহ.-এর ইনতেকালের পর হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ. দারুল উলূমের সদরুল মুদাররিসীন নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন মহান আলেমে দ্বীন, হাদীস ও তাফসীরের সুবিজ্ঞ উস্তাদ এবং অসাধারণ ওয়ায়েয ও আলোচক। সেইসাথে হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ.-এর মুজায ও খলীফা।

প্রাথমিক অবস্থা

১০ রজব ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে পিতৃপুরুষের ভূমি মুরাদাবাদ জেলার উমরি উপশহরে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআন শরীফ, উর্দু ভাষা, ধর্মীয় শিক্ষা ও ফারসি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন হাফেজ নাসিমুদ্দিন সাহেব ও হাফেজ আবদুল কাদের আমরুহি সাহেবের কাছে।

হযরতের পিতা শাহি মুরাদাবাদ মাদরাসার কুতুবখানার যিম্মাদার ছিলেন। তাই আনুমানিক ১৩৩৫ হিজরী মোতাবেক ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেখানে ভর্তি হন। এখানে ফারসি-শিক্ষা সমাপন করেন এবং দরসে নিযামির প্রাথমিক কিতাবসমূহ পিতার কাছেই পড়েন। এরপর মাযাহেরে উলূমে ভর্তি হয়ে মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। সর্বশেষ ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদীস সমাপন করে সনদ লাভ করেন।

ফারেগ হওয়ার পর দিল্লির ফতেহপুরি আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন। এরপর সেখান থেকে পাটনায় চলে যান এবং শামসুল হুদা মাদরাসায় সিহাহ সিত্তার কয়েকটি কিতাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। কিন্তু দেড় বছর পর পুনরায় দিল্লির ফতেহপুরি আলিয়া মাদরাসায় ফিরে আসেন এবং *সহীহ মুসলিম* ও অন্যান্য বিষয়ের পাঠদান করেন।

দারুল উলূমের মাটিতে

এরপর ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন। দারুল উলূমে হযরতের *সহীহ মুসলিম* ও *তাফসীরে বাইযাবির* দরস ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। 'আত-তাকরীরুল হাবি' নামে হযরতের *তাফসীরে বাইযাবির* তাকরীরসমূহ ছেপে ব্যাপক সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ওয়াজ-নসীহত ও আলোচনায়ও ছিল হযরতের পূর্ণ পারদর্শিতা।

হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ. হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী রহ.-এর জামানায় দারুল উলূমের সহকারী সদরুল মুদাররিসীনের দায়িত্ব পালন করেন এবং তার ইনতেকালের পর পুরোপুরিভাবে সদরুল মুদাররিসীনের দায়িত্বে উন্নীত হন, যাতে মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকেন।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

হযরত ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ. শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে।

হযরত মাওলানা শরীফ হাসান দেওবন্দী রহ.

(জন্ম : ১৩৩৮ হি./১৯২০ খ্রি., জন্ম : ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.)

হযরত মাওলানা শরীফ হাসান দেওবন্দী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস। ইলম-আমল, তাকওয়া-তাহারাত ও উন্নত আখলাক-চরিত্রে ছিলেন পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামের পুণ্যস্মৃতি। জ্ঞানের গভীরতা, হাদীসের প্রতি অনুরাগ-ভালোবাসা ও আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতায় ছিলেন সমকালীন উলামায়ে কেরামের মাঝে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রাথমিক অবস্থা

তিনি দেওবন্দের বাসিন্দা ছিলেন। ৪ যিলহজ ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯ আগস্ট ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই হাফেজ আবদুল খালেক মরহুমের কাছে কুরআন হিফয করেন। তিন বছর সাহারানপুরের একটি মাদরাসায় আরবি ও ফারসির প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়েন। এরপর দারুল উলূম দেওবন্দে দাখেলা নিয়ে দরসে নেযামির পাঠ সমাপ্ত করেন। হযরতের দাওরা হাদীস শেষ করার বছর ছিল ১৩৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ।

দারুল উলূম থেকে ফারেগ হওয়ার পর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৬০ হিজরীর শাওয়াল মাসে খানকায়ে ইমদাদিয়া থানাভবনের ইমদাদুল উলূম মাদরাসায় সদর মুদাররিস নিযুক্ত হন। সকল ইলম ও শাস্ত্রে হযরতের পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা ছিল। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর সোহবতের বরকতে হাদীস ও ইফতার সাথেও তৈরি হয়েছিল গভীর সম্পর্ক। তারপর ১৩৬৪ হিজরীতে বেরেলী ইশাআতুল উলূম মাদরাসার সদর মুদাররিস নিয়োগ হন। এখানে দরসে হাদীসের পাশাপাশি ফাতাওয়া প্রদানের দায়িত্বও পালন করেন। নয় বছর হাদীস ও ফিকহের খেদমত

আঞ্জাম দেয়ার পর সুরত জেলার ঢাবেলে শায়খুল হাদীসের মসনদ আলোকিত করেন এবং *সহীহ বুখারী* ও *জামে তিরমিযীর* পাঠদান করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে

১৩৮৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা শরীফ হাসান সাহেবকে দারুল উলূমে ডাকা হয়। ইলমে হাদীসের প্রতি হযরতের অস্বাভাবিক অনুরাগ-আকর্ষণ ছিল। তিনি সাইয়েদ ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.-এর পর দারুল উলূমে শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন এবং হাদীসে নববীর দরস প্রদান করেন, যা ছিল তার জীবনের অসামান্য কীর্তি ও অবদান। ইনতেকালের আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বস্তুত, হযরতের পুরো জিন্দেগি কেটেছে দরস-তাদরিস ও তালিবানে ইলমের খেদমতে। তার দরসের বড় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাতে ইলমী তথ্য-উপাত্তের পরিমাণ থাকত অত্যধিক। ফলে ছাত্ররা দরসে উপস্থিত হয়ে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হতো। ইনতেকালের কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও হযরতের ইলম ও জ্ঞানের ঝরনাধারা চালু ছিল।

চারিত্রিক পবিত্রতা, জ্ঞান-গভীরতা ও হাদীসশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ-আকর্ষণের ক্ষেত্রে মাওলানা শরীফ হাসান দেওবন্দী রহ. একদিকে যেমন আকাবির-আসলাফের স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন, তেমনই আপন যুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। ছোট-বড়, নবীন-প্রবীণ সকলের সাথে তিনি হাসিমুখে কথা বলতেন।

পরলোকযাত্রা

হযরত শরীফ হাসান দেওবন্দী রহ. হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক ঘণ্টা অসুস্থ থাকার পর আনুমানিক ৫৮ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। তারিখটি ছিল ১৪/১৫ জুমাদাস সানী ১৩৯৭ হিজরী মোতাবেক ১ জুন ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ। দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীয়্যায় হযরতের আরামস্থল।

একনজরে বর্তমান যুগের আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ

ক্র.	নাম	মৃত্যুসন	পদ
১	হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী রহ.	১৪৩২ হি./ ২০১০ খ্রি.	মুহতামিম
২	হযরত মাওলানা মিরাজুল হক দেওবন্দী রহ.	১৪১২ হি./ ১৯৯১ খ্রি.	সদরুল মুদাররিসীন
৩	হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান বুলন্দশহরী রহ.	১৪৩১ হি./ ২০১০ খ্রি.	শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন
৪	হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.	১৪১৭ হি./ ১৯৯৬ খ্রি.	মুফতী
৫	হযরত মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দিন আজমি রহ.	১৪২০ হি./ ২০০০ খ্রি.	মুফতী
৬	হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ রহ.	১৪৩১ হি./ ২০১০ খ্রি.	ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম
৭	হযরত মাওলানা মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরী রহ.	১৪৪১ হি./ ২০২০ খ্রি.	শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন
৮	হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ওয়াস্তানবী		মুহতামিম
৯	হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী		মুহতামিম শায়খুল হাদীস
১০	হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী হাফি.		সদরুল মুদাররিসীন

হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী রহ.

(জন্ম : ১৩৩৩ হি./১৯১৪ খ্রি., মৃত্যু : ১৪৩২ হি./২০১০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর পর দারুল উলূমের ইহতেমামের বাগডোর অর্পণ করা হয়েছিল হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী রহ.-এর হাতে। তিনি ছিলেন তৃতীয় আমিরুল হিন্দ ও দারুল উলূমের অষ্টম মুহতামিম। প্রায় অর্ধশতাব্দীজুড়ে তিনি দারুল উলূমের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম বিশ বছর দারুল উলূমের গোড়ায় জলসিঞ্চনে, তার উন্নয়নে ও শ্রীবর্ধনে ভূমিকা রাখেন মজলিসে শুরার একজন কর্মচঞ্চল সম্মানিত সদস্য হিসাবে। এরপরের ত্রিশ বছর দারুল উলূমের জন্য অসামান্য কীর্তি ও অবদানের স্বাক্ষর রাখেন ইহতেমামের মসনদ থেকে একজন সুযোগ্য মুহতামিম হিসাবে।

বড় অস্থির, অশান্ত, ধৈর্যক্ষয়িষ্ণু, হিম্মত ও মনোবল চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া এক কঠিন পরিস্থিতিতে দারুল উলূমের পরিচালনা-দায়িত্বের বইঠা হাতে নিয়েছিলেন হযরত বিজনুরী রহ.। কিন্তু ভয়ংকর তরঙ্গলহরি চিরে দারুল উলূমের কিশতিকে তিনি কেবল নিরাপদ তীরেই ভিড়াননি; আল্লাহর তাওফীকে দরদ-ব্যথা, দৃঢ়চিত্ততা, প্রজ্ঞা, কুশলতা, ও রাতদিনের নিঃস্বার্থ ও নিরলস চেষ্টা-পরিশ্রমের মাধ্যমে দারুল উলূমকে দান করেছিলেন নবজীবন ও নব-উদ্যম।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব ছিলেন বিজনুরের কাজিপাড়া মহল্লার এক ধর্মীয়, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও জমিদার ঘরানার আদরের দুলাল। শানশওকত, বিত্তবৈভব ও বিলাসপূর্ণ পরিবেশে চোখ মেলেন এবং ওই পরিবেশেই জীবনের সিংহভাগ সময় কাটান। হযরতের আত্মীয়-সম্পর্কের

এক নানা হযরত মাওলানা হাকিম রহীম উল্লাহ বিজনুরী[১০] ছিলেন দারুল উলুমের শুরু-জামানার অন্যতম ফারেগ এবং হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর শেষ জামানার বিশেষ শাগরিদ। হজ উপলক্ষে মক্কা শরীফে গিয়ে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনি। চিকিৎসাশাস্ত্রের পাশাপাশি ইলমে কালাম ও মুনাযারা-বিতর্কেও ছিল তার পূর্ণ দক্ষতা। অনেকগুলো কিতাবও রচিত হয়েছে তার হাতে। তিনি ছিলেন খুবই পরিপাটি ও কেতাদুরস্ত। দুআ-অযিফার প্রতিও ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল।

হযরত মারগুবুর রহমান সাহেব রহ.-এর পিতা হযরত মাওলানা হাকিম মাশিয়াতুল্লাহ বিজনুরী রহ.[১১] ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের ফাযেল, হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সুযোগ্য শাগরিদ এবং আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই সম্পর্কের সুবাদেই হযরত শাহ সাহেব রহ. প্রতি বছর এক-দুবার অবশ্যই হযরত হাকিম সাহেবের কাছে যেতেন। মরহুম হাকিম সাহেব রহ. ১৩৪৪ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দের শুরা-সদস্য মনোনীত হন এবং আমৃত্যু এই মর্যাদা ধরে রাখেন। অধিকন্তু হযরতের বড় ভাই মাওলানা মাতলুবুর রহমান বিজনুরী রহ.-ও[১২] দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা মাদানী রহ.-এর সদরুল মুদাররিসীন হওয়ার শুরু-জামানার ছাত্র এবং তার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।

মোটকথা সূচনালগ্ন থেকেই দারুল উলূম ও দারুল উলূমের আকাবিরের সঙ্গে যে ঘরানার এমন সম্পর্ক-বন্ধন ছিল হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব রহ. সেই বরকতপূর্ণ ঘরানাতেই চোখ মেলেন ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে। বুঝ-বুদ্ধির বয়সে উপনীত হলে তাকে ভর্তি করা হয় বিজনুরের মদীনাতুল উলূম রহিমিয়া মাদরাসায়। যা মাওলানা হাকিম রহীম উল্লাহ সাহেবের ওসিয়ত মোতাবেক তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দ্বারা চালু করা হয়েছিল এবং হযরতের পিতা মাওলানা মাশিয়াতুল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে চলছিল।

---

১০. মৃত্যু : ১৩৪৭ হিজরি মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে
১১. মৃত্যু : ১৩৭২ হিজরি মোতাবেক ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে
১২. মৃত্যু : ১৪০৮ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে

১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং তিন বছর পড়াশোনা করে ১৩৫২ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেন। *বুখারী* ও *তিরমিযী* পড়েছিলেন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর কাছে। পরের বছর তথা ১৩৫৩ হিজরীতে ইফতা বিভাগে ভর্তি হন। বিভাগ-প্রধান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাহুল ভাগালপুরি রহ., মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী রহ. ও অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরামের সান্নিধ্যে ফাতাওয়া লেখার অনুশীলন করেন। পাশাপাশি বিষয়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কিতাবপত্রও পড়েন। এভাবেই সমাপ্ত করেন ফাতাওয়া লেখালেখির এক বছর মেয়াদী চর্চা-অনুশীলন।

দেওবন্দে হযরত মাদানী রহ. ছাড়া আরও যাদের কাছে ইলমে দ্বীনের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন, শায়খুল আদব মাওলানা ইজায আলী আমরুহি, মাওলানা আবদুস সামি দেওবন্দী, আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহিম বালিয়াবী, মাওলানা আসগর হুসাইন দেওবন্দী, মাওলানা নাবিহ হাসান দেওবন্দী, মাওলানা রাসুল হাযরাবি, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ সাহুল ভাগালপুরি ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী রহিমাহুমুল্লাহ-সহ আরও অনেকে।

যে মাদরাসা থেকে শিক্ষাজীবনের সূচনা করেছিলেন, শিক্ষা-সমাপনের পর পিতার নির্দেশে সেই মাদিনাতুল উলূম রহিমিয়া মাদরাসা থেকেই শিক্ষকজীবনের উদ্বোধন করেন হযরত বিজনূরী রহ.। কিন্তু এ ধারা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। ভূসম্পত্তির দেখাশোনা এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয় কর্মতৎপরতার মধ্যে এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, দরস-তাদরিসের জন্য আলাদা সময় বের করা হযরতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই তিনি শিক্ষকজীবনের ইতি ঘটান।

দারুল উলূমের সাথে সংশ্লিষ্টতা

হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব রহ. ১৩৮২ হিজরী মোতাবেক ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য মনোনীত হন। একই বছরে মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান নদবী, মাওলানা কাযি যয়নুল আবিদিন সাজ্জাদ মিরাঠি, মাওলানা সাইদ আহমদ আকবরাবাদী, মাওলানা হামিদুল আনসারি গাযি এবং সাইয়েদ হামিদুদ্দিন

ফয়েযাবাদী রহিমাহুমুল্লাহর ন্যায় বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম মজলিসে শুরার সদস্য মনোনীত হন।

হযরত মাওলানা মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দের মাঝে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মজলিসে শুরার মধ্যে তার মতামত ও পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হতো। দারুল উলূমের যেকোনো বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনে মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে যখন কোনো সাব-কমিটি গঠন করা হতো তখন বিশেষভাবে কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হতো হযরত রহ.-কে। এতেই বোঝা যায়, হযরতের চিন্তা-চেতনা, ভারসাম্যপূর্ণতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর মজলিসে শুরার কেমন আস্থা ও নির্ভরশীলতা ছিল।

২৫ রজব ১৪০১ হিজরীতে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার মিটিংয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের তদানীন্তন মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়্যব সাহেব রহ. একটি লেখা পেশ করেন, যাতে তিনি আবেদন করেন বয়োবৃদ্ধি ও রোগব্যাধির কারণে জবাবদিহির ভার হালকা করে দেয়ার। হযরতের ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে মজলিসে শুরা মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব রহ.-কে সহকারী মুহতামিম নিয়োগ করেন। অথচ তখন মজলিসে শুরার মধ্যে জ্ঞানী-গুণী মানুষের কোনো অভাব ছিল না।

পরবর্তী সময়ে দারুল উলূমে অগৌরবজনক অবস্থার সৃষ্টি হলে, সেইসাথে হাকীমুল ইসলাম রহ.-ও ইহতেমামের পদ থেকে অব্যাহতি নিলে মজলিসে শুরা তাকে পূর্ণ মুহতামিমের পদে উন্নীত করে। এটা হয়েছিল ২৪ শাওয়াল ১৪০২ হিজরী মোতাবেক ১৫ আগস্ট ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার এক মিটিংয়ে। হযরতকে কেন মুহতামিম মনোনীত করা হলো, এতে অনেকেই বিস্ময় ও অভিভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু যারা দারুল উলূমের সঙ্গে তার বংশীয় সম্পর্কের ইতিবৃত্ত জানত, তারা বরং এ সিদ্ধান্তকে সঠিক ও যথার্থই বিবেচনা করে। পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলিও এই ফয়সালার যথার্থতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল দুনিয়াবাসীর সামনে।

হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব রহ. ইহতেমামের গুরুভার দায়িত্ব যে সময়ে গ্রহণ করেন, তখন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রেশ দারুল উলূম পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিশৃঙ্খলার নেতিবাচক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তখনো বাকি ছিল। এমন নাযুক ও সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে সকল পরিচালনা-বিভাগকে নতুন করে ঢেলে

সাজানো, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা, তালিবে ইলমদের আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে নিয়ে আসা, সেইসাথে সকল বিভাগে প্রাণপ্রাচুর্য ও কর্মচাঞ্চল্যের স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করা অসাধ্যসাধন থেকে কম ছিল না কোনো অংশে।

কিন্তু তাকওয়া-পরহেযগারি, আল্লাহভীতি, রাত্রিজাগরণ, সহমর্মিতা, উচ্চমনোবল ও অসাধারণ চিন্তাশীলতার কল্যাণে হযরত মাওলানা রহ. সেই নাযুক পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে আনেন। শুধু তাই নয়, সুশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার এমন শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করেন যে, তার ত্রিশ বছরব্যাপী ইহতেমামের জামানায় বড় ধরনের কোনো বিবাদ-বিশৃঙ্খলা আর দেখা দেয়নি। ফলে শিক্ষা ও নির্মাণ উভয় দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি-অগ্রগতি অর্জন করে দারুল উলূম দেওবন্দ।

হযরতের সময়ে শিক্ষার মান উন্নত থেকে উন্নততর করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া হয়। এই প্রেক্ষিতেই আরবি প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সানাবিয়া তথা মাধ্যমিক স্তরের জন্য মৌলিক শিক্ষা ও সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফল এই দাঁড়ায় যে, দারুল উলূমের আরবি প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে আদর্শ ও দৃষ্টান্তযোগ্য হয়ে। একইভাবে হিফয, নাযেরা ও প্রাইমারি স্তরের শিক্ষাধারার প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া হয়, 'দারুল কুরআন' নামে পৃথক শিক্ষাভবন নির্মাণ করা হয় এবং শিক্ষক-সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। এ সময় হাদীসশাস্ত্রের ওপর তাহকীক-গবেষণা ও উচ্চপ্রশিক্ষণের জন্য 'তাখাসসুস ফিল হাদীস' বিভাগও চালু করা হয়। ছাত্রসংখ্যা দুই হাজার থেকে চার হাজারে এবং বার্ষিক বাজেট তেত্রিশ লাখ থেকে সতেরো কোটিতে পৌঁছে যায়। হযরতের ত্রিশ বছরব্যাপী সময়ে দারুল উলূম থেকে ফারেগ হয় বিশ হাজারেরও অধিকসংখ্যক ছাত্র।

হযরতের ইহতেমামের জামানায় ইসলামী চেতনার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দারুল উলূমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও খোলা হয়। যেমন, 'অল ইন্ডিয়া তাহাফফুযে খতমে নবুয়ত পরিষদ', 'রদ্দে ঈসাইয়্যাহ বিভাগ', 'তাহাফফুযে সুন্নাহ বিভাগ', 'ইলমী মুহাযারা বিভাগ' ইত্যাদি। এ সকল বিভাগের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি দেশজুড়ে দ্বীনের দাওয়াতী ও দিফায়ি তথা প্রচারমূলক ও

প্রতিরোধমূলক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চালানো হয়।

একইভাবে দারুল উলূমের দ্বীনী ও দাওয়াতী খেদমতসমূহকে যুগচাহিদার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করতে 'শায়খুল হিন্দ একাডেমি', 'কম্পিউটার বিভাগ', কম্পিউটার রাইটিং বিভাগ', ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ', 'ইন্টারনেট বিভাগ' এবং 'অনলাইন ফাতাওয়া বিভাগ' চালু করা হয়। অনুরূপভাবে সাংবাদিকতা, কম্পিউটার ও ইংরেজিতে ডিপ্লোমা কোর্সও শুরু করা হয়। মোটকথা দারুল উলূমের ছাত্রদেরকে আধুনিক যুগের নিত্যনতুন দাবি ও জিজ্ঞাসার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় পুরোপুরিভাবে।

এ সময়ে পুরো ভারতের আরবি ও ইসলামী মাদরাসাসমূহকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য 'অল ইন্ডিয়া রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামীয়া আরাবিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়। হযরত এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভাপতি ছিলেন। হযরতের আমলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হলো ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন-শাখার সুসংহতি ও কর্মতৎপরতা। হযরত এই শাখার সদস্যসংখ্যা বর্ধিত করার পাশাপাশি তার কর্মপন্থায়ও পরিবর্তন আনেন। ফলে তা একটি কর্মচঞ্চল প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থাপনাকে সঠিক ও সুন্দর করার জন্য 'ক্রয়-শাখা' ও 'স্টক রুম'-ও কায়েম করা হয়।

হযরতের ইহতেমামি জামানায় দারুল উলূমের ভূ-সীমা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং বেশ কিছু আলিশান বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। যেমন, 'দারুত তারবিয়াহ', 'মাদরাসায়ে সানবিয়্যাহ', 'দারুল মুদাররিসীন', 'রুয়াকে খালিদ', 'শায়খুল হিন্দ মানযিল', 'শায়খুল ইসলাম মানযিল', 'হাকীমুল উম্মত মানযিল' ইত্যাদি। মর্মর পাথরনির্মিত জৌলুস ও জাঁকজমকপূর্ণ 'মসজিদে রশিদ'-ও নির্মাণ করা হয় এ সময়। আবাসিক ভবন 'দারে জাদিদ' ভেঙে সম্পূর্ণ নতুনরূপে তিন তলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের কাজও শুরু করা হয় তখন।

হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী রহ.-এর সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দ আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দীপ্তিময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে পুরো বিশ্বে সঠিক মাসলাক ও কর্মপন্থার প্রতিনিধিত্ব করে। এ সময় বিশ্বের যে-সকল বড় বড় প্রতিনিধিদল, মেহমান, রাষ্ট্রদূত, দায়িত্বশীল ও সাংবাদিকগণ হিন্দুস্তানে আসেন, তারা

দারুল উলূম সম্পর্কে সুন্দর ও ইতিবাচক ধারণা নিয়ে যান।

হযরত মাওলানা রহ. দারুল উলূম ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বিভিন্ন কনফারেন্স ও সেমিনারেও সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদর আমিরুল হিন্দ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী রহ.-এর ইনতেকালের পর তিনি সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় আমিরুল হিন্দ নির্বাচিত হন এবং পুরো হিন্দুস্তানে মিল্লাতে ইসলামীর নেতৃত্ব দান করেন। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে প্রদত্ত হযরতের সভাপতিত্বের ভাষণসমূহের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, যা ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা ও রাজনীতি সম্পর্কে তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল দর্পণ।

হযরত বিজনুরী রহ. প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি উন্নত স্বভাবচরিত্র ও মানবীয় আভিজাত্যের মডেল ছিলেন। আত্মলোপ, বিনয়নম্রতা, আত্মীয়তা, ভারসাম্যপূর্ণতা ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার ন্যায় মহৎ গুণাবলির কারণে সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাই সকলেই তাকে সম্মান করত এবং সমীহের দৃষ্টিতে দেখত। মেহমানদের এই পরিমাণ খাতির-তাওয়াজু করতেন যে, তার দৃষ্টান্ত ছিল এককথায় বিরল। তিনি ছোটদের সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহ-ভালোবাসার আচরণ করতেন। তাদেরকে মায়া-মমতা দিয়ে সিক্ত করে রাখতেন।

ইনতেকাল

হিজরী সন অনুসারে প্রায় একশ বছরের বর্ণাঢ্য জীবন কাটিয়ে অবশেষে পহেলা মুহাররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৮ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীয়্যাতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

হযরত মাওলানা মিরাজুল হক দেওবন্দী রহ.

(জন্ম : ১৩২৮ হি./১৯১০ খ্রি., মৃত্যু : ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মিরাজুর হক দেওবন্দী রহ. ছিলেন দারুল উলূমের নায়েবে মুহতামিম, সদরুল মুদাররিসীন এবং একজন বড় মাকবুল উস্তাদ। শিক্ষা ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী। দারুল উলূমে প্রায় চল্লিশ বছর শিক্ষকতা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

প্রাথমিক অবস্থা

মাওলানা মিরাজুল হক সাহেব রহ. ১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ইলমের প্রাণকেন্দ্র দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানকার ইলমী ও রুহানি পরিবেশে লালিতপালিত হন। হযরতের পিতা মুনশি নুরুল হক সাহেব রহ. ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেযগার মানুষ। শুরু থেকেই তিনি সন্তানের উত্তম শিক্ষাদীক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলে মিরাজুল হক সাহেব রহ. দারুল উলূমের একজন সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানের সাগরে ডুব দেন এবং নিজের জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেন।

হযরত মিরাজুল হক দেওবন্দী রহ. ১৩৫১ হিজরীতে দারুল উলূম থেকে শিক্ষাসমাপন করেন এবং আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশনায় হায়দারাবাদ দাকানের গুলবারগাহে অবস্থিত একটি মাদরাসায় শিক্ষকজীবনে প্রবেশ করেন। সহজাত মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে দরস-তাদরিসে পূর্ণতা অর্জন করেন এবং একজন সফল ও কামিয়াব উস্তাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

দারুল উলূমের মাটিতে

দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনা-পরিষদ হযরতের মাঝে সুপ্ত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে হযরতকে দারুল উলূমে ডেকে নেয় এবং শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করে। সে হিসাবে ১৩৬৩ হিজরীর পহেলা মুহাররম থেকে তিনি দারুল উলূমকে জ্ঞান বিতরণের প্রাণকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেন এবং আপন যোগ্যতাবলে নেহাত স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাদর লাভ করেন ছাত্র-শিক্ষক সকলের মাঝে।

অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ফিকহশাস্ত্রে ছিল হযরতের পূর্ণ ব্যুৎপত্তি। তাই *হিদায়া আখেরাইনের* সবক ছিল তার অত্যন্ত সমাদৃত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি *হিদায়ার* দরস দিয়ে গেছেন। জটিল ও দুর্বোধ্য মাসআলা-মাসায়েলকে সহজ করে বুঝিয়ে দেয়া এবং ছাত্রদের মনকে নির্দ্বিধ ও আশ্বস্ত করা ছিল হযরতের দরসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাফসীরে বাইযাবির মতো দুরূহ ও দুর্বোধ্য কিতাবকেও ছাত্রদের সামনে পেশ করতেন অত্যন্ত সহজভাবে।

হযরত দেওবন্দী রহ.-এর মাঝে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও ছিল পূর্ণমাত্রায়। দীর্ঘকাল তিনি নাযিমে দারুল ইকামার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এ সময় ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যার চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। হযরতের চেহারায় যদিও সবসময় উৎফুল্লতার আমেজ ছড়িয়ে থাকত, তারপরও ছাত্রদের ওপর তার প্রভাব ও প্রতাপ ছিল এই পরিমাণ যে, হযরতের আওয়াজ কানে পড়তেই ছাত্রদের মাঝে নেমে আসত নীরবতা, নিস্তব্ধতা। ইলমী ও শাস্ত্রীয় যোগ্যতার কারণে ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষ সকলেই হযরতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

১১ শাওয়াল ১৩৮২ হিজরীতে হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.-এর ইনতেকালের পর দারুল উলূমের মজলিসে শুরা মাওলানা মিরাজুল হক সাহেব রহ.-কে নায়েবে মুহতামিমের সম্মানজনক পদে নিয়োগ দেয় তার বহুমুখী যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করে। এই পদে আরোহণ করে তদানীন্তন মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর স্থলবর্তিতার দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেন এবং প্রতিটি কাজে নিজেকে সর্বোত্তম সহযোগী হিসাবে প্রমাণ করেন। হযরতের সুন্দর ও সুচারু কার্যসম্পাদনে দারুল উলূমের শুরা-সদস্যবৃন্দ খুবই প্রভাবিত হন।

যার ফলে হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ.-এর ইনতেকালের পর ১৪০১ হিজরীতে তাকে সদরুল মুদাররিসীনের গৌরবজনক পদে আসীন করেন। হযরত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন এবং অর্পিত দায়দায়িত্ব পালন করে যান।

হযরতের ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতই বলতে হবে, তিনি দারুল উলূমে দরস-তাদরিসের পাশাপাশি পরিচালনাগত যিম্মাদারিও সবসময় পালন করেছেন। কখনো কোনোদিক থেকে তার গ্রহণযোগ্যতায় ভাটা পড়েনি। বরং যতই দিন গড়িয়েছে, ছাত্র, শিক্ষক ও দায়িত্বশীলদের মাঝে তার সম্মান ও সমীহ বেড়েই গিয়েছে। সবসময় তিনি অন্যের উপকার করতেন। অন্যের প্রতি সহায়তার হস্ত সম্প্রসারিত করতেন। বিশেষভাবে ছাত্রদের মাসআলা-মাসায়েল বুঝিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে রাখতেন বাড়তি আগ্রহ।

মৃত্যুবরণ

জীবনের তিরাশিটি বসন্ত পার করার পর অবশেষে ৭ সফর ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ১৮ আগস্ট ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে ইলমের এই দেদীপ্যমান সূর্যটি চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়। দাফন করা হয় দেওবন্দের মাকাবারায়ে কাসেমীয়্যাতে।

হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান বুলন্দশহরী রহ.

(জন্ম : ১৩৩৭ হি./১৯১৯ খ্রি., মৃত্যু : ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান বুলন্দশহরী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন। তিনি দারুল উলূমে ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে তাদরিসি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং প্রায় বত্রিশ বছর *সহীহ বুখারীর* দরস প্রদান করেছেন। এ সময় হযরতের কাছে *সহীহ বুখারী* পড়ে দাওরা হাদীস পাশ করেছে আনুমানিক বিশ হাজার তালিবে ইলম। হযরতের দরসে হাদীস ছিল খুবই মাকবুল। হাদীসকেন্দ্রিক আলোচনা ছিল খুবই সহজ, ধারাবাহিক, পরম্পরাযুক্ত ও দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি বড় পারদর্শী ছিলেন। অনাড়ম্বরতা, বিনয়-নম্রতা ও ভেতর-বাহিরের অভিন্নতা ছিল তার স্বভাবচরিত্র। রসিকতা, কৌতুকপ্রিয়তা ও অমায়িক আচরণ ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য।

প্রাথমিক অবস্থা

২১ রবিউল আউয়াল ১৩৩৭ হিজরী মোতাবেক ২২ জানুয়ারি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বুলন্দশহর জেলার বাসয়ি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করেন। এরপর ফারসি ও আরবির সকল পাঠ, শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বুলন্দশহরের অন্তর্গত গিলাউঠির মাম্বাউল উলূম মাদরাসায় সমাপ্ত করেন। এরপর ১৩৬১ হিজরী মোতাবেক ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং এক বছর পড়াশোনা করে ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদীস সমাপন করেন।

হযরতের তালিম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন হযরতের বড় ভাই মাওলানা বশির আহমদ খান সাহেব রহ., যিনি প্রথমে মাম্বাউল উলূম গিলাউঠি মাদরাসায় এবং পরে দারুল উলূম দেওবন্দে

শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময় স্বাধীনতা-যুদ্ধের 'অপরাধে' শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. নেনিতাল জেলে বন্দি ছিলেন। এজন্য মাওলানা নাসির আহমদ খান সাহেব রহ. সে বছর *বুখারী* ও *তিরমিযী* পড়েন শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইজায আলী সাহেব রহ.-এর কাছে।

কিন্তু মাদানী রহ.-এর কাছে পড়ার মনোবাঞ্ছা ও মনোবাসনা ছিল হযরতের। তাই পরের বছর ১৩৬৩ হিজরীতে পড়ার সুযোগ হলে পুনরায় হযরত মাদানী রহ.-এর কাছে *বুখারী* ও *তিরমিযী* পড়েন। আপন ইলম ও শাস্ত্রের মধ্যে চমক নিয়ে আসতে অন্যান্য বিষয়ের কিতাবও পড়েন। এরপর ইলমের গভীরতা ও পরিপক্বতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে আরও দুই বছর বিচিত্র সব কিতাব পড়েন। এ সময় তাজবিদে 'হাফস' ও 'সাবআ আশারার' তালিমও হাসিল করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে যে-সকল আসাতিযায়ে কেরামের কাছে পড়েছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইজায আলী আমরুহি, হযরত মাওলানা বশির আহমদ খান বুলন্দশহরী, হযরত মাওলানা উবাইদুর রহমান আমরুহি, হযরত মাওলানা আবদুল হক মুলতানি, হযরত মাওলানা আবদুল হক আকোড়াখটক, হযরত মাওলানা কারি শামসুদ্দিন গুযরানাওয়ালা, হযরত মাওলান কারী হিফযুর রহমান প্রতাপগড়ি, হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব এবং হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ উমর সাহেব প্রমুখ রহিমাহুমুল্লাহ।

দারুল উলূমে দরসের মসনদে

হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান সাহেব রহ. ১৩৬৫ হিজরীর যিলহজ মোতাবেক ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে দারুল উলূমের প্রাথমিক স্তরের অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন। তিনি একেবারে প্রথমদিককার কিতাবাদি পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষকজীবনের সূচনা করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে *মিযানুস সরফ* থেকে শুরু করে দরসে নিযামির প্রায় সকল কিতাবেরই দরস প্রদান করেন। তিনি খুব মেহনত-মোজাহাদার সাথে এবং অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দরস প্রদান করতেন।

হযরতের বেশ কিছু কিতাবের পাঠদান ছিল বিপুল সমাদৃত ও ব্যাপক সাড়াজাগানো। *মাকামাতে হারিরি, মাইবুযি, মুসামারাহ শরহে জামি, জালালাইন শরীফ, আল-ফাউযুল কাবির, মিশকাত শরীফ* ইত্যাদি তিনি দীর্ঘকাল পড়িয়েছেন। বিভিন্ন শাস্ত্রের পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও পাঠ দান করেছেন। এই শাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কিতাব 'আত-তাসরিহ' তো সবসময় তারই যিম্মাদারিতে ছিল। অধিকন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর লিখিত 'ফাতহিয়্যাহ'-এর পাদটীকাও রচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা হযরতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে দান করেছিলেন অসাধারণ যোগ্যতা।

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে দরস-তাদরিসের দায়িত্ব পালন করার কারণে প্রথম স্তর থেকে অগ্রসর হতে হতে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন এবং ১৩৯১ হিজরীতে দাওরা হাদীসের কিতাব পড়ানোর যিম্মাদারি লাভ করেন। ১৩৯১ হিজরী থেকে ১৩৯৭ হিজরী পর্যন্ত তিনি *তহাবি শরীফ, মুসলিম শরীফ* ও *মুআত্তা ইমাম মালেকের* দরস দিতে থাকেন এবং তালিবানে উলূমে নবুওয়াহকে উপকৃত করতে থাকেন।

১৩৯৭ হিজরীতে দারুল উলূমের শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা শরীফুল হাসান দেওবন্দী রহ. ইনতেকাল করলে *বুখারী শরীফেরও* যিম্মাদারি লাভ করেন এবং তখন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে *বুখারী শরীফের* দরস দিয়ে যান। প্রথম বছর পুরো *বুখারী শরীফের* দরস দেন। এরপর সবসময় প্রথম খণ্ডের দরস দিতে থাকেন। হযরত বড় শান ও মান নিয়ে *বুখারী শরীফের* দরস দিতেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে তার জ্ঞানসুধা পান করে পরিতৃপ্ত হতে থাকে হাজার হাজার তালিবে ইলম।

১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারণে ওযর পেশ করে তিনি মাদরাসা থেকে অব্যাহতি নেন। এভাবে ১৩৯১ হিজরী থেকে ১৪২৯ হিজরী পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি হাদীসের মসনদকে আলোকিত করে রাখেন এবং ইলমপিপাসুদের পিপাসা নিবারণ করে পরিতৃপ্ত করতে থাকেন। এ সময়ে হাজার হাজার তালিবে ইলম তার শিষ্যত্বের গৌরব লাভ করে ধন্য হয়েছে।

হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান সাহেব রহ.-এর ব্যক্তিসত্তায় ইলমী ও ইনতেজামি তথা জ্ঞানগত ও ব্যবস্থাপনাগত উভয় যোগ্যতার অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল। তিনি দরস-তাদরিসের পাশাপাশি পরিচালনাগত দায়দায়িত্বও

অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেন এবং দীর্ঘকাল দারুল উলূমে নাযিমে দারুল ইকামার দায়িত্ব পালন করেন।

১৩৯১ হিজরীর ৬ সফরে মজলিসে শুরা কর্তৃক নায়েবে মুহতামিম মনোনীত হলে দীর্ঘ সময় সে দায়িত্বও পালন করেন। দারুল উলূমের তদানীন্তন সদরুল মুদাররিসীন হযরত মাওলানা মিরাজুল হক দেওবন্দী রহ.-এর ইনতেকাল হলে ১৪১২ হিজরীতে শুরা-সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে তিনি সদরুল মুদাররিসীন নির্বাচিত হন। এ দায়িত্বও তিনি একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পালন করেন। শেষজীবনে শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার পাশাপাশি এসব দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি গ্রহণ করেন।

প্রশংসনীয় গুণাবলি

হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান সাহেব রহ. স্বভাবগতভাবেই ছিলেন অত্যন্ত নেককার-পরহেযগার ইনসান, বুযুর্গদের আখলাক-চরিত্রের নমুনা এবং তাদের ইলমের স্মৃতিচিহ্ন। সেইসঙ্গে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ও অসাধারণ আলেম। প্রশংসনীয় বহুগুণের মধ্যে হযরতের বিশেষ একটি গুণ ছিল তাওয়াজু। তাই তো তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, বিনম্র ও বিনীত। স্নেহ, মমতা, দয়ার্দ্রতা, কল্যাণকামিতা, মুহাব্বত-ভালোবাসা এবং ইখলাস ও আন্তরিকতার ন্যায় সুকুমারবৃত্তিগুলো দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তার কাছে ছোটরাও ছিল বড়দের মতো। ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকেই তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। আচরণ বা উচ্চারণ দ্বারা যেন কেউ কষ্ট না পায়, এ বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতেন।

তিনি নামাযের প্রতি অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। জুমআর নামাযে বেশ পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে যাওয়া এবং সালাতুস তাসবিহ ইত্যাদি আমলে মশগুল থাকা ছিল তার নিয়মিত আমল। রুকু-সিজদাসহ পুরো নামায এমন খুশু-খুযু আর ধীরস্থিরতার সঙ্গে আদায় করতেন যে, মনে হতো, এর চেয়ে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর নামায আর হতে পারে না। বাতেনী কামালাত ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক গুণাবলি দ্বারাও পূর্ণ করে দিয়েছিলেন পরম উদারতার সঙ্গে। যেমন সুর ও কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, তেমনই আকার-অবয়ব ও আচরণের সৌন্দর্য। আওয়াজ ছিল উঁচু ও আকর্ষণীয়, বাচনভঙ্গি ছিল চমৎকার ও উপভোগ্য, আর দরসের বৈশিষ্ট্য ছিল ভাবগম্ভীর।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর চরম ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। আর ইহসান ও সুলূকের ক্ষেত্রে ছিলেন হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর হাতে বাইয়াতপ্রাপ্ত ও তার খলীফা।

পরলোকগমন

হযরত মাওলানা রহ. ৯৬ বছরের সুদীর্ঘ হায়াত লাভ করেছেন এবং দারুল উলূমে প্রায় ৬৫ বছর তাদরিসি ও ইনতেজামি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৪২৯ হিজরীতে বিভিন্ন রোগশোকের কারণে দারুল উলূম থেকে ইস্তফা নিয়েছিলেন এবং শেষ সময়ের প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করছিলেন। অবশেষে ১৯ সফর ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বৃহস্পতিবার রাতে প্রতীক্ষিত দিন উপস্থিত হয়। নশ্বর পৃথিবীকে আল-বিদা বলে পরপারে পাড়ি জমান এবং পরেরদিন দেওবন্দে মাকবারায়ে কাসেমীয়্যাতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.

(জন্ম : ১৩২৫ হি./১৯০৭ খ্রি., মৃত্যু : ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.)

ফকিহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. ছিলেন একজন সাহেবে নিসবত বুযুর্গ, আল্লাহওয়ালা আলেম, অনন্যসাধারণ মুফতী এবং সর্বগুণের আধার ইলমী ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাআলা হযরতকে অসংখ্য গুণ, বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে প্রধান মুফতী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, আবার মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরেও ফাতাওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। ইফতার মসনদ অলংকৃত করার পাশাপাশি তিনি দারুল উলূমে *সহীহ বুখারী*, *সুনানে নাসায়ি*সহ ফিকহের বিভিন্ন কিতাবও পড়িয়েছেন।

প্রাথমিক অবস্থা

৮-৯ জুমাদাস সানী ১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯ জুলাই ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে জুমআর রাতে গাঙ্গুহে জন্মগ্রহণ করেন। হযরতের পিতা মাওলানা হামেদ হাসান সাহেব ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর শাগরিদ। হযরত মুফতী সাহেব রহ. গাঙ্গুহেই ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপন করেন। ১৩৪১ হিজরী মোতাবেক ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরে গমন করেন। তারপর ১৩৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৩৫০ হিজরী মোতাবেক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাদানী রহ. ও অন্য উস্তাদগণের কাছে তাকমিল সমাপন করেন। পুনরায় ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরে গমন করে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী, মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরি ও মাওলানা মানযুর আহমদ রহিমাহুমুল্লাহ থেকে ইসতেফাদা করেন। এভাবে দারুল উলূম দেওবন্দের ও মাযাহেরে উলূম

সাহারানপুরের শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে তিনি ইলমী ও রুহানি ফয়েয হাসিল করেন।

মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দেই মাযাহেরে উলূমে নিয়োগ হন। এখানে কাছাকাছি বিশ বছর দরস-তাদরিস ও ইফতার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর জামিউল উলূম কানপুরে সদরুল মুদাররিসীনের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ফিকহ ও ফাতাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। কানপুরের জনসাধারণের ওপর হযরতের জ্ঞানগরিমা, যুহদ-তাকওয়া ও বুযুর্গির প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয়প্রকার ইলম দ্বারা জনসাধারণকে উপকৃত করেছেন। কানপুরের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান জামিউল উলূম মাদরাসাটি দীর্ঘকাল ধরে অপরিচিত ও অধঃপতিত অবস্থায় ছিল। হযরত মুফতী সাহেবের বরকত ও কল্যাণস্পর্শে তাতে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে এবং আরোহণ করে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধির ঊর্ধ্ব শিখরে।

দারুল উলূমের সারযমিনে

১৩৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগে হযরতকে মুফতীর পদে আসীন করা হয়। এই দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার পর ফাতাওয়া লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সময় তিনি *সহীহ বুখারী*, *সুনানে নাসায়ি* এবং হাদীস ও ফিকহের অন্যান্য কিতাবেরও দরস প্রদান করতেন। সেইসঙ্গে দারুল ইফতার ছাত্রদের বিশেষভাবে তরবিয়তও করতেন।

১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূমে মতবিরোধ তৈরি হলে তিনি ইস্তফা দিয়ে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরে চলে যান। অবশ্য পরবর্তী সময়ে দারুল উলূমের কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে দেওবন্দে থাকতেই সম্মত হন। কিন্তু বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারণে দারুল ইফতার সঙ্গে পূর্বে যে নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিল তা রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি। তারপরেও এ সময় দরসে হাদীসের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের ফাতাওয়া লিখেছেন বরাবর।

১৩৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুফতী সাহেব রহ.

মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। দেশ ও দেশের বাইরেও বিভিন্ন মাদরাসা ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সাউথ আফ্রিকা, জাম্বিয়াসহ বিভিন্ন দেশে হযরতের অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান রয়েছে। হযরত ছিলেন খুবই বিনয়ী, বিনম্র, অধ্যয়নপ্রিয়, যিকির-অযিফায় ব্যস্ত, উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ও বেনিয়াজ বুযুর্গ।

পূর্বসূরিদের স্মৃতি জাগরণকারী ব্যক্তিত্ব

হযরত মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. খেলাফত ও ইজাযত লাভ করেছিলেন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. থেকে। তার আবাসস্থল সবসময় যিকিরকারীদের দ্বারা আবাদ থাকত। তিনি দারুল উলূমে 'ছাত্তা মসজিদে' অবস্থান করতেন, যেখানে ইতিপূর্বে বড় বড় উলামা-মাশায়েখের আবাসস্থল ছিল। হযরতের কাছে সবসময় উলামা, তলাবা ও মুসলিম জনসাধারণের উপস্থিতি থাকত। কেউ আসত ইলমের পিপাসা নিবারণ করতে, কেউ আসত যিয়ারত ও সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ আসত বাইয়াত ও ইসলাহের সম্পর্ক স্থাপন করতে। ছাত্তা মসজিদে সবসময় প্রাণের উচ্ছ্বাস ও উচ্ছলতা বিরাজ করত এবং ইলম ও যিকিরের নুরানি মজলিস কায়েম হতো। হযরতের বরকতে ছাত্তা মসজিদ তার হারানো জৌলুস নতুন করে ফিরে পেয়েছিল এবং মারেফতের বাজার আরেকবারের জন্য হয়েছিল সরগরম।

হযরতের দর্শনে আসলাফ ও আকাবির উলামায়ে কেরামের স্মৃতি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তার বড় একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, দারুল উলূম থেকে প্রতি মাসে যে মুশাহারা পেতেন তা তো দারুল উলূমে দিতেনই, সেইসাথে আরও অতিরিক্ত রুপি দাখিল করে দিতেন। ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের পরিচয় বহনকারী হযরতের এই অনন্য অসাধারণ আমলটি বরাবরই চালু ছিল; কখনো এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, কালাম ও অন্যান্য সকল দ্বীনী বিষয়ে হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর ছিল পূর্ণ দক্ষতা। ফিকহী উসুল ও আনুষঙ্গিক মাসআলা-মাসায়েল ছিল মুখস্থ। স্মৃতিশক্তি ছিল ক্ষুরধার আর পড়াশোনা ছিল বিস্তৃত। তীক্ষ্ণ মেধা ও মুজতাহিদসুলভ বিচক্ষণতাও ছিল। এককথায় আল্লাহ তাআলা তাকে বহুগুণের আধার বানিয়েছিলেন। ইলম-আমল, ইখলাস-

লিল্লাহিয়্যাত, তাকওয়া-পরহেযগারি, খেদমতে খলক, আত্মশুদ্ধি, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, ফাতাওয়া লিখন, সুন্নতের অনুসরণ ইত্যাদি সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ তাআলা তাকে সুউচ্চ মাকাম দান করেছিলেন।

ফেরাকে বাতিলা তথা ভ্রষ্ট দলসমূহের খণ্ডনে হযরত মুফতী সাহেব রহ. অসাধারণ দক্ষতা রাখতেন। কাদিয়ানি, রেযাখানি ও মওদুদি মতবাদ ও মতাদর্শ সম্পর্কে তার পড়াশোনা ছিল গভীর ও বিস্তৃত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাতিল ফেরকার সাথে তিনি মুনাযারাও করেছেন এবং প্রতিপক্ষকে লা-জবাব করার ক্ষেত্রে অতুলনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সমকালীন উলামায়ে কেরাম হযরতের ফিকহী দূরদর্শিতা ও ইলমী গভীরতার সপ্রশংস স্বীকৃতিও দিয়েছেন অনেক। হযরতের প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতার গুণে বহু সমাধান-কঠিন মাসআলারও সহজ সমাধান হয়ে যেত অল্প সময়ের মধ্যেই। বাচনভঙ্গিও ছিল এমন যে, কঠিন থেকে কঠিন কথাও বদ্ধমূল হয়ে যেত শ্রোতার অন্তরে। আল্লাহ তাআলা হযরতকে হাসিখুশিরও গুণ দান করেছিলেন বিপুল পরিমাণে।

হযরত মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.-এর অবিস্মরণীয় ইলমী অবদানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে অনন্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অবদান হচ্ছে 'ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া', যা আত্মপ্রকাশ করেছে বিশ খণ্ডের সুবৃহৎ কলেবরে। এর মধ্যে কিছু কিছু ফাতাওয়া এতই বিস্তারিত যে, তা স্বতন্ত্র পুস্তিকার মান রাখে। যদিও সংক্ষিপ্ততাই ছিল হযরতের লেখার বৈশিষ্ট্য। হযরতের লিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া বিভিন্ন সাময়িকীতেও প্রকাশিত হয়েছে। কানপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক 'নিযাম' পত্রিকাটি বহু বছর হযরতের তত্ত্বাবধানেই বের হয়েছে। এ ছাড়াও হযরতের লিখিত 'আরমাগানে আহলে দিল', 'হুকুকে মুস্তফা', 'ওয়াসফে শায়েখ' প্রভৃতি কিতাবও প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি হযরতের 'মাকতুবাত', 'মালফুযাত' ও 'খুতুবাত'-ও প্রকাশিত হয়েছে।

হযরতের রুহানি ফয়েয ও আধ্যাত্মিক কল্যাণধারা এখনো জারি আছে তার খলীফাদের মাধ্যমে। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সাউথ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রায় দেড়শো উলামায়ে কেরাম ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের তিনি খেলাফত দান করেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী দা. বা.-ও হযরতের বিশেষ খলীফা।

ইহধামত্যাগ

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর যিলহজে হযরত মুফতী সাহেব রহ. আফ্রিকা সফর করেন। সেখানে যাওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জোহান্সবার্গের পার্কলিন হাসপাতালে অ্যাডমিট হন। কিন্তু এতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে কী, অবনতিই হতে থাকে। অবশেষে দোসরা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৮ রবিউস সানী ১৪১৭ হিজরীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সাউথ আফ্রিকার হ্যাজল ডিন (Hazel dene) শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে ইলসবার্গ (Elsburg) কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

হযরত মুফতী নিযামুদ্দিন আযমী রহ.

(জন্ম : ১৩২৮ হি./১৯১০ খ্রি., মৃত্যু : ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দিন আযমী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের একজন গর্বিত মুফতী ও আলেমে দ্বীন। আধুনিক মাসায়েল নিয়ে গবেষণা করা ও তার হুকুম উদ্‌ঘাটন করার ক্ষেত্রে ছিল তার বিশেষ যোগ্যতা। ইফতার মসনদে আরোহণ করে ফাতাওয়া লেখার দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন, তেমনই দারুল ইফতার ছাত্রদের তালিম-তরবিয়তের দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের লেখকও ছিলেন।

প্রাথমিক অবস্থা

১৩২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে আযমগড়ের উন্দারা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা এলাকার মক্তব থেকেই গ্রহণ করেন। তারপর মুবারকপুরের ইয়াহয়াউল উলূম মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। এরপর আযিযিয়্যা বিহার শরীফ মাদরাসায় ও দিল্লিস্থ ফতেহপুরি আলিয়া মাদরাসায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ সমাপ্ত করেন। সর্বশেষ দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে ১৩৫২ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদীস সমাপন করেন। ফারেগ হওয়ার পর বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রের কিতাবাদিও পড়েন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে প্রথমে আযমগড় জেলার জামিউল উলূম জেনপুর মাদরাসায় এবং গোরখাপুর জেলার জামিউল উলূম ধামাল মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তারপর শাহ ওসিউল্লাহ ইলাহাবাদি রহ.-এর নির্দেশে দারুল উলূম মৌনাথ, ভানজনে মুদাররিস ও মুফতী হিসাবে তাশরীফ নিয়ে যান। এখানে প্রায় পঁচিশ বছর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কিতাবের পাঠদান করেন।

পঠনপাঠনের পাশাপাশি ফাতাওয়া লেখার ধারা ও ধারাবাহিকতাও চালু রাখেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে

হযরত মুফতী নিযামুদ্দিন আযমী রহ.-কে ১৩৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতায় মুফতী-পদে আসীন করা হয়। যাতে তিনি আমৃত্যু বহাল থাকেন। ফাতাওয়া লেখালেখির সাথে ইফতা বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বও আঞ্জাম দেন। এভাবে দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি পঠনপাঠন ও ফাতাওয়া-লিখনের সঙ্গে জুড়ে থাকেন প্রায় ৩৫ বছর। এ সময় লিখিত ফাতাওয়ার সংখ্যা পঁচাত্তর হাজার। হযরতের ফাতাওয়াসমূহের অনুলিপি দারুল ইফতায় সংরক্ষিত আছে বড় সাইজের একশো পঁচিশটি রেজিস্ট্রার খাতায়।

বস্তুত ফাতাওয়া লেখালেখিতে ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। খুবই বিশদ ও বিস্তারিত হতো তার ফাতাওয়াসমূহ। ফিকহী নীতিমালা সম্পর্কেও ছিল তার গভীর দৃষ্টি। যে-সকল প্রশ্ন আসত প্রথমে নিজে তা সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পড়তেন এবং দক্ষ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতেন, তারপর সে সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করতেন। আধুনিক মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরতের ফাতাওয়া ছিল ইজতেহাদমূলক ও গবেষণাধর্মী।

ফিকহী দূরদর্শিতা ও নিজস্ব যোগ্যতার গুণে হযরত নিযামুদ্দিন রহ. 'রাবেতায়ে ফিকহে ইসলামীর' দীর্ঘকালীন সদস্য ছিলেন। হযরত মাওলানা শাহ ওসিউল্লাহ রহ.-এর বাইয়াত ও খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। সেইসঙ্গে ছিলেন অনাড়ম্বর, ভাবগম্ভীর, কোমলহৃদয় ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি সবসময় একনিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে কর্মব্যস্ত থাকতে পছন্দ করতেন এবং মতবিরোধ ও মতানৈক্য থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত একধ্যানে, একমনে ফিকহ ও ফাতাওয়ার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তিনি।

রচনাবলি

হযরত নিযামুদ্দিন রহ.-এর লিখিত ফাতাওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ করে হযরতের ভক্তবৃন্দ বারবার হযরতের কাছে অনুরোধ করতে

থাকে, ফাতাওয়াসমূহকে গ্রন্থরূপ দেয়ার বিষয়ে। এতে জনসাধারণ তা থেকে উপকৃত হতে পারবে। ভক্তবৃন্দের আবেদন-অনুরোধের ফলে তা 'ফাতাওয়ায়ে নিযামিয়্যা' নামে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরে আর এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী সময়ে হযরতের গর্বিত শাগরিদ মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী রহ. তাহকীক ও হাশিয়াসহ হযরতের নির্বাচিত ফাতাওয়া দুই খণ্ডে বের করেছেন 'মুনতাখাবাতে নিযামুল ফাতাওয়া' নামে। হযরতের ফাতাওয়ার এই সংকলনে এমন অসংখ্য আধুনিক মাসআলা রয়েছে যার সমাধান পেশ করা হয়েছে ফিকহী গবেষণা ও বর্তমান অবস্থার আলোকে। অধিকন্তু 'নিযামুল ফাতাওয়া' নামে হযরতের ফাতাওয়াসমূহ ধারাবাহিকভাবে ছাপানোর কাজ শুরু করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা আর চালু থাকেনি।

ফাতাওয়া বাদেও হযরতের ইলমী কামাল ও পূর্ণতার স্বাক্ষর বহন করে শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. কৃত فتح المنان في إثبات مذهب النعمان-এর তাহকীকপূর্ণ প্রকাশ। হযরত মুফতী সাহেব রহ. গলদঘর্ম চেষ্টা-মেহনতের সাথে কিতাবটির তথ্যতালাশ, ধারাবিন্যাস এবং সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজ করেন। সেইসঙ্গে স্থানে স্থানে টীকাটিপ্পনীও সংযুক্ত করেন। আলোচ্য কিতাবে ফিকহে হানাফীর সমর্থনকারী হাদীসসমূহকে সংকলন করা হয়েছে *মিশকাত শরীফের* ধারা অনুসরণ করে। হযরত মুফতী সাহেব রহ. এই কিতাবের অতি জীর্ণ একটি নুসখা পেয়েছিলেন। পরে অবশ্য অনেক তালাশের পর জামিয়া মিল্লিয়ার পাণ্ডুলিপি-বিভাগ থেকে তার দ্বিতীয় আরেকটি পরিচ্ছন্ন নুসখাও পেয়েছিলেন। আড়াই বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর কিতাবটির তাহকীক ও বিন্যাস সম্পন্ন হয় এবং লেখা ও ছাপার উচ্চমানসহ বৃহৎ কলেবরের তিন খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়। বস্তুত হযরতের চেষ্টা-প্রচেষ্টার বদৌলতেই হাদীসের এই দুর্লভ ও গ্রহণযোগ্য সংকলনটি পাঠকসাধারণের হাতে আসে।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

হযরত মুফতী নিযামুদ্দিন আযমী রহ. ১৪২০ হিজরীর ২০ যিলকদ মোতাবেক ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে ৮৬ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন এবং দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসেমীয়্যাতে সমাহিত হন।

হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ রহ.

(জন্ম : ১৩৫৯ হি./১৯৪০ খ্রি., মৃত্যু : ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ রহ. গুজরাটের একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন, দায়ি ইলাল্লাহ ও মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের একজন কার্যনির্বাহী মুহতামিম।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ ইবনে আলহাজ হাবিবুল্লাহ সাহেব রহ. গুজরাটের 'বিনাসকাঁঠা' জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কসবা 'ছাপি'-এর সন্নিকটে অবস্থিত 'মিতা' নামক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এখানেই ৯ জুমাদাস সানী ১৩৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৬ জুন ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে রোজ শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ফারসি ও আরবি শিক্ষা অর্জন করেন দারুল উলূম ছাপি ইসলামীয়া মাদরাসায়। মিশকাত জামাত পর্যন্ত পড়েন এখানেই। এরপর মায়ের সাথে পাকিস্তানে গমন করেন।

১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জামিয়া ইসলামীয়া বানুরি টাউনে দাওরা হাদীস সমাপন করেন। *সহীহ বুখারী* ও *সুনানে তিরমিযী* পড়েন হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর সুযোগ্য শাগরিদ হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরি রহ.-এর কাছে। *সহীহ মুসলিম* পড়েন হযরত মাওলানা লুতফুল্লাহ পেশাওয়ারি রহ.-এর কাছে। *সুনানে আবু দাউদ* পড়েন হযরত মাওলানা ফযলে হক রহ.-এর কাছে। *শরহু মাআনিল আসার লিত-তহাবি* পড়েন *লুগাতুল কুরআন*-এর লেখক হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ.-এর কাছে।

দাওরা হাদীস শেষ করে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন এবং জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি দারুল উলূম ইমদাদিয়া মুম্বাইয়ে অবৈতনিক শিক্ষকতা শুরু

করেন। দরস-তাদরিসের ধারা নয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় তিনি আরবি শ্রেণিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কিতাবের দরস দিয়েছেন। মুম্বাইয়ে তিনি চায়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন, যাতে আল্লাহ তাআলা বরকত ঢেলে দেন। ফলে ধীরে ধীরে তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন।

ব্যবসাবাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি আকাবির উলামায়ে কেরাম ও তাবলীগ জামাতের আকাবিরিনের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ১৯৬৮ সালে প্রথম তিনি জামাতে সময় লাগান। পরেও এই পুণ্যধারা চালু রাখেন। দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি মিশর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, সউদি আরব, আমেরিকা, কানাডা, ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, ইংল্যান্ড, বার্মা, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কুয়েত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে দীর্ঘ দীর্ঘ সফর করেন।

হযরত মাওলানা রহ. সবসময় মুসলমানদের ইসলাহ, সংশোধন ও ধর্মীয় উন্নতি নিয়ে ভাবতেন। তাই তো তাবলীগ জামাতের সঙ্গে জুড়ে থাকার সাথে সাথে তৃণমূল পর্যায়ে দ্বীনী কার্যক্রম চালানোর জন্য সংস্কার-কমিটি গঠন করেছিলেন। দ্বীনী মারকায ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা এবং সেগুলোর উন্নতি সাধন করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতেন। আজীবন তিনি দারুল উলূম ছাপির খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। হযরতের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের এই পরিমাণ আস্থা ও নির্ভরতা ছিল যে, কোনো দায়িত্বের ওপর না থাকা সত্ত্বেও মুহতামিমের উপস্থিতিতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সকল কাজ তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। হযরত রহ.-এর ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের এই অবস্থা ছিল যে, সকল কাজ তিনি এমনভাবে আঞ্জাম দিতেন যে, নাম হতো মুহতামিম সাহেবের। দারুল উলূম ছাপির মুহতামিম মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেবের পর তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী মুহতামিম হন।

দারুল উলূম ছাপির মুহতামিম এবং দারুল উলূম দেওবন্দের ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম হওয়া ছাড়াও তিনি গুজরাটের বেশ কিছু মাদরাসার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং কোনো কোনোটির অভিভাবকও ছিলেন। এ ছাড়াও রাজোসি, আজমির, জয়পুর, টুংক, জয়সলিমির, বাড়মির ও মেওয়াতের আশেপাশে প্রতিষ্ঠিত চারশোর অধিক মক্তবের অভিভাবক ছিলেন। আপন ভাই ও অন্য সাথিসঙ্গীদের আর্থিক সহযোগিতায় সেগুলোর দেখাশোনা করতেন।

দারুল উলূমে

মুম্বাইয়ের হযরত হাজী আলাউদ্দিন সাহেব রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শুরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৯৮৮ সালের জুনে তিনি ইনতেকাল করেন। ফলে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪০৯ হিজরীর সফর মাসে মজলিসে শুরার মিটিং অনুষ্ঠিত হলে হাজী সাহেবের স্থানে হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ রহ.-কে মজলিসে শুরার সদস্য মনোনীত করা হয়। হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ রহ. দারুল উলূমের কল্যাণচিন্তায় সবসময় মজলিসে শুরার সকল মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতেন এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে ইখলাসপূর্ণ পরামর্শ দান করতেন।

দারুল উলূমের বিষয়ে হযরত খামুশ রহ.-এর আন্তরিকতা ও হৃদ্যতায় মজলিসে শুরা খুবই প্রীত ও প্রভাবিত ছিল। তাই দারুল উলূমের তদানীন্তন মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব রহ.-এর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দে মজলিসে শুরা হযরতকে দারুল উলূমের ক্ষমতাসম্পন্ন ভারপ্রাপ্ত মুহতামিমের পদ সোপর্দ করে। হযরত মাওলানা যদিও দারুল উলূম দেওবন্দের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু দারুল উলূমের প্রতি ছিল তার অসীম ভালোবাসা এবং নিঃস্বার্থ খেদমত-স্পৃহা। যার কল্যাণেই দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপনকারী সুযোগ্য বহু ছাত্রের উপস্থিতিতেও আল্লাহ তাআলা তাকে উক্ত পদের জন্য নির্বাচন করেন।

হযরত সবসময় দারুল উলূমের মৌলিক ও বাহ্যিক উন্নয়নে চিন্তামগ্ন থাকতেন। প্রশাসনগত সংস্কার এবং ছাত্রদের শিক্ষা ও সুবিধা নিয়ে সচেষ্ট থাকতেন। দারুল উলূমের অর্থের জোগান কীভাবে হবে, এ বিষয়েও বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন এবং নিজেও প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালাতেন। দারুল উলূম থেকে কোনো বেতন তো গ্রহণই করতেন না; উলটো দারুল উলূমে অবস্থান, দারুল উলূমের খাদ্যগ্রহণ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিনিময় তিনি নিজ পকেট থেকে পরিশোধ করে দিতেন।

বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা

মাওলানার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, বড় থেকে বড় যেকোনো যিম্মাদারি নীরবতার সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন। ছোট-বড় সকলের

প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেকের সমস্যা, প্রয়োজন ও অভিযোগের কথা শুনতেন। তারপর গুরুত্বের সঙ্গে তা সমাধান করার চেষ্টা করতেন। সকল বিষয়ে তিনি ধৈর্য, সহনশীলতা, প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতা নিয়েই পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। কোনো বিষয়েই ত্বরা ও আবেগপ্রবণতার পরিচয় দিতেন না। কে প্রশংসা করল, আর কে গুণগ্রাহী হলো, এসবের কোনো তোয়াক্কা না করে তিনি আপন কর্মে প্রবৃত্ত থাকতেন। হযরত ছিলেন খুবই স্পষ্টভাষী। তোষামোদ, মোসাহেবি ও পক্ষপাতদুষ্ট কথার পরিবর্তে অনাড়ম্বর সাদাসিধে কথাবার্তাই পছন্দ করতেন।

মাওলানার দ্বিতীয় বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাকওয়া-পরহেযগারি, বলা যায়, যা ছিল তার জীবনের প্রতীক ও নিদর্শন। আল্লাহর প্রতি রুজু ও আত্মনিবেদনেরও ছিল বিশেষ রুচি-প্রকৃতি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই আযানের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গমন করতেন এবং নামাযের পর দীর্ঘ সময় যিকির, তেলাওয়াত ও নফল নামাযে মশগুল থাকতেন। সবসময় প্রথম কাতারে দাঁড়াতেন এবং সকল নামায তাকবিরে উলার সাথে আদায় করতেন। সফরে থাকুন আর না থাকুন, সবসময় জামাতের পাবন্দি করতেন। কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি ছিল অসম্ভব টান ও আকর্ষণ। দৈনন্দিনের আমল যথাসময়ে গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করতেন।

পরলোকযাত্রা

হযরত মাওলানা গোলাম রাসুল খামুশ রহ. ২৬ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৮ অক্টোবর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে জুমআর দিন বাদ আসর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি দারুল উলূমের মেহমানখানায় ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে কয়েক ঘণ্টা অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর পরেরদিন শনিবার হযরতের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাকবারায়ে কাসেমীয়্যাতে আকাবির-আসলাফের পাশে দাফন করা হয়।

হযরত মাওলানা মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরী রহ.

(জন্ম : ১৩৬০ হি./১৯৪০ খ্রি., মৃত্যু : ১৪৪১ হি./২০২০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরী রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন। তিনি ছিলেন একাধারে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, সফল উস্তাদ, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের লেখক এবং সুযোগ্য ও দূরদর্শী ফকীহ ও মুফতী।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মুফতী সাহেব রহ. জন্মগ্রহণ করেন ১৩৬০ হিজরী মোতাবেক ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। হযরতের জন্মভূমি উত্তর গুজরাটের কালিড়া, বেনাসকাঁঠা। নিজ জেলার কেন্দ্রীয় শহর পালনপুরের দিকে সম্বোধিত হয়ে পালনপুরী নামে তিনি প্রসিদ্ধ। হিন্দুস্তান স্বাধীন হওয়ার আগে এই শহর একটি মুসলিম নওয়াব এস্টেট ছিল।

হযরতের লেখাপড়ার বিসমিল্লাহ হয় সম্মানিত পিতার হাতে। নিজ এলাকার মক্তবে নাযেরা ও দ্বীনিয়াতের শিক্ষা গ্রহণ করার পর দারুল উলূম ছাপিতে ভর্তি হন, যেখানে মামা মাওলানা আবদুল মাজিদ সাহেব শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর মাওলানা নাযির আহমদ পালনপুরী সাহেবের মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে শরহে জামি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। হযরতের উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুহাম্মদ আকবর মিয়া পালনপুরী এবং মাওলানা হাশেম বুখারী।

শরহে জামি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরে ভর্তি হন এবং মানতিক, ফালসাফা ও নাহুর অধিকাংশ কিতাব পড়েন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৩৮০

হিজরী মোতাবেক ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং হাদীস, ফিকহ ও তাফসীরের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ গ্রহণ করেন। ১৩৮২ হিজরী মোতাবেক ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদীস সমাপন করেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর নিয়ে পাশ করেন। দাওরা হাদীস সমাপনের পর এক বছর ইফতা বিভাগেও পড়াশোনা করেন এবং হযরত মুফতী মাহমুদ আহমদ নানুতবীর কাছে মুইনে মুফতী হিসাবেও ফাতাওয়া লেখার দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।[১৩] এ সময় ফাতাওয়া-নবিসির পাশাপাশি কুরআনেরও হেফজ করেন।[১৪]

হযরত মুফতী সাহেব রহ. আকাবির ও আসলাফের নকশে কদমের ওপর চলার ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট ছিলেন এবং তালেবে ইলমের জামানা থেকেই ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির বিষয়ে চিন্তাশীল ছিলেন। এই চেতনা থেকেই তিনি ইলম হাসিলের পাশাপাশি শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবীর হাতে বাইয়াত হন এবং তার দিগ্‌নির্দেশনা মোতাবেক আমল করতে থাকেন।

সেইসাথে সমকালীন অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিস থেকেও ইসতেফাদা করেন। বিশেষ করে হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী রহ.-এর মজলিসে বেশি বেশি হাজির হন।

এ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের ইনতেকালের পর তিনি হযরত মাওলানা মুফতী মুযাফফর হুসাইন মাযাহেরি রহ.-এর শরণাপন্ন হন এবং বাইয়াতের সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৪১৮ হিজরী সনে হযরত থেকে বাইয়াত ও ইরশাদের ইজাযত লাভেও ধন্য হন।[১৫]

শিক্ষাদীক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলূম রান্দিরে উচ্চস্তরের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হন এবং ১৩৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদক্ষতার সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন

---

১৩. অথচ ওই সময় দারুল উলূমে মুইনে মুফতী নিয়োগের কোনো নিয়ম ছিল না, যেমন এখনো নেই। হযরতকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল শুধু তার অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভার বিবেচনায়।—অনুবাদক

১৪. আল-খাইরুল কাসির : ৪৮—অনুবাদক

১৫. বাইয়াত ও খেলাফতবিষয়ক লেখাটুকু মাওলানা নূর আলম খলিল আমিনি কৃত 'আলেমে এগানা হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরি রহ.' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত ও সংযোজিত।—অনুবাদক

করেন। এ সময় হযরত মুফতী সাহেব রহ. রচনা করেন 'আল-ফাউযুল কাবির'-এর আরবি শরাহ 'আল-আউনুল কাবির', আল্লামা তাহের পাটনি রহ. কৃত 'আল-মুগনি'-এর আরবি শরাহ 'তাহযিবুল মুগনি', 'হুরমতে মুসাহারাত' ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থসমূহ।

দারুল উলূম দেওবন্দে আগমন

১৩৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী রহ.-এর নির্দেশনায় দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক হিসাবে বরণ করা হয় হযরত মুফতী সাহেব রহ.-কে। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তিনি দারুল উলূমে তাদরিসি খেদমত আঞ্জাম দেন। পাঠদান করেন তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মানতিক, ফালসাফা ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। দীর্ঘ বছর পর্যন্ত *সুনানে তিরমিযীর* দরস দিয়েছেন। ছাত্রদের মাঝে হযরতের দরসে তিরমিযী ছিল ব্যাপক জনপ্রিয়। কখনো কখনো দারুল ইফতায় মুফতী হিসাবে ফাতাওয়া লেখার দায়িত্বও পালন করেছেন। 'ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ'-এর নতুন রূপ ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইলমী তত্ত্বাবধানও তিনি করেছেন।

১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে অসুস্থতার কারণে হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান বুলন্দশহরী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে অব্যাহতি নিলে হযরত পালনপুরী রহ.-কে শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীনের পদ অর্পণ করা হয়। এই দায়িত্বে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে তা পালন করেন। হযরতের দরসে বুখারীর জন্য ছাত্ররা উন্মুখ হয়ে থাকত এবং প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে উপস্থিত হতো।

প্রশংসনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য

হযরত মুফতী সাহেব রহ. ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের একজন প্রভাবশালী ইলমী ব্যক্তিত্ব এবং ঈর্ষণীয় বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা সমকালীন আলেমদের মাঝে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অবস্থানে। তাকে দেখে আখেরাতের কথা মনে পড়ে যেত এবং আকাবির-আসলাফের পুণ্যস্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠত। বস্তুত ইলম-আমলের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার বর্ণাঢ্য ও পূতপবিত্র জীবনে।

তিনি ছিলেন গবেষক, জ্ঞানমনস্ক, বিদ্যানুরাগী, কাগজ-কলমের সাথি, দূরদর্শী মুহাদ্দিস, সূক্ষ্মদর্শী ফকীহ ও পারদর্শী মুফতী, সেইসাথে খুবই মুত্তাকী-পরহেযগার।

আল্লাহ তাআলা হযরতকে দান করেছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তি, প্রচণ্ড অনুধাবনশক্তি এবং সুতীক্ষ্ণ উদ্ভাবনী শক্তি। সেইসাথে তিনি ছিলেন খুবই পরিশ্রমী এবং তার জীবনধারা ছিল খুবই পরিপাটি। সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করতেন, সবসময় কর্মনিমগ্ন থাকতেন এবং রুটিনমাফিক কাজ করতেন। ফলে তার ইলমী ও আমলি কাজে অনেক বরকত হয়েছে। কোনো মাসআলা সামনে এলে অগভীর দৃষ্টি বুলানোর পরিবর্তে তাতে সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি দিতেন, তার সর্বদিক বিবেচনা করতেন এবং মাসআলার গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করতেন। ফলে মাসআলার সমাধান হতো খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রান্তিকতাশূন্য।

অধ্যয়নের গভীরতা, ইলমের পরিপক্বতা, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা, হিম্মত ও মনোবলের উচ্চতা হযরতের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সঠিক কথাটি উচ্চারণ করতে এবং প্রয়োজনের সময় আহলে ইলমের সাথে দলিলভিত্তিক মতানৈক্য করতে তিনি এতটুকু সংকোচ বোধ করতেন না। মাসআলার সমাধানের ক্ষেত্রে কিংবা কোনো প্রশ্নকারীর উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে কখনো তাড়াহুড়া করতেন না, টেনেটুনে ভুলভাল বুঝিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করতেন না। মাসআলার সমাধানে নিশ্চিত না হলে পরিষ্কার বলে দিতেন, 'মাসআলাটি নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে, বা মাসআলার সঠিক সমাধানটি আমার এখন জানা নেই।' তারপর মুতাআলা করে পূর্ণ নিশ্চিত হয়েই তবে উত্তর দিতেন।

হযরত রহ.-এর আরেকটি বড় গুণ এই ছিল যে, ইলমী ওয়াকার ও গাম্ভীর্যসত্ত্বেও তার মধ্যে বড়ত্ব, আমিত্ব ও অহমিকার লেশ ছিল না, যা সাধারণত আহলে ইলমদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে থাকে। লৌকিকতাপূর্ণ গম্ভীরতাও ছিল না। তাই ছাত্ররা নিঃসংকোচে হযরতের কাছে যেতে পারত এবং দরসের বাইরেও হযরত থেকে উপকৃত হতে পারত। জীবনধারার মধ্যেও তিনি ছিলেন খুবই সরল, স্বাভাবিক, অকৃত্রিম ও সহনশীল। রূঢ়তা, রুক্ষতা, কঠোরতা, মন্দ ভাষা থেকে সবসময় বেঁচে থাকতেন।

হযরত মুফতী সাহেব রহ. ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত ও আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে ছিলেন মহান পূর্বসূরিদের শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি।

আত্মনির্ভর ও নির্মুখাপেক্ষী জীবনযাপনের স্বার্থে ব্যবসাকে তিনি আয়ের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এমনভাবে যে, তা জ্ঞানসাধনায় তার কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। বস্তুত তিনি নিজেকে সম্পদ ও সম্পত্তির মোহে জড়াতে দেননি এবং জীবনের মূল্যবান সময়ও তার পেছনে ব্যয় করেননি। তাই তো সচ্ছলতার পূর্বে মাদরাসা থেকে যে ওযিফা গ্রহণ করেছিলেন সচ্ছলতার পর সব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

দারুল উলূম রানদিরে ১৩৮৪ হিজরী থেকে ১৩৯৩ হিজরী পর্যন্ত নয় বছর দরস-তাদরিসের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময় বেতন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তেইশ হাজার দুশো পঞ্চাশ রুপি। ২৮ এপ্রিল ২০০৩ সালে হিসাব করে সব রুপি মাদরাসার ফান্ডে জমা দিয়ে দেন। দারুল উলূম দেওবন্দে ১৩৯৩ হিজরী থেকে ১৪৪১ হিজরী তথা মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ আটচল্লিশ বছর দরস-তাদরিসের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৩৯৩ হিজরী থেকে ১৪২৩ হিজরী পর্যন্ত দারুল উলূম থেকে তিনি ত্রিশ বছর তিন মাসের বেতন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন নয় লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশো চার রুপি। ১৪২৩ হিজরীতে হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হিসাব করে সব রুপি দারুল উলূমের ফান্ডে জমা দিয়ে দেন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ লিওয়াজহিল্লাহ তাদরিসি খেদমত আঞ্জাম দেন।

হযরত সুদীর্ঘ কাল বিভিন্ন বিষয়ের দরস প্রদান করেছেন। যখন দরস দিতেন তখন খুবই সহজভাবে উপস্থাপন করতেন, পরিমিত শব্দ-বাক্য ব্যবহার করতেন। ফলে জটিল থেকে জটিল বিষয়ও মনে হতো সহজ-স্বাভাবিক। আর যখন কোনো বিষয়ে কলম ধরতেন তখন তাতেও কোনো ত্রুটি, অপূর্ণতা বা অস্পষ্টতা রাখতেন না; সর্বাঙ্গীণ সুন্দররূপে তুলে ধরতেন। সুবিন্যস্ততা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করতেন, পাশাপাশি সহজ ও বিশদ উপস্থাপনার প্রতিও গুরুত্ব দিতেন। এটাই মূল কারণ যে, হযরতের রচনাবলি খুবই সহজ, উপকারী ও ফলপ্রসূ।[১৬]

রচনাবলি

বস্তুত হযরত মুফতী পালনপুরী রহ. একজন সফল ও সার্থক শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন একজন সুদক্ষ ও সুনিপুণ লেখক-গবেষকও।

১৬. মাসিক দারুল উলূম, সংখ্যা : শাওয়াল-জিলকদ ১৪৪১ হি.—অনুবাদক

এ পর্যন্ত হযরতের ছোট-বড় প্রায় তিন ডজন কিতাব আত্মপ্রকাশ করেছে। সামগ্রিকভাবে যার পৃষ্ঠাসংখ্যা তেত্রিশ হাজার ছয়শ বিশ।[১৭]

কাসেমুল উলূম ওয়াল খয়রাত হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর রেখে যাওয়া ইলম ও মারেফতের সাথে গভীর সম্পর্ক-বন্ধন ছিল হযরত মুফতী সাহেব রহ.-এর। সেই সম্পর্কসূত্র থেকেই তিনি হযরত নানুতবী রহ.-এর বিভিন্ন কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং কঠিন ও জটিল বিষয়সমূহকে সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন। 'ইফাদাতে নানুতবী' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধও রচনা করেছেন, যা কিস্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছে দেশের অভিজাত সাময়িকী *আল-ফুরকানে*।

হযরত পালনপুরী রহ.-এর লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে অমূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব হচ্ছে নিম্নরূপ :

- العون الكبير شرح الفوز الكبير (আল-কাউনুল কাবির শরহুল ফাউযিল কাবির)
- تفسیر ہدایت القرآن (তাফসীরে হিদায়াতুল কুরআন)
- تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری (তুহফাতুল কারী শরহু সহিহিল বুখারী)
- تحفۃ الالمعی شرح سنن الترمذی (তুহফাতুল আলমায়ি শরহু সুনানিত তিরমিযী)
- زبدۃ الطحاوی (যুবদাতুত তহাবি)
- رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ (রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ শরহে হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ)
- حاشیہ امداد الفتاوی (হাশিয়ায়ে ইমদাদুল ফাতাওয়া)
- فیض المنعم شرح مقدمہ صحیح مسلم (ফয়যুল মুনয়িম শরহে মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম)
- شرح علل الترمذی (শরহে ইলালুত তিরমিযী)
- حرمت مصاہرت (হুরমাতে মুসাহারাত)
- ہادیہ شرح کافیہ (হাদিয়া শরহে কাফিয়া)

১৭. মাসিক দারুল উলুম, সংখ্যা : শাওয়াল-জিলকদ ১৪৪১ হি.—অনুবাদক

- طرازی شرح سراجی (তিরাজি শরহে সিরাজি)
- آپ فتوی کیسے دیں؟ (আপ ফাতাওয়া ক্যায়সে দেঁ?)
- مبادئ الاصول (মাবাদিউল উসুল)
- معین الاصول (মুইনুল উসুল)
- مبادئ الفلسفہ (মাবাদিউল ফালসাফা)
- معین الفلسفہ (মুইনুল ফালসাফা)।[১৮] প্রমুখ তার উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম। এর মধ্যে *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার* উর্দু শরাহ *রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াহ* হযরতের ইলমী তাহকীক-গবেষণার অনবদ্য উপহার এবং তার অত্যুচ্চ ইলমী অবস্থানের উজ্জ্বল দর্পণ।

ইলমী অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ২০১১ সালে ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে হযরত পালনপুরী রহ.-কে 'রাষ্ট্রপতি অ্যাওয়ার্ড' দ্বারা ভূষিত করা হয়।

দারুল উলূমের তত্ত্বাবধান ও পাঠদানের পাশাপাশি তিনি দেশ-বিদেশে দারুল উলূমের প্রতিনিধিত্বের ভূমিকাও পালন করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

আখেরাতের সফর

হযরত মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরী রহ. ইনতেকালের পূর্বে বেশ কিছুদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন এবং মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরিশেষে ২৫ রমজান ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নেন।[১৯]

হযরতের মৃত্যুতে সদর জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী মুদ্দাজিল্লুহু বলেন :

> মাওলানা পালনপুরী রহ. শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর ধীসম্পন্ন, সেইসাথে পড়ালেখা ও মেহনত-মোজাহাদার প্রতিও ছিলেন অনুরাগী। আপন মেধা ও প্রতিভার কল্যাণে বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিশেষ করে

---

১৮. গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে বাড়তি কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূল গ্রন্থে ছিল না।—অনুবাদক

১৯. মাসিক দারুল উলূম, সংখ্যা : শাওয়াল-জিলকদ ১৪৪১ হি.—অনুবাদক

ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহে তিনি অনন্য ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ফারাগাতের পর প্রথমে দারুল উলূম রান্দিরে খেদমত করেন, এরপর দারুল উলূম দেওবন্দে আসেন। তখন থেকে সাতচল্লিশ বছর তিনি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বিশেষভাবে জুড়ে ছিলেন ইলমে হাদীসের সাথে।

তিনি দারুল উলূমের বর্তমান শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন ছিলেন। নিয়মিত *বুখারী শরীফের* দরস দিতেন। বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার কারণে তার দরসে হাদীসকে মনে করা হতো অনন্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যদি বলা হয়, তিনিই দারুল উলূমের মসনদে হাদীসের অনন্যতা ধরে রেখেছিলেন, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। তা ছাড়া মাওলানা মরহুম অনেকগুলো রচনাও রেখে গেছেন, যা থেকে আগামী প্রজন্ম উপকৃত হতে থাকবে।[২০]

---

২০. কওমি আওয়াজ, সংখ্যা : ২০ মে ২০২০—অনুবাদক

হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ওয়াস্তানবী

(জন্ম : ১৩৭০ হি./১৯৫০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ওয়াস্তানবী সাহেব জামিয়া ইশাআতুল উলূম আক্কেলকোয়ার স্বনামধন্য মুহতামিম এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেগাহবান ও তত্ত্বাবধায়ক। হযরতের জন্মভূমি সুরত জেলার ওয়াস্তান। পিতার নাম হাজী মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব।

হযরত ওয়াস্তানবী সাহেব ১৩৭০ হিজরী মোতাবেক ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'কুওয়াতুল ইসলাম' মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। তারপর ১৯৬৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য 'দারুল উলূম ফালাহে দারাইন' তুরকিসারে ভর্তি হন। মুফতী আহমদ বিমাত, মাওলানা যুলফিকার কাসেমী, মাওলানা আবদুল্লাহ কাপুদরবি প্রমুখ আসাতেযায়ে কেরাম থেকে ইসতেফাদা করেন। সর্বশেষ ১৩৬২ হিজরী মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরে গমন করে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. ও হযরত মাওলানা ইউনুস জোনপুরি রহ. প্রমুখ শাস্ত্রবিদ আসাতেযায়ে কেরাম থেকে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেন।

হযরত মাওলানা ওয়াস্তানবী সাহেব শিক্ষকজীবনের সূচনা করেন সুরত জেলার আধানা গ্রাম থেকে। দারুল উলূম কান্থারিয়ায়ও থাকেন কিছুদিন। পরিশেষে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত নান্দুরবার জেলার প্রত্যন্ত ও অনুন্নত এলাকা আক্কেলকোয়ায় 'ইশাআতুল উলূম' মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। যা উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান বেয়ে আজ এক ছায়াদার বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং বিস্তৃত হয়েছে অসংখ্য শাখাপ্রশাখায়। এই মাদরাসা থেকে শত-সহস্র হাফেজ ও আলেম বের হয়েছে এবং প্রতি বছর বের হয়ে চলেছে।

হযরত মাওলানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসা ও মারকাযের পাশাপাশি মুসলিম তরুণ প্রজন্মের জন্য আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা

করেন। যার মধ্যে রয়েছে প্রাইমারি স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বি অ্যাড কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রমুখ।

হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান রহ.-এর ইনতেকালের পর ৪ সফর ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার এক এজলাসে হযরতকে দারুল উলূমের মুহতামিম-পদে নির্বাচিত করা হয়। যাতে বহাল থাকেন ২১ শাবান ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৩ জুলাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এভাবে আরবি সন হিসাবে ১৪৩২ হিজরীর সফর থেকে শাবান পর্যন্ত এবং ইংরেজি সন হিসাবে ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মোট সাত মাস দারুল উলূম দেওবন্দে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী

(জন্ম : ১৩৬৬ হিজরী/১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী দা. বা. দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান মুহতামিম ও দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। দারুল উলূম দেওবন্দে মুহতামিমের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে তিনি দারুল উলূমের মজলিসে শুরার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সেইসাথে ছিলেন জামিয়া ইসলামীয়া রিউড়ি তালাব বেনারসের স্বনামধন্য মুফতী ও শায়খুল হাদীস এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সহসভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী ইবনে আলহাজ মুহাম্মদ হানিফ ইবনে নিযামুদ্দিন বিখ্যাত শহর বেনারসের মদনপুরা মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মতারিখ, ২২ সফর ১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। প্রাথমিক শিক্ষা বাড়িতেই মা ও দাদার তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করেন। তারপর শাওয়াল ১৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'জামিয়া ইসলামীয়া ওয়ারানসি, মদনপুরায়' দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। শাওয়াল ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আরবি ভাষার শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের নামকরা প্রতিষ্ঠান মৌনাথ ভনজনের দারুল উলূমে আরবি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

এরপর ১৩৮১ হিজরী মোতাবেক ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ মিফতাহুল উলূম মৌ-এ এক বছর পড়ালেখা করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। এখানে ১৩৮২ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ আরবি চতুর্থ শ্রেণি তথা কানযুদ দাকায়িক জামাতে ভর্তি হন। ছয় বছর পড়াশোনা করে ১৩৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদীস সমাপন করেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ফারেগ হওয়ার পর ইফতা বিভাগে ভর্তি

হয়ে এক বছর ফাতাওয়া লেখালেখিরও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

যে-সকল উস্তাদের সান্নিধ্য-ছায়ায় তিনি লেখাপড়া করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী, হযরাতুল আল্লাম মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী, ফকিহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী ও হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবী রহিমাহুমুল্লাহর ন্যায় অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবী রহ. হযরত মুহতামিম সাহেব দা. বা.-এর যোগ্যতা ও প্রতিভার ওপর এমনই আস্থাশীল ছিলেন যে, ছাত্রজামানাতেই তাকে আরবি শ্রেণিতে পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

হযরত মুফতী আবুল কাসেম নুমানী দা. বা. প্রথমে বাইয়াত হন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর হাতে। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে বেশি উপকৃত হন হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. থেকে। কেননা মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. হযরতের উস্তাদ ছিলেন এবং হযরতের প্রতি বিশেষ স্নেহদৃষ্টিও দিয়েছিলেন। হযরত গাঙ্গুহী থেকে তিনি খেলাফত ও ইজাযত লাভেও ধন্য হন এবং হযরতের বিশেষ আস্থাশীল ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সাউথ আফ্রিকায় যখন ফকিহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.-এর ইনতেকাল হয়, তখনো হযরত মুফতী আবুল কাসেম নুমানী দা. বা. হযরতের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই হযরতের নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন।

হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী দা. বা. দারুল উলূম থেকে ফারেগ হওয়ার পর পিতৃশহর বেনারসের প্রাচীন মাদরাসা জামিয়া ইসলামীয়া রিউড়ি তালাবে শিক্ষক হিসাবে কৃতকর্তব্য হন। দারুল উলূম দেওবন্দের ইহতেমামের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত সেখানে শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতীর পদ অলংকৃত করে রাখেন। সেইসাথে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া কুপ্রথা, কুসংস্কার ও চারিত্রিক অবক্ষয় রোধে নিজ মহল্লার 'আঞ্জুমানে ইসলাহুল মুসলিমিন' নামক সংগঠনকে পুনর্গঠন করেন, কার্যক্রম চালু না থাকায় যা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

হযরত মুফতী সাহেব দা. বা. আনুমানিক বিশ বছর যাবৎ রমযানের শেষ দশকে বেনারস, মালতিবাগের মসজিদে বেলালে ইতেকাফ করছেন এবং

দরসে হাদীসের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।[২১] ইতিমধ্যে হযরতের দরসসমূহের দুটি সংকলন আত্মপ্রকাশ করেছে 'আসবাকে হাদীস' ও 'মাওয়ায়িযে নুমানী' নামে।

দারুল উলূম দেওবন্দে পদার্পণ

১৪১৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। মজলিসে শুরা ও ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে গঠিত বিভিন্ন উপকমিটিরও সদস্য নির্বাচিত হন বিভিন্ন সময়। মজলিসে শুরার বিভিন্ন কর্মতৎপরতায় বড় উদ্যম ও উদ্দীপনার সাথে তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতেন। ফলে মজলিসে শুরার প্রবীণ সদস্যদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে সক্ষম হন তিনি। অপরদিকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হন এবং ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে তার নায়েবে সদর নির্বাচিত হন।

পহেলা মুহাররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৮ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে যখন হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরী রহ. ইনতেকাল করেন, তখন মজলিসে শুরার আসন্ন মিটিংয়ের আগ পর্যন্ত হযরত মুফতী আবুল কাসেম নুমানী দা. বা.-কে দারুল উলূমের ভারপ্রাপ্ত মুহতামিমের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তারপর ১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার অন্তর্বর্তীকালীন মিটিংয়ে পুনরায় হযরতকে ভারপ্রাপ্ত মুহতামিমের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সর্বশেষ ২১ শাবান ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৩ জুলাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে মজলিসে শুরার একটি মিটিংয়ে হযরতকে পূর্ণাঙ্গ মুহতামিমের দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের এই গুরুভার দায়িত্বগ্রহণে ও ভাবগম্ভীর পদে আরোহণে হযরতের প্রতি মানুষের মনে বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয়, যা একে একে পূর্ণ হতে চলেছে। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তিনি এই সম্মানজনক আসন থেকে দারুল উলূমের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং উম্মতে মুসলিমার যোগ্য নেতৃত্বও দিচ্ছেন। ভাষা, সাহিত্য, সুমিষ্টভাষিতা,

---

২১. এটি ২০১৬ সালের কথা। সম্ভবত হযরত এ বরকতময় পবিত্র ধারা এখনো অব্যাহত রেখেছেন।

হৃদয়গ্রাহিতা, উচ্চরুচিশীলতা, ইলমী দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার মতো বহু গুণে গুণান্বিত করেছেন আল্লাহ তাআলা হযরতকে। যার কল্যাণে তিনি দারুল উলূমের সুন্দর-সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশ-বিদেশে দ্বীনী ও ইলমী সকল প্ল্যাটফর্ম থেকে দারুল উলূমের বিশুদ্ধ মাসলাক ও কর্মপন্থার প্রতিনিধিত্বও করে চলেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে।

নানারকম কর্মব্যস্ততা রয়েছে হযরতের জীবনে। এরপরও তিনি নিয়মিত *সুনানে তিরমিযীর* দরস প্রদানের চেষ্টা করেন। ইলমপিপাসু ছাত্ররা বড় উদ্যম ও আগ্রহ নিয়ে হযরতের দরসে উপস্থিত হয়ে থাকে।[২২]

২২. 'দারুল উলূম দেওবন্দ কি জামে ওয়া মুখতাসার তারিখ' কিতাবটি লেখার সময় হযরাতুল উস্তায *সুনানে তিরমিযীরই* দরস দিতেন। কিন্তু ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরি রহ.-এর ইনতেকালের পর তিনি শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন এবং *সহীহ বুখারীর* দরস প্রদান করা শুরু করেন।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী

(জন্ম : ১৩৬০ হি./১৯৪১ খ্রি.)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী হাফি. দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদে হাদীস ও এগারোতম সদর মুদাররিস, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদর, মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ডে নায়েবে সদর এবং রাবেতায়ে আলমে ইসলামী মক্কা মুকাররমার সম্মানিত সদস্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সারপরস্ত ও তত্ত্বাবধায়ক। হযরতকে মনে করা হয় ভারতীয় মুসলমানদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং গণ্য করা হয় অত্যন্ত প্রভাবশালী পাঁচশো মুসলিম ব্যক্তিত্বের অন্যতম।

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী দা. বা. জন্মগ্রহণ করেন ১৩৬০ হিজরী মোতাবেক ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে। হযরতের পিতা হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এবং বড় ভাই হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী রহ.।

হযরত মাওলানার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর বিশ্বস্ত খলীফা আসগর আলী সাহাসপুরি সাহেবের কাছে। তার তত্ত্বাবধানেই আট বছর বয়সে কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর দারুল উলূমে পাঁচ বছর মেয়াদী ফারসির সিলেবাস সমাপ্ত করেন এবং ১৯৫৫ সালে আরবি সিলেবাসের পাঠ শুরু করেন। একে একে সকল জামাত শেষ করে ১৩৮৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদীস সমাপন করেন।

দাওরার বছরে *সহীহ বুখারী* পড়েন মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ রহ.-এর কাছে, *জামে তিরমিযীর* ১ম খণ্ড ও *সহীহ মুসলিম* (প্রথম থেকে কিতাবুল ঈমান পর্যন্ত) পড়েন মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম বালিয়াবী রহ.-এর কাছে, *জামে তিরমিযীর* ২য় খণ্ড, *শামায়েলে তিরমিযী* ও *সুনানে আবু দাউদ* পড়েন মাওলানা সাইয়েদ ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ.-এর কাছে, *সহীহ*

মুসলিম (কিতাবুত তাহারাত থেকে শেষ পর্যন্ত) ও *সুনানে ইবনে মাজাহ* মাওলানা নাসির আহমদ খান বুলন্দশহরী রহ.-এর কাছে, *সুনানে নাসায়ি* মাওলানা জহুর আহমদ দেওবন্দী রহ.-এর কাছে, *শরহে মাআনিল আসার* মাওলানা মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী রহ.-এর কাছে, *মুআত্তা ইমাম মালেক* মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব কাসেমী রহ.-এর কাছে এবং *মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ* মাওলানা আবদুল আহাদ দেওবন্দী রহ.-এর কাছে।

এ ছাড়াও হযরতের উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইজায আলী আমরুহি, মাওলানা জলিল আহমদ কিরানবী, মাওলানা আখতার হুসাইন দেওবন্দী, মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবী রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ।

ফারাগাতের পর হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানী দা. বা. স্বীয় ভাই সাইয়েদ আসআদ মাদানী রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন। পিতা থেকে যেহেতু শৈশব থেকেই তাযকিয়া ও আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা পেয়েছিলেন, তাই এ পথে ভাইয়ের হাত ধরে খুব দ্রুতই এগিয়ে যান এবং তার থেকে খেলাফত ও ইজাযত লাভেও ধন্য হন।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর ১৯৬৫ সালে বিহার প্রদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া কাসেমীয়া গায়া থেকে শিক্ষকজীবনের সূচনা করেন এবং সেখানে প্রায় দেড় বছর অধ্যাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ১৯৬৭ সালের শুরুর দিকে মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন এবং সেখানে প্রায় চৌদ্দ মাস অবস্থান করেন।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী রহ.-এর নির্দেশে জামিয়া কাসেমীয়া শাহি মুরাদাবাদে শিক্ষক নিয়োগ হন এবং ১৩৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪০৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চৌদ্দ বছর তাদরিসি খেদমত আঞ্জাম দেন। এ সময় তিনি মধ্যমস্তরের বিভিন্ন কিতাবের পাশাপাশি *মিশকাতুল মাসাবিহ*, *সহীহ মুসলিম* ও *মুআত্তা মালেকের* মতো হাদীসের কিতাবেরও পাঠদান করেন।

দারুল উলূমের সারযমিনে

এরপর ১৪০৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মুদাররিস হিসাবে আসেন দারুল উলূম দেওবন্দে। তখন থেকে দারুল উলূমে *মিশকাতুল মাসাবিহ*,

সহীহ মুসলিম ও *সুনানে তিরমিযীর* পাঠদান করে চলেছেন। এখনো *মিশকাতুল মাসাবিহ* ও *সুনানে তিরমিযীর* দরস দিয়ে যাচ্ছেন।

হযরত মাদানী সাহেব দা. বা. ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দারুল উলূমের সহকারী নাযেমে তালিমাত থাকেন এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত নাযেমে তালিমাতের দায়িত্ব পালন করেন।

মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ.-এর ইনতেকালের পর সফর ১৪৪২ হিজরী মোতাবেক অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সদরুল মুদাররিসীনের আসনও তিনি অলংকৃত করেন।

ধর্মীয়, জাতীয় ও জনকল্যাণমূলক খেদমতসমূহ

পিতা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী ও বড় ভাই সাইয়েদ আসআদ মাদানী রহ.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শুরু থেকেই সাইয়েদ আরশাদ মাদানী দা. বা. দরস-তাদরিসের পাশাপাশি ধর্মীয় ও জাতীয় বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সঙ্গে জুড়ে আছেন এবং 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ', 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড', 'রাবেতা আলমে ইসলামী' প্রভৃতি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

সেইসাথে যখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছে, তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তিনি সোচ্চার হয়েছেন, কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন, এমনকি প্রয়োজনে আইনি সহায়তাও গ্রহণ করেছেন। কখনো নিশ্চুপ, নির্বিকার থাকেননি। 'একসা সিভিল কোড' বাস্তবায়ন, তিন তালাকের বিল পাস, 'এন পি আর', 'এন আর সি' ও 'সি আই আই' ইত্যাদি প্রতিটি ইস্যুতেই তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন।

এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক কর্মতৎপরতাও আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে 'মাদানী চেরিট্যাবল ট্রাস্ট' কায়েম করেছেন এবং তার অধীনে দ্বীনী পরিবেশে আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেওবন্দে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'মাওলানা মাদানী মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল'। মাদানী চেরিট্যাবল ট্রাস্টের অধীনে এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন মসজিদ গড়ে তোলা হয়েছে।

ইলমী অবদানসমূহ

- 'তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ' ও 'তাফসীরে উসমানীর' হিন্দি তরজমা। এই কর্মটি শুরু করেছিলেন ১৯৮০ সালে, যা এগারো বছরের সুদীর্ঘ মেহনতের পর ১৯৯১ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়।
- صيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد (তাফসিলু ইকদুল ফারায়িদ বি-তাকমিলি কয়দিল শারায়িদ) ওরফে 'শরহে মানযুমা লি-ইবনে ওয়াহবান'-এর মাখতুতা, যা হযরতের তাহকীক ও তালিকসহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।
- আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. কৃত نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (নুখাবুল আফকার ফি তানকিহি মাবানিল আখবার ফি শরহি মাআনিল আসার)-এর মাখতুতা, যা হযরতের তাহকীক ও তালিকসহ প্রথমে হিন্দুস্তান থেকে ১২ খণ্ডে এবং পরে আরববিশ্ব থেকে ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।
- هدية الأحوذي(হাদিয়াতুল আহওয়াযি), যা ছয় খণ্ডে প্রকাশিত। এতে 'তুহফাতুল আহওয়াযি শরহু জামিয়ুত তিরমিযীর' বিতর্কিত ও সমালোচিত অধ্যায়সমূহকে হানাফীদের দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে।
- সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর স্বহস্তে লিখিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ نقش حيات (নকশে হায়াত)-এর আরবি অনুবাদ।
- البرهان في مواهب الرحمان (আল-বুরহান ফি মাওয়াহিবির রহমান), যা ইবরাহীম ইবনে মুসা ইবনে আবু বকর তারাবলিসি হানাফী রহ. কৃত। হযরত এটিরও তাহকীক ও বিশ্লেষণ শুরু করেছেন।[২৩]

تمت بالخير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد خاتم النبيين، وعلى آله

وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

---

২৩. হযরাতুল উস্তায মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানী হাফি.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উইকিপিডিয়া থেকে গৃহীত ও সংযোজিত।—অনুবাদক

যখন উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত, যখন দ্বীনের আলোকে নিভিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছিল পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসন, ঠিক তখনই কয়েকজন মহিরুহ নিজেদের জীবন ও চিন্তার রক্তঝরা কালি দিয়ে রচনা করেন এক ইতিহাসের ধারা—'দারুল উলূম দেওবন্দ।'

এই বইটি সেই ইতিহাসের অমূল্য স্মারক। এটি শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গল্প নয়, এটি হলো দ্বীনের হেফাজতের এক বিপ্লবী রূপরেখা, যেখানে আকাবিরে দেওবন্দের ত্যাগ, ইলম, তাকওয়া, জিহাদ ও ধৈর্যের সমন্বয়ে একটি আদর্শিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, যার রেশ আজও বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে।

এই গ্রন্থে আপনি পাবেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম প্রজন্ম থেকে নিয়ে এ যুগ পর্যন্ত আকাবিরদের জীবনী, তাঁদের ত্যাগ ও চিন্তাধারা,

কীভাবে তাঁরা শিরক-বিদআত, ব্রিটিশ রাজনীতি ও ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, এবং কীভাবে তাঁদের হাতে গড়ে উঠেছিল এক কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দ্বীনের আলো বহন করে চলেছে।

দারুল ফিকর
জযবা | ইলম | ইরেবা